বঙ্গজননীর সুসন্তান ও বঙ্গ সাহিত্যবৎসল
মহারাজা শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেব মাণিক্য
মহোদয়ের করকমলে
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ
উৎসর্গ
করিলাম।

নিবেদন

মৎপ্রণীত 'পল্লীচিত্রে' পল্লীসমাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে পারি নাই, 'পল্লীবৈচিত্র্যে' সেই সকল কথার আলোচনা করিলাম। যে সকল সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক মহোদয় পল্লীচিত্রখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, এই পুস্তকখানিও তাঁহাদের সাহিত্যরসলিপ্সা পূর্ণ করিবে, বন্ধুগণের নিকট এরূপ আশা পাইয়াই ইহার প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু এ আশা দুরাশা কি না—পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। পল্লীবৈচিত্র্যখানি শিক্ষিত পাঠকসমাজে পল্লীচিত্রের ন্যায় সমাদৃত হইলে শ্রম সফল মনে করিব।

বঙ্গে আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, আজ যেন হঠাৎ বাঙ্গালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে ; আজ আপনার জননীকে আমরা চিনিয়াছি, জননীর যাহা আপনার, তাহার আদর করিতেছি, তাহা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেছি : আজ বাঙ্গলায় যে বাতাস বহিতেছে,—তাহা সহস্রাধিক বর্ষের অভিশপ্ত পতিত জাতির দীর্ঘশ্বাসে যেন কলুষিত নহে।

কিন্তু আমরা এই কোটী কোটী বাঙ্গালী ;—সকলেই কি নগরবাসী ? সাত কোটী বাঙ্গালীর কয় জন নগরে বাস করেন ?—কয় দিনের জন্য বাস করেন ? অধিকাংশ বাঙ্গালীই পল্লীবাসী ;—আমরা পল্লীগ্রামের গাছের ছায়ায় মানুষ হইয়াছি, পল্লীগ্রামে প্রভাতে নদীর ধারে আমবাগানে যে পাখী ডাকিয়াছে, তাহার কলগীতে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে ; সেখানকার নাপিত কাকা, পুরুত জেঠা, কামার দাদা, গয়লা মাসী ও মালী বৌ আমাদের কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে ; সেখানে দেবায়তন হইতে প্রতিদিন যথানিয়মে সংকীর্তনধ্বনি উত্থিত হয়, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কাঁশর ঘণ্টার সুরব ধূপধূনার সৌরভের সহিত মিশিয়া বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যায় ; সেখানে হেমন্তের প্রভাতে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও পত্রপুষ্প-শোভিত কুসুমকুঞ্জ নির্মল শিশিরবিন্দুতে ঝল্‌মল্ করে ; এবং বসন্তের শুক্ল যামিনীতে বিমল চন্দ্রকিরণে বংশতরুবেষ্টিত ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরগুলি চিত্রবৎ প্রতীয়-মান হয়। আজ আমাদের স্নেহময়ী বঙ্গজননীর সেই সুরম্য লীলানিকেতন,—আমাদের বহু স্বদেশবাসীর শৈশবের সেই শোভাময় সুখকুঞ্জ, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিশ্রান্ত যৌবনের সেই বিরামনিলয়, তাপদগ্ধ কর্মহীন বার্ধক্যের সেই শান্তিময় অন্তিম আশ্রয়,—বঙ্গপল্লীর বৈচিত্র্যের কথা কি এই অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচারে পূর্ণ লোমাঞ্চকর উপন্যাসের হলাহলে জর্জরিত সমাজের বক্ষে এক বিন্দু সুখের ও শান্তির হিল্লোল বহন করিয়া আনিবে না ? বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা যদি বিফল হইয়া থাকে, সে অপরাধ আমার ; পল্লীজননীর দৈন্য তাহার কারণ নয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভূমিকা

আমার পরমস্নেহভাজন সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'পল্লীচিত্র পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্য। কিন্তু পূজা পার্বণ উপলক্ষে এই পল্লীজীবনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস, যে অপূর্ব উন্মাদনা, যে যে বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড়ই উপভোগ্য ; তাহাই পল্লীজীবনের বৈচিত্র্য। সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকর সেই জন্যই এই পুস্তকের নাম 'পল্লীবৈচিত্র্য' রাখিয়াছেন।

পল্লীজীবনের এই সরল সুমধুর বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, কিছু দিন পরে হয়ত ইহার অস্তিত্বই লুপ্ত হইবে। যাদুঘরে রক্ষিত লুপ্ত জীবের দেহাবশেষ দেখিয়া আমরা অতীতের কতকটা অনুমান করিতে পারি। পরিবর্তনের প্রবল প্রবাহে বাঙ্গালীর সবই ভাসিয়া যাইতেছে ;—দীনেন্দ্র বাবুর 'পল্লীবৈচিত্র্য'ও যে কিছু দিনের মধ্যে পল্লীর চিত্রশালায় পরিণত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

শ্রীজলধর সেন।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

*   *   *

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা, ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥"

রবীন্দ্রনাথ।

পল্লীবৈচিত্র্যের পরিচয়

নব্বুই বছরেরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর সুহৃদ্ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে দিয়ে বিহার প্রদেশের পল্লী-অঞ্চলের কতকগুলি ছবি আঁকিয়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। আকাশ বাতাস মাটি জল গাছপালা পুকুর ডোবা জীবজন্তু ঘরবাড়ি চাষ খামার মানুষ দেবতা সবই সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে দেখে কিছু প্রীতিরসস্নিগ্ধ অথচ বাস্তবভাবে সে ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল। পরে শ্রীশবাবুর ভাই শৈলেশবাবুও এই পথ ধরেছিলেন। তাঁর বেশ কিছুকাল পরে দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর পৈতৃক অঞ্চল নিয়ে কতকগুলি মনোহর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরে প্রবন্ধগুলি তিনটি বইয়ে সংকলিত হয়। বই তিনটির নাম 'পল্লীচিত্র' 'পল্লীবৈচিত্র্য' ও 'পল্লীচরিত্র'। বই তিনটি উপাদেয় নিশ্চয়ই কিন্তু সেগুলির স্বাদে পার্থক্য আছে। যেমন আছে মধ্যাহ্ন ভোজনে বিবিধ ব্যঞ্জনের স্বাদে। 'পল্লীচিত্র' বইটিকে তুলনা করতে পারি চচ্চড়ির সঙ্গে। চচ্চড়িতে বিভিন্ন আনাজের স্বাদ যথাযোগ্য অটুট থাকে এবং তেল-নুন-লঙ্কার যোগে তার রসের তীক্ষ্ণতা বেড়ে যায়। দ্বিতীয় বইটিকে তুলনা করা যায় 'ঝাল' বেন্নের সঙ্গে। এতে একটিই আনাজ কিন্তু তেল-নুন-লঙ্কা ও বাটনার মিশোলে স্বাদ বাড়ে বই কমে না। প্রথম বইটি কিছু কাল আগে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, এখন দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হতে চলেছে।

পল্লীবৈচিত্র্যে আছে এগারোটি প্রবন্ধ বা প্রস্তাব। প্রথম প্রস্তাব হল কালীপূজা। একদা কালীপূজা ছিল ব্যক্তিগত সাধনা-অনুষ্ঠান, তান্ত্রিক অভিচার কাণ্ড। কালীপূজা কখনই দুর্গাপূজার মতো সামাজিক অথবা গার্হস্থ্য ধর্মানুষ্ঠান ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাকাতেরা কালীপূজা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তার প্রমাণ এখনো লুপ্ত হয়নি। "ডাকাতে কালী" পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অনুমান করতে বাধা নেই যে এই "ডাকাতে-কালী" পূজক-দের পুরোহিতরাই বংশানুক্রমে কালীপূজা করে আসছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী কিংবা তারও আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে একরকম সর্বজনীন কালীপূজা চলে এসেছিল তা হল রক্ষাকালী পূজা। এ কালীপূজা নয়। এ কালীপূজা এখন ধীরে ধীরে সর্বজনীন দুর্গাপূজা বা সরস্বতী পূজার রূপ নিচ্ছে। সুতরাং দীনেন্দ্র কুমার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

পল্লীবৈচিত্র্যের প্রস্তাবগুলিতে দীনেন্দ্রকুমারের দেশে এবং তখনকার বাংলা দেশে প্রায় সর্বত্র—কার্তিক থেকে চৈত্র মাস ধরে যে গার্হস্থ্য, সামাজিক ও গ্রাম্য ধর্মানুষ্ঠান চলত তার চিত্রগুলি পর পর গাঁথা পড়েছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তৃতীয় প্রস্তাব কার্তিকের লড়াই। এ অনুষ্ঠানটি এখনকার দিনের পক্ষে অভিনব। তারপর যথাক্রমে নবান্ন, পোষলা (অর্থাৎ পৌষমাসে আনুষ্ঠানিক চড়িভাতি), পৌষ সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ মেলা (অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির "জাত"), শ্রীপঞ্চমী, শীতল ষষ্ঠী* (শ্রীপঞ্চমীর পরদিনে অরন্ধন), দোলযাত্রা এবং চড়ক।

চড়ককে পূজা না বলে অনুষ্ঠান বলাই উচিত। এই অনুষ্ঠান এখন প্রায় উঠেই গেছে। এ ব্যাপার ছিল একদা যোগী-সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য কৃচ্ছ্র সাধনা। আমাদের পুরোনো শাস্ত্রগ্রন্থে চড়কের কোন ব্যবস্থা নেই। তবুও এ অনুষ্ঠান অর্বাচীন নয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে এই অনুষ্ঠান সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দোলযাত্রা আসলে ধর্মঘটিত অনুষ্ঠানই নয়। এ ছিল জনসাধারণের বসন্তের উৎসব ও হৈহুল্লোড়। এর নাম "হোলি" এসেছে যে মূল শব্দ থেকে তার থেকেই এসেছে "হুড়োহুড়ি" শব্দ, "হুল্লোড়" শব্দ। শ্রীচৈতন্যের সময়ে পুরীতে জগন্নাথ দেবের এমনি হুল্লোড় উৎসব হত বসন্তকালে পঞ্চমী তিথিতে। এই উৎসবের নাম "হোরা পঞ্চমী"। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা জলক্রীড়া করতেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই দোলযাত্রা কৃষ্ণপূজা-উৎসবে পরিণত হয়েছে।

পল্লীবৈচিত্র্যের প্রস্তাবগুলির উপাদেয়তা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটা কারণ হল এসব উৎসব কতক লোপ পেয়েছে কতক লোপ পাবার পথে এসেছে। আর একটা কারণ হল ঐতিহাসিক কৌতূহল। আমাদের পুরোনো দিনকে জানবার ইচ্ছা আমাদের বেড়েছে বই কমছে না। আরও একটি কারণ হল লেখকের রচনার সরলতা ও সরসতা।

৪-৫-৮২ শ্রীসুকুমার সেন

*মুদ্রণ প্রমাদের ফলে (?) 'শীতলা-ষষ্ঠী' ছাপা হয়েছে।

দীনেন্দ্রকুমার রায় : জীবন ও সাধনা

'প্রবাসী' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪০ সংখ্যায় প্রিয়রঞ্জন সেন 'বাংলা সাহিত্যে একশতটি ভাল বই'-এর একটি তালিকা প্রদান করেছিলেন। এধরনের তালিকার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, কিন্তু এতে তালিকাভুক্ত গ্রন্থসমূহের যথার্থ মর্যাদা স্বীকৃত হয়। এই তালিকায় তিনি অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' বইটিরও উল্লেখ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের নানা বিচিত্রচারী রূপ নিয়ে দীনেন্দ্রকুমার যে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর পল্লীবিষয়ক বইগুলি। 'পল্লীচিত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১১ বঙ্গাব্দে। এটি ছাড়া এ-বিষয়ে রচিত তাঁর বইগুলি হ'ল 'পল্লীবৈচিত্র্য' (১৩১২), 'পল্লীকথা' (১৩২৪), 'পল্লীবধূ' (১৯২৩) এবং 'পল্লীচরিত্র' (১৯২৩)। অবশ্য এগুলিই দীনেন্দ্রকুমারের একমাত্র সাহিত্যকৃতি নয়, কিন্তু শাশ্বতকীর্তি।

দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম হয়েছিল নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রামে এক অভিজাত তিলি-বংশে প্রায় একশো তেরো বছর আগে ২৬ অগস্ট ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা হিসাবে ১২৭৬ সনের ১১ ভাদ্র তারিখে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। পিতা ব্রজনাথ ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ মানুষ, যদিও অন্নসংস্থানের জন্য তাঁকে কৃষ্ণনগরের জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতে হয়েছিল। মেহেরপুরে জন্ম হলেও পিতার কর্মস্থল এই কৃষ্ণনগরেই তাঁকে পাঠ্যজীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করতে হয়েছিল। অবশ্য কেউ যদি তাঁর শিক্ষাজীবনে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সন্ধান করেন, ব্যর্থ হবেন। বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর সবিশেষ অপারদর্শিতা তাঁকে অভিভাবকদের বিরাগভাজন করে তুলেছিল। কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউশনেও কিছু হল না। এরই মধ্যে সাহিত্যের দিকে তাঁর ঝোঁক গিয়ে পড়েছিল লক্ষণীয় মাত্রায়।

দীনেন্দ্রকুমারের কাকা ছিলেন মহিষাদল এস্টেটের ম্যানেজার। তিনি যথেষ্ট অপ্রসন্নতা প্রকাশ করতে লাগলেন। কলকাতায় পড়শুনোর চেয়ে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ বেড়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়। কাকা ডেকে পাঠালেন তাঁকে মহিষাদলে। তিনি নিজে মহিষাদল-রাজ স্কুলের প্রেসিডেন্ট। সেখানে এসে দীনেন্দ্রকুমার শুরু করলেন শিক্ষকতার জীবন। সোনায় সোহাগা হয়ে তৃতীয় শিক্ষকের পদে এলেন জলধর সেন। (১৮৬০-১৯৩৯)। দীনেন্দ্রকুমারই কাকাকে ধরে তাঁকে আনিয়েছেন। চলতে লাগলো দুই বন্ধুতে সাহিত্যালোচনা।

ইতোমধ্যে দীনেন্দ্রকুমারের বিবাহ-কার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল—১২৯৭ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে। জলধরও বিবাহিত হলেন যখন তখন পৃথক্ বাসা করলেন।

নিরবচ্ছিন্ন অর্থ-কষ্ট দীনেন্দ্রকুমারকে প্রায় সারা জীবন তাড়না করে গেছে। শিক্ষকতার সামান্য অর্থে সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং রাজশাহীতে জেলা জজের কর্মচারীরূপে আরম্ভ হল তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। এই কাজ পেতে তাঁকে সবিশেষ সাহয্য করেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। তিন বছর এখানে চাকরি করলেন বিভিন্ন বিচারকের অধীনে। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না—'সেই একঘেয়ে জীবন' তাঁকে অপ্রসন্নতায় ভরিয়ে রাখল।

অবশ্য এখানেই তাঁর সাহিত্যজীবনের পথে সন্ধান পেলেন কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর। 'ভারতী'র লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র তাঁকে স্নেহ করতেন। এখানেই পরিচয় হয় উদারচিত্ত হরকুমার সরকারের পুত্র অক্ষয়কুমার সরকারের সঙ্গে। এঁরা ছিলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আর ঘনিষ্ঠতা হয় পরবর্তী সময়ে কান্ত-কবিনামে খ্যাত রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) সঙ্গেও। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত দীনেন্দ্রকুমারের স্মৃতিচারণ 'কবি রজনীকান্ত' (অগ্রহায়ণ ১৩২৪) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। আমরা সামান্য অংশ মাত্র উদ্ধার করছি রচনাভঙ্গির নিদর্শন হিসাবে :

পূজার ছুটির পর একবার তিনি বাড়ি হইতে রাজশাহীতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন ; আমিও ছুটির শেষে রাজশাহীতে যাইতেছিলাম।...ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি, ষ্টীমারের ডেকের উপর একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আড্ডা জমাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার গল্প আরম্ভ হইয়াছে। বহু যাত্রী তাঁহার চারিপাশে বসিয়া মুখব্যাদান করিয়া গল্প গিলিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমন কি ষ্টীমারের সারেঙ, সুখানি, ডাক্তার পর্যন্ত তাঁহাকে কাতার দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জাহাজ পদ্মার প্রতিকূল স্রোতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহা আলাইপুর ছাড়াইয়া চারঘাট, সরদহ প্রভৃতি ষ্টীমার ষ্টেশনগুলি অতিক্রম করিল। কত মাল নামিল, উঠিল, কত বিদেশের যাত্রী জাহাজে উঠিল, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল, কিন্তু রজনীকান্তের গল্প শেষ হইল না। অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় ষ্টীমার রাজশাহীর ঘাটে নঙ্গর করিল—তখনও গল্প শেষ হয় নাই। সারেঙ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার কিচ্ছা বড়ো সরেস, এ রকম কিচ্ছা আর কখনও শুনি নাই, বড়োই আপশোস যে, শেষ পর্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। যদি জানিতাম, উহা শেষ করিতে দেরি হইবে, তাহা হইলে আমি জাহাজ খুব ঢিমে চালাইতাম।'

বস্তুতই দীনেন্দ্রকুমার এই রকমের আশ্চর্য স্মৃতিকথার মহান্ ভাণ্ডারী। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৩৩৯-৪১) প্রকাশিত তাঁর 'সেকালের স্মৃতি' এক মহামূল্যবান স্মৃতিচারণা। এটি আশু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সেকালের যুগ ও জীবনের একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল আমাদের করায়ত্ত হতে পারবে।

দীনেন্দ্রকুমারের কর্মজীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় এক মহান মানুষের সংস্পর্শে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রাইপস' বৃত্তি লাভ করে পরের বৎসর অরবিন্দ ঘোষ দেশে ফিরে বরোদা কলেজের প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মাত্র সাত বছর বয়সে বিদেশ গমনের জন্য মাতৃভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। অথচ বাংলা সঠিকভাবে শিখবার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ বর্তমান। একজন উপযুক্ত বাংলা শিক্ষকের সন্ধান করছিলেন তিনি এবং তাঁর অভিভাবকেরা। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের মনোনয়ন অনুসারে দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দের বাংলা শিক্ষক হয়ে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা যান এবং প্রায় দু'বছর সেখানে অতিবাহিত করেন। তাঁর এই পর্যায়ের স্মৃতিকথা প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত হয় এবং পরে সংযোজন সমেত গ্রন্থকারে 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বরোদা-বাসের শেষ পর্যায়ে দীনেন্দ্রকুমারের স্থায়ী কর্মজীবন এবং প্রত্যক্ষত সাহিত্যজীবনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১০ ভাদ্র তারিখে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রথম প্রকাশ ঘটে। প্রথমে ব্যোমকেশ মুস্তাফি এর দায়িত্ব নিলেও কিছু পরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকায় যোগদান করেন। তিনি বসুমতী ত্যাগ করলে দীনেন্দ্রকুমারের প্রথম সহকর্মী-বন্ধু জলধর সেন এর পরিচালনার ভার পান। এতো বড়ো দায়িত্ব একা নিতে সাহসী না হয়ে বরোদায় বন্ধু দীনেন্দ্রকুমারকে আহ্বান জানিয়ে তিনি চিঠি দিলেন। তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়ে কলকাতায় এসে 'বসুমতী'তে যোগ দিলেন। ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কাছে শুরু হল তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রথম পাঠ। ধীরে উন্নীত হন কিছুদিনের জন্য এর সম্পাদক পদেও। ১৩২১ বঙ্গাব্দে বসুমতীর দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হলে তিনিও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং শেষ অবধি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন 'মাসিক বসুমতী' (প্রথম প্রকাশ ১৩২৯)-র সঙ্গে। দীনেন্দ্রকুমারের বহু রচনা, যা এখনও অগ্রন্থিত, বসুমতীর পৃষ্ঠাতে বর্তমান। তাঁর জীবনের শেষ অনুবাদ উপন্যাস বৈশাখ ১৩৫০ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ ক'রে মৃত্যুর পরেও প্রকাশিত হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে 'কথাশিল্পীর হত্যারহস্য' নামে।

পরবর্তীকালে 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও 'তিলি পত্রিকা' চলাকালীন সম্পাদনা ছাড়াও 'নন্দন কানন' নামে উপন্যাস ও গল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রেও দীনেন্দ্রকুমার জড়িত ছিলেন। এর প্রথম প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩০৭। বস্তুতপক্ষে দীনেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতির উৎসভূমি ছিল এই পত্রিকাটি। বিলাতি Monthly Magazine of fiction প্রভৃতি থেকে গল্পরস আহরণ করেই তিনি সূত্রপাত করেন 'নন্দন কানন' সিরিজ। এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় 'রহস্য লহরী' সিরিজ। 'রহস্য লহরী' সিরিজের ২১৭ খানি পুস্তকের সঙ্গে নন্দন কানন সিরিজের বইগুলি একত্র কর'লে দীনেন্দ্রকুমারের ডিটেকটিভ্ ধরনের অনুবাদ-

মূলক সস্তা গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় অর্ধসহস্র। সেদিক থেকে তাঁকে রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের প্রায় কারখানার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

উনিশতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই এড্‌গার অ্যালেন পো-র ডিটেকটিভ রচনা বিশ্ব অধিকারে নেমে পড়ে। এরপর উইল্‌কি কলিন্স এলেন তাঁর Moonstone এবং The Woman in White নিয়ে। তাঁর বইয়ের পুলিশ ইনস্‌পেকটর বাকেট সাহেব হলেন ডিটেকটিভকুলের আদিপিতা স্বরূপ। শার্লক হোমস্‌ এসেছেন অনেক পরে (১৮৮৬)। এর ঠিক দুবছর পরেই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-এর ডিটেকটিভ পুলিশ এসে বাংলা সাহিত্যের বাজার অধিকার করে বসল। তাঁর 'দারোগার দপ্তর'-এর জনপ্রিয়তা অবশ্য সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য না পেলেও পাঁচকড়ি দে মশাই এসে একেবারে Vini Vici Vidi. তাঁর দেবেন্দ্র বিজয় অতুলনীয়। কোনান ডয়েলের অনুকরণে দীনেন্দ্রকুমারের মিষ্টার ব্লেক অবশ্য পাঁচকড়ি দে-র পাঠকবাজারকে অতিক্রান্ত করতে পারেনি ; কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের লেখনী ক্লান্তি অনুভব করেনি কখনও। তার 'রূপসী বোম্বেটে'-র সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, তৎকালীন এমন পাঠকের সংখ্যা অঙ্গুলিপর্বগণ্য।

পত্নীর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুন (১২ আষাঢ় ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একশ্রেণীর পাঠকের কাছে তাঁর এই লঘুরচনাগুলিই সর্বাধিক প্রশ্রয় পেয়ে এসেছিল।

অথচ এই ভূমিকার সূচনাতেই লক্ষ্য করেছি আর এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠ বই 'পল্লীচিত্র'। যদি বর্তমান মানসিকতা বিচার করা যায়, তাহলেও এই পল্লীবিষয়ক রচনাদির পক্ষেই বর্তমান অভিজাত বাঙালী পাঠক তাঁদের সংলগ্নতা জ্ঞাপন করবেন। সেকালেও যে এগুলির কদর হয়নি, এমন নয়। 'পল্লীচিত্র' এবং 'পল্লীবৈচিত্র্যে'র একাধিক সংস্করণ তার প্রমাণ। অবশ্য ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং পল্লীবিষয়ক রচনাদি ছাড়া তাঁর যে অন্যবিধ আগ্রহ ছিল না, এমন নয়। রাজশাহীতে বসবাসকালে রজনীকান্ত সেন রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী থেকে একটি ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ এনে দিলেন। মনোহর এই গল্পটি দীনেন্দ্রকুমার রাজস্থানী পরিবেশে স্থাপন করে 'দাসী' পত্রিকায় অংশত (১৮৯৭) প্রকাশ করেন 'অজয়সিংহের কুঠী' নামে। এটিও অবশ্য ডিটেকটিভ উপন্যাস। 'নন্দন কাননে' এটি সমাপ্ত হওয়ার পর ভাদ্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মৌলিক উপন্যাস 'হামিদা' এবং 'নানাসাহেব'-এ ইতিহাসের স্পর্শ আছে। শেষ বইটিতে শশিচন্দ্র দত্ত রচিত Shankar, Tale of The Indian Mutiny-র বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

অজস্র ডিটেকটিভ গল্পের রচয়িতা হলেও দীনেন্দ্রকুমারের যে একটা প্রবল সাহিত্যবোধ ছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁর ছোট গল্পগুলি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা অবশ্য কোনো গল্প নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার বৈশাখ ১২৯৫ সংখ্যায় দীনেন্দ্রকুমার-রচিত 'একটি কুসুমের মর্মকথা,

প্রবাদ প্রশ্ন' পত্রস্থ হয়। তিনি 'ভারতী'-র নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকারও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। এ সব রচনা থেকে দীনেন্দ্রকুমারের চিন্তার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং অধিকার সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা জন্মাতে পারবে।

গ্রন্থাকারে অগ্রথিত তাঁর বহু রচনা প্রদীপ, ভারতী, সাহিত্য, সখা, দাসী, সাধনা, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতীতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এগুলি একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' এবং 'পল্লীচরিত্র' প্রসঙ্গে তাঁর অগ্রন্থিত 'জামাইষষ্ঠী', 'বর্ষায় পল্লীদৃশ্য', 'দে পাড়ার মেলা', 'বৈশাখের পল্লী' প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা স্বতই স্মরণে আসে।

আর মনে আসে তাঁর গল্পগুলির কথা। তাঁর গল্পগুলিতে আছে তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ হত্যা এবং রহস্য, ভৌতিক পরিবেশ এবং হাস্যরস আর আছে আবশ্যিকভাবে পল্লী প্রসঙ্গ। তুচ্ছ ঘটনা যে কতো মনোগ্রাহী হতে পারে তা তিনি গল্পগুলিতে দেখিয়েছেন। এদিক থেকে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ। অবশ্য তাঁর পল্লীভাবনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পল্লীচিন্তার পার্থক্য আছে —অমিলই বেশি। তবুও পল্লীই দীনেন্দ্রকুমারের অধিকাংশ গল্পের প্রাণ। 'বিপত্নীক', 'প্রত্যাখ্যান' প্রভৃতি তাঁর উৎকৃষ্ট গল্প। 'কুন্তলীন পুরস্কার' তিনি একাধিকবার অর্জন করেছিলেন—তাঁর 'অদল-বদল' একটি চমৎকার হাস্যাত্মক রচনা। একসময়ে তিনি কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প নির্বাচনও করে দিয়েছেন।

'পল্লীকথা'র ভূমিকায় দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'এগুলি যাহাদের চিত্র, তাহারা দোষগুণে বঙ্গপল্লীরই জীবন্ত মানুষ, পল্লীগ্রামের প্রাণ এবং পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড।' এই বঙ্গপল্লী মূলতঃ উত্তরমধ্য বঙ্গের পল্লী। 'ভারতী' পত্রিকাতেই এই চিত্রাবলীর প্রথম সূত্রপাত। তাঁর সমসাময়িককালে রবীন্দ্র-সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'পুরুৎ ঠাকরুণ', 'মেলা-দর্শন', 'জামাইষষ্ঠী' প্রভৃতি রচনায় এবং জলধর সেনের পল্লীগ্রামের চিত্রসমূহে দীনেন্দ্রকুমারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ পক্ষে জলধর সেনের সাহিত্যজীবনে দীনেন্দ্রকুমারের সহযোগিতা অবশ্য পরিমাপযোগ্য। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একই বিষয় নিয়ে বহু রচনা লিখেছেন। কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের অঙ্কনশক্তি তাঁর করায়ত্ত হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'ভারতী'র মতো 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুতপক্ষে সুরেশচন্দ্র দীনেন্দ্রকুমারের লঘু রোমাঞ্চক রচনার চেয়ে (যদিও তাও কিছু কিছু প্রকাশিত) পল্লীবিষয়ক এবং মননশীল রচনাতেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সমধিক। 'পল্লীচিত্র' প্রকাশিত হলে সেজন্য তিনিই আগ্রহভরে এর পরিশিষ্টে 'গ্রাম্য শব্দে'র অর্থসংস্থান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে জাগে। সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এককালে রবীন্দ্রবিরোধীতার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। অথচ দীনেন্দ্র-

কুমার তাঁর স্বভাবমধুরতার গুণে দুজনেরই প্রীতি-ভালবাসা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পল্লীচিত্রাদি প্রকাশে যথোচিত উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন সানন্দে 'বাংলা দেশের হৃদয় হইতে আনন্দ ও শান্তি বহন করিয়া আনিয়া আমাকে উপহার দিয়াছেন।'

যে শক্তির গুণে দীনেন্দ্রকুমার রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ পাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ-লাভে সমর্থ হয়েছিলেন তা হ'ল তাঁর অজস্র পর্যবেক্ষণ শক্তি। এই পর্যবেক্ষণ তথ্য-ভারে নিপীড়িত নয়, রসভারে বিনম্র। এ দিক থেকে তাঁকে জেন অস্টেনের সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যায়। সেকালের বিলাতের গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যেমন জর্জ এলিয়টের রচনাকে স্মরণ করেন, একালেও তেমনি পড়তে হবে দীনেন্দ্রকুমারকে। সমাজ বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মানুষের মূল্যবোধ। পল্লীর সেই সৌন্দর্য এবং ত্রুটি দুই-ই শহুরে-দস্যু অপহরণ করে নিয়ে গেছে। শ্রীহীন এই পল্লীগুলির একদা প্রাণরসের আধার হয়ে থেকে গেছে দীনেন্দ্র-কুমারের পল্লীবিষয়ক রচনাগুলি—তাকেই আস্বাদযোগ্য করে যা প্রকাশিত হল পুনশ্চ ॥

বারিদবরণ ঘোষ

সূচী

কালীপূজা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, এমন কি, ভারত-রাজধানী কলিকাতাতেও দেওয়ালী উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনাময় তীব্র আনন্দের উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। শস্যশ্যামলা বনরাজি-কুন্তলা প্রসন্নসলিলা বঙ্গভূমির বহুদূরবর্তী পল্লীপ্রান্তে, শান্তিপূর্ণ গৃহস্থ-পরিবারে ও দীনদরিদ্রের গোময়-মার্জিত জীর্ণ পর্ণকুটীরেও সেই উদ্দাম উল্লাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। দীপমালাবিভূষিত, সহস্র হাউই-বোম-তুবড়ী-বিখচিত অতুল ঐশ্বর্যময়ী সুসজ্জিত রাজধানীর অধিবাসিবৃন্দের আলোকপ্রদীপ্ত নয়নের বিস্ময়কৌতুকভাবে দরিদ্র পল্লীবাসিদিগের চক্ষেও প্রতিফলিত দেখা যায়। যে আনন্দস্রোত একটি নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তের মধুর সন্ধ্যায় দেশের একপ্রান্তস্থ নরনারীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই মন্দীভূত হইয়া দেশের অন্যপ্রান্তের মানবহৃদয়ে সুমন্দ সান্ধ্যসমীরণে মৃদুকম্পন উপস্থিত করে।—পল্লীসমূহ বিচ্ছিন্ন, দূর দূরান্তরে অবস্থিত, কিন্তু সমাজ-দেহ অবিচ্ছিন্নভাবে দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া বর্তমান। মানব হৃদয় সর্বত্র অভিন্ন। তাই পল্লীজীবনের সুখদুঃখ ও উৎসবানন্দের বার্তা দেশের প্রতি কেন্দ্রে ধ্বনিত হয় ; পল্লীগ্রামের এই বৈচিত্র্য নগরবাসিগণের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইবার অযোগ্য নহে।

কেবল কালীপূজার রাত্রিটিই পল্লীবাসিগণের নিকট উৎসবময়ী নহে, কালীপূজার পূর্বদিন হইতেই পল্লীগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে আসন্ন উৎসবের উল্লাস-চাঞ্চল্য অনুভব করা যায়। চতুর্দশীতে 'চৌদ্দ শাক' খাওয়া পল্লীবাসিগণের একটি অবশ্যপ্রতিপাল্য প্রথা। আমাদের গোবিন্দপুরে যথেষ্ট উৎসাহের সহিত এ নিয়মটি রক্ষিত হয়। গ্রামের বালকবালিকাগণ সকালে উঠিয়াই চতুর্দশপ্রকার শাকের অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু চতুর্দশপ্রকার শাক একই

ঋতুতে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। সকল জাতীয় শাক এক স্থানে না পাইলেও, ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হইতে তাহারা চৌদ্দ শাক সংগ্রহ করিয়া আনিল। ছেলেমেয়েরা একত্র বসিয়া গণিয়া দেখিল,—১ কলমী, ২ হেলাঞ্চা, ৩ নটে, ৪ পালং ও চুকো (টক পালং), ৬ কচু, ৭ বেথো, ৮ ছোলা, ৯ মটর, ১০ শরিষা, ১১ সজিনা, ১২ পুঁই, ১৩ সূর্যি কুমড়োর ডগা ;—বহু তর্কবিতর্কে ও প্রচুর অনুসন্ধানে অম্ল-তিক্ত-কষায় প্রভৃতি স্বাদবিশিষ্ট ত্রয়োদশ প্রকার শাক সংগৃহীত হইল। এখনও এক রকম বাকি!—আর কি শাক সংগ্রহ করা যায়? বিস্তর চিন্তার পর দত্তদের নটবর বলিল, "পেয়েছি! পেয়েছি!" চারি দিকে শব্দ উঠিল, "কি, কি?" নটবর মধুর হাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া বলিল, "গাধাপণ্যে!" সকলে মহা উৎসাহে গাধাপণ্যে সংগ্রহ করিয়া আনিল ; সেজন্য কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হইল না ; শোথরোগের ঔষধ বলিয়া অনেক পল্লীগৃহস্থই এই অযত্নোদ্ভূত শাক স্ব স্ব গৃহপ্রাঙ্গণে সযত্নে রক্ষা করে।

হেলাঞ্চার শাক সংগ্রহ করিতে বালকদিগের অনেক পচা পুকুরে নামিতে হইয়াছে ; কেহ কেহ হেলাঞ্চা সংগ্রহ করিয়াছে বটে, কিন্তু কলমী পায় নাই ; তাহারা অগত্যা দল বাঁধিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইয়া শুশুনির শাক তুলিয়া আনিল। নদীতীরে শুভ্র বালুকারাশির উপর প্রাতঃসূর্যের পীতাভ কিরণ প্রতিফলিত হইতেছে, সেই বালুকারাশি ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস-মুখ হইতে স্বচ্ছ শীতল জলধারা উৎসারিত হইয়া নদীতে পড়িতেছে ; এই সকল উৎসের সন্নিকটে পুরু সবুজ মখমলের গালিচার মত সুকোমল পুঞ্জ পুঞ্জ শুশুনির শাক অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অসহায় দুঃখিনী গ্রাম্য-বিধবাগণ ও জেলে বাগদীর ছেলেরা অবনতমস্তকে নিবিষ্টচিত্তে কোঁচড় ভরিয়া সেই শাক তুলিতেছে। শাকগুলি নদীতীরে ঢালিয়া রাখিয়া, কেহ কেহ বা কোঁচড়ে লইয়াই স্নান করিতেছে, এবং স্নানান্তে শাকগুলি 'ভাসানে জলে' ধুইয়া তীরে উঠিয়া গামছা দিয়া গা মুছিতেছে।

চতুর্দশীতে চৌদ্দশাক আহার উপলক্ষে রন্ধনের একটু বিশিষ্ট আয়োজনও অনেক পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন অনেক বাড়ীতেই নূতন গুড়ের 'পরমান্ন'—যেন অন্নপূর্ণার হাতা হইতেই তাহা সশরীরে নামিয়া আসে। যাহাতে একদিন ক্ষুৎপিপাসাতুর বিপন্ন বিশ্বেশ্বরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার কণামাত্র পাইয়াই পল্লীবাসিগণের অন্তরে তৃপ্তি ও প্রসন্নতার সঞ্চার হয়।

আহারাদির পর আজ আর বিশ্রামের অবকাশ নাই। মেয়েরা দাওয়ায় বসিয়া মাটীর প্রদীপ গড়িতে আরম্ভ করিল। বেলা থাকিতে থাকিতে প্রদীপগুলি প্রস্তুত হওয়া দরকার ; রৌদ্রে একটু শুকাইয়া না লইলে তৈল ও সলিতার অপব্যয় হইবে ভাবিয়া, তিন চারিটি মেয়ে দীপনির্মাণ কার্যে যোগদান করিল। কেহ কেহ প্রদীপ একটু শক্ত করিবার জন্য 'এ'টুলি' মাটী লইয়া আসিয়া দীপনির্মাণে প্রবৃত্ত হইল। প্রদীপ প্রস্তুত হইলে রৌদ্রে তাহা কিছুক্ষণ শুকাইয়া লইয়া ছোট

ছোট সলিতা দিয়া তাহারা সাজাইয়া রাখিল ; সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া আসিল, তখন চতুর্দশটি মৃৎপ্রদীপ বাড়ীর বিভিন্ন অংশে রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত করা হইল। পল্লীগ্রাম, সন্ধ্যাকাল ; ক্ষুদ্র গ্রামখানির তৃণাচ্ছাদিত নিস্তব্ধ কুটীর, কুটীরে ঝাঁপের বেড়া, আঙ্গিনায় শাকের ক্ষেত, গোটাকত শোলা কচুর গাছ, এক-পাশে একঝাড় কলাগাছ, এক কোণে একটি সজিনার গাছ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ-গুলির ক্ষীণ আলোক প্রকৃতির সেই শ্যামল স্নেহাঞ্চলে প্রতিফলিত হইতেছে। তরু-অন্তরালে জোনাকির মৃদুস্ফুরণ, আর লক্ষকোটী ক্রোশ ঊর্ধ্বে কোটী কোটী তারকার শুভ্রদীপ্তি সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথিনীর বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিতেছে।

পরদিন উৎসবের দিন। সেদিন সকলের মুখই আনন্দোৎফুল্ল। গ্রামের মধ্য-স্থলে কুমারপাড়া। গৃহস্থদের কাছে বায়না পাইয়া কুমারেরা কালীপ্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছে ; তাহাদের অপ্রশস্ত গৃহকক্ষে, উননের পাশে, পরচালার নীচে, খড়ের গাদার কাছে, ঢেঁকির ঘরে—যেখানে সেখানে কালীপ্রতিমাকে উলঙ্গিনীবেশে লোলজিহ্ব হইয়া ও চারিখানি বাহু প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান দেখা যাইত। আজ সকালে সেগুলির উপর বর্ণবিন্যাস আরম্ভ হইল। গ্রামের মাতব্বর লোকের বাড়ীতে যে সকল কালীর পূজা হয়, কুম্ভকার-গৃহে সে সকল প্রতিমা নির্মিত হয় না ; মাতব্বর মহাশয়দের গৃহে কুম্ভকারকে উপস্থিত হইয়া প্রতিমা-নির্মাণ করিতে হয়।—মালীরা চিত্রকর ও বেশ-কর উভয়ই, আজ আর তাহাদের অবসর নাই, তাহারা কতকগুলি নারিকেলের 'মালায়' নানা রকম রঙ গুলিয়া তুলি দিয়া 'ঠাকুর চিত্রি' করিতেছে। অপরাহ্ণকালে চিত্র শেষ হইল। কালী ঠাকুরাণী নিজ মূর্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতে না পড়িতে চারি দিক হইতে ঢাক বাজিয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেরা উদ্যতকর্ণেই ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল, ঢক্কাধ্বনি তাহাদের কর্ণপটহে ধ্বনিত হইবামাত্র তাহারা "ঐ বাজনা এসেছে রে!" বলিয়া সমস্বরে হর্ষনিনাদ করিয়া পূজাবাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঢাক আসিয়াছে, কিন্তু তখনও ঠাকুর আসে নাই ; এক দল ছেলে একটা ঢাক ও একখান কাঁশি সঙ্গে লইয়া কুমার-বাড়ী ঠাকুর আনিতে গেল। একজন লোকের মাথায় সেই দেবীপ্রতিমা—দিগ্বসনা, নিরাভরণা, ঘোরকৃষ্ণবর্ণা, কালীমূর্তি—স্থাপন করিয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে বাড়ী লইয়া আসিল।

কালী ঠাকুরাণী গৃহে আনীত হইলে, ছেলেরা মহা উৎসাহে ডাকের গহনা দিয়া দেবীপ্রতিমা সাজাইতে লাগিল। ঝোড়া হইতে ডাকের সাজ বাহির করিয়া তিন চারি জনে প্রতিমার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিতেছে, দীপালোক ডাকের গহনায় পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে, কুলুঙ্গীতে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে, দীপশিখার সমস্ত কুলুঙ্গী কালীপূর্ণ হইয়াছে, রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিতপক্ষ পতঙ্গ সেই আলোকশিখার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, তাহার পর কুলুঙ্গীর উপর

পড়িয়া পতঙ্গ-লীলা সংবরণ করিতেছে। অসংখ্য পতঙ্গের মৃতদেহে কুলুঙ্গী পরিপূর্ণ।

প্রতিমা সজ্জিত হইল। মাথায় মুকুট, মুকুটের অগ্র হীরকের প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে ; দেবীর এক হস্তে খড়্গ, অন্য হস্তে অসুরমুণ্ড ; আর এক হস্তে তিনি 'বর' ও অন্য হস্তে 'অভয়'-প্রদানে উদ্যত : সৃষ্টি ও প্রলয়ের দৃশ্য একত্র সম্মিলিত ; করচতুষ্টয়ে নানাপ্রকার ডাকের গহনা। গলায় রক্তাক্ত মুণ্ডমালা, তাহার উপর মোমের ফুলের লাল মালা। কটিতট বেড়িয়া তিন সারি নরহস্ত, মস্তকে আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম,—মাথার উপর রাঙতার 'ছটা'। লোহিত-বর্ণ লোলজিহ্বা প্রসারিত। উজ্জ্বল ত্রিনয়নের দৃষ্টি ভাবহীন। পদতলে অর্ধ-নিমীলিতনেত্র ঈশান পতিত : তাঁহার বর্ণ শ্বেত, হস্তে শিঙ্গা ও ডম্বরু, কর্ণে ধুতুরার ফুল, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, তাহার উপর চিত্রবিচিত্র সর্প ফণা উদ্যত করিয়া কুণ্ডলাকারে অবস্থিত।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একখানি চাঁদোয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তাহার নীচে একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া কতকগুলি ছেলেমেয়ে গণ্ডগোল করিতেছে : এক পাশে ঢুলিয়া চাটায়ের উপর বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক টানিতেছে, পাশে দুই চারিটি ঢোল পড়িয়া আছে, গোটা দুই ঢাক চিত্রবিচিত্র ফরাসী ছিটের 'ওয়াড়' পরিয়া, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের পাখা পিঠে বাঁধিয়া নীরবে অবস্থিত, যেন কখন ঢাকীর ঘাড়ে উঠিয়া বিকট বাদ্যনাদে পল্লীবালকগণের শিশু-হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিবে—ঔৎসুক্যভরে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে!

সন্ধ্যা অতীত হইল। উৎসব-ভবনের প্রাঙ্গণে বাঁশের যে 'আড়' বাঁধা হইয়াছিল, তাহার উপর অর্ধহস্ত ব্যবধানে অল্পপরিমাণ গোবর রাখিয়া, ছেলেরা তাহাতে ছোট ছোট মাটীর প্রদীপ বসাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে দুই একটি করিয়া সকল বাড়ীতেই বহুসংখ্যক মৃৎপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইল।

আজ পল্লীগ্রামের নৈশ শোভা বড় রমণীয়! অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন ; কাননবেষ্টিত অপ্রশস্ত গ্রাম্যপথ, গ্রামপ্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণীর তরল বক্ষ, জোনাকি-খচিত বিশালকায় পাদপশ্রেণী, দূরস্থ সমতল শস্যক্ষেত্র—চরাচরের সর্বত্র গাঢ় অন্ধকার। ঊর্ধ্বাকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, আজ তাহারা অত্যন্ত শুভ্র, অধিকতর জ্যোতির্ময় ; যেন প্রকৃতিরাণী তাঁহার দ্যুতিময় হীরক-রত্নমণ্ডিত কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া প্রিয়জনসমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নিশ্বাসবায়ুতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে, হেমন্তের নির্মল শিশির-বিন্দু তাঁহার চক্ষুঃপ্রান্ত হইতে খসিয়া শেফালিকা ও রজনীগন্ধার কলিকাগুলিকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

প্রত্যেক বাড়ী দীপমালায় সুসজ্জিত। যাহাদের অট্টালিকা আছে, তাহারা বাহিরের বারান্দায়, কার্নিশের উপর সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে ; ছেলে-মেয়েরা চিলে-কোঠার উপর উঠিয়া তাহার ধারে ধারে সারি সারি প্রদীপ

বসাইতেছে ; কার্নিশ হইতে পাছে মই পিছলাইয়া পড়ে, এই ভয়ে একটি বালক মইখানির নিম্ন প্রান্তে সর্বশরীরের ভর দিয়া তাহা চাপিয়া ধরিয়া আছে—আর একটি মেয়ে অতি সন্তর্পণে এক একটি প্রজ্বলিত মৃৎপ্রদীপ লইয়া মই-এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছে, প্রদীপ হাতে হাতে চিলে-কোঠার ছাদের উপর আশ্রয়লাভ করিতেছে। যাহাদের খড়ের ঘর, তাহারাও বারান্দায় প্রদীপ সাজাইয়া দিয়াছে। কাহারও বাড়ীর সম্মুখে আমবাগান ; কলা পেয়ারা ডালিম গাছে পরিপূর্ণ ছোট ছোট বেড় ; এক দিকে একটা বাঁশের ঝাড় ; চারি দিকে সুপারি ও 'ডাব গাছের' সারি,—এই সমস্ত বৃক্ষের ব্যবধানপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপগুলি মৃদু আলোকধারা বিকীর্ণ করিতেছে।

ক্ষুদ্র বাজারখানি আজ আলোকমালায় সুসজ্জিত। দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকানের সম্মুখে বাঁশের খুঁটি পুতিয়া তাহাতে নানা ভঙ্গিতে বাখারি বাঁধিয়া দিয়াছে ; বাখারির উপর সারি সারি মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছে। স্থানে স্থানে মালসার ভিতর আলকাতরা ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কেহ কেহ বা আলকাতরা-মাখা বড় বড় পিপায় আগুন দিয়াছে, ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, প্রজ্বলিত অগ্নি ঊর্ধ্বে অনেক দূর পর্যন্ত শিখা বিস্তার করিয়াছে। গ্রামের ছেলেরা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে অদূরে দাঁড়াইয়া সেই অগ্নিক্রীড়া দেখিতেছে ; বাজারের দুই পাঁচটা কুকুর এই অনভ্যস্ত দৃশ্য দেখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত চীৎকার করিতেছে, এবং সহসা কোনও বালক-হস্তনিক্ষিপ্ত অতর্কিত লোষ্ট্রপ্রহারে আহত হইয়া লাঙ্গুল সংকোচ করিয়া বিশ পঁচিশ হাত দূরে পলাইয়া যাইতেছে, এবং ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে ! দুই তিনটি দোকানের সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত ঊর্ধ্বে এক একটা কাগজের বৃহৎ 'ফানুস' ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে একটা উজ্জ্বল আলো. তাহার চারি পাশে মানুষ. বানর, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু প্রভৃতির ছোট ছোট প্রতিকৃতি—কাগজে নির্মিত. ধূমের জোরে ছবিগুলি ক্রমাগত ঘুরিতেছে, আর ফানুসের ঘেরের পাতলা কাগজে সেই সকল ছবির ছায়া পড়িতেছে, ছেলেরা স্থিরভাবে নীচে দাঁড়াইয়া ঘাড় তুলিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া ভদ্রঘরের পল্লীরমণীগণ পর্যন্ত পায়ের মল খুলিয়া, ময়লা কাপড় পরিয়া, ঘোমটা টানিয়া, সারি বাঁধিয়া, আলো দেখিতে বাহির হইয়াছেন ;—তাঁহাদের সসঙ্কোচ পদক্ষেপ, সলজ্জ দৃষ্টি-নিক্ষেপ তাঁহাদের কুলের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। যুবতীর ক্রোড়স্থ তিন বৎসরের শিশুসন্তানটি দোকানের সম্মুখস্থিত কোন উজ্জ্বল আলোক-শিখার দিকে তাহার কোমল চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মাতার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন সজোরে টানিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দেখ্ মা কেমন আলো !"— লজ্জাবনত-মুখী সাধ্বী পুত্রের ব্যবহারে বিষম বিব্রত হইয়া ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন, এবং অত্যন্ত নিম্ন স্বরে শিশুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "চুপ কর দস্যি ছেলে ! চেঁচাসনে, কে আবার চিনে ফেলবে !"

গ্রামের এক প্রান্তে গ্রাম্যদেবতা কালীর পীঠস্থান। কালীবাড়ীতে আজ বড় ধুম। প্রাচীন দালানখানি আজ আলোকমালায় সজ্জিত, সম্মুখের দ্বার উন্মুক্ত, উচ্চ বেদীর উপর স্বর্ণরজতাভরণভূষিতা প্রস্তরময়ী দেবীমূর্তি! বেদীর নিম্নে ঘটের উপর একটি নারিকেল, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, তাহার তিন চারিটি সতেজ নবীন পত্র দেবীর পাদমূল পর্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। গৃহমধ্যে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, ধূপের সুগন্ধে গৃহকক্ষ পূর্ণ। রমণীগণ দলে দলে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে; তাহার পর চৌকাঠের কাছে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া হৃদয়ের অকৃত্রিম সুগভীর ভক্তিতে দেবীর মহিমাকে যেন আরও উজ্জ্বল করিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে। কয়েক জন ভক্ত দেবীর সম্মুখে বেদীর একটু দূরে গল-লগ্নীকৃতবস্ত্রে দাঁড়াইয়া আছে, এবং মধ্যে মধ্যে 'মা! মা!' রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। এই গভীর অন্ধকারপূর্ণ রাত্রে তাহাদিগের সেই তীব্র কণ্ঠস্বর যেন চতুর্ভুজা দেবীর পাষাণ-হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে হৃদয়কেও বিচলিত করিয়া তুলিতেছে!—সে স্বরে কোমলতা নাই, ভক্তির স্নিগ্ধতা নাই, বিশ্বাসের নির্ভরতাও নাই; তাহা কর্কশ ও নিরাশাপূর্ণ; কাতরতাব্যঞ্জক হইলেও অত্যন্ত নীরস, পুত্র মাতাকে যে স্বরে আহ্বান করে—সে স্বরের মাধুর্য ও ঝঙ্কার ইহাতে নাই।

কালীর দালানের নীচেই একটি সুবৃহৎ তমাল তরু; গাছটি অধিক উচ্চ নহে, কিন্তু তাহার শাখাপল্লবের আতপত্রে অনেকখানি ভূমি সমাচ্ছন্ন, বৃক্ষের মূলদেশ ইষ্টকবন্ধ; সেই 'সানে'র উপর একজন 'সাধু' একখানি ব্যাঘ্রচর্মের উপর যুক্তাসনে উপবিষ্ট, চেলার দল সাধুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। সাধুর সর্বাঙ্গ ভস্মাবৃত, মস্তকে ধূসর জটাভার, পরিধানে মলিন কৌপীন, বোধ হয় কোনও কালে তাহা গেরিমাটী দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল। সাধুর সিন্দূরচর্চিত ত্রিশূলটি অদূরে মৃত্তিকায় প্রোথিত, তাঁহার গৈরিক বর্ণের ঝুলিটা মাথার উপর তমাল-শাখায় ঝুলিতেছে। সাধুর সম্মুখে বড় একটি কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছে; মধ্যে মধ্যে গাঁজার কলিকায় গাঁজা সাজা হইতেছে; সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার সুদীর্ঘ চিমটার সাহায্যে আগুন তুলিয়া তাহা দ্বারা কলিকা পূর্ণ করিতেছেন, এবং দুই হস্তে কলিকাটি চাপিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, মাথাটি একটু বাঁকাইয়া, সজোরে গাঁজায় দম দিতেছেন; তাহার পর এক মুখ ধূমের সহিত অস্পষ্টস্বরে "বোম্ ভোলা!"—"কালী কুলকুণ্ডলিনী!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন। প্রভুর প্রসাদলাভের চেষ্টায় চেলার দলে ভারি হুলস্থূল বাধিয়া যাইতেছে! গাঁজার গন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ।

অনেক রাত্রে কালীপূজা আরম্ভ হইল। একটা ঢাক, একজোড়া ঢোল, আর খান দুই কাঁশি মাথার কাছে রাখিয়া ময়লা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বাজন্‌দারেরা একটা পুরাতন বড় মাদুরের উপর পড়িয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল,

হঠাৎ পুরোহিত ঠাকুরের ঘণ্টার ঠং ঠং শব্দ শুনিয়া জাগরিত হইয়া তাহারা উঠিয়া বসিল। তাহার পর স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্র লইয়া দালানের ঠিক সম্মুখে আসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। বাদ্যধ্বনি শুনিয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছে ভাবিয়া গ্রামবাসীদিগের যাহার যে 'মানসা' ছিল, তাহা লইয়া তাহারা একে একে পূজা দিতে আসিল। কেহ রোগমুক্ত হইয়াছে বলিয়া, কাহারও ভাগ্যে পুত্রলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া, কেহ বা মামলায় জয়লাভ করিয়া, খুব ধুমধামের সহিত পূজা দিতে আসিল ; সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড, জোড়া পাঁঠা, পট্টবস্ত্র, সুরঞ্জিত শাঁখা, স্বর্ণনির্মিত নথ ; পাত্রে নানাবিধ ফল, ফুল, চন্দন ; ধুপাধারে ধুপ। পুরোহিত পূজা শেষ করিলেন। বলির বাদ্য বাজিল। সদ্যঃস্নাত, মন্ত্রপূত কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু দুটিকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া কামার খড়্গের এক আঘাতেই তাহাদের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। হাড়িকাঠ ও তাহার চারি পাশের অনেকখানি মাটী রক্তে কর্দমাক্ত হইয়া গেল ; আরও জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল। কয়েকটা ছেলে পাঁঠার রক্ত লইয়া পরস্পরের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া আনন্দ বোধ করিতে লাগিল। রুধিরপ্লাবিত ছাগমুণ্ড একখানি থালের উপর রাখিয়া দেবীর পদতলে অর্পিত হইল। দেবী তাঁহার করাল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া নিশ্চল শূন্যদৃষ্টিতে এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় জীবশিশুর মৃত্যু—এই শোণিতস্রাব চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার চরণমূলে কতদিন হইতে এমনই রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ; যুগান্তের পূর্ব হইতে এমনই রক্তপাত দেখিয়া দেখিয়া বুঝি তাঁহার দেব-হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে।

যাহারা পূজা করিতে আসিয়াছিল, পূজা শেষ হইলে পূজারী ঠাকুর তাহাদিগের গলদেশে এক একগাছি ফুলের মালা পরাইয়া, থালের উপর দেবীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাখিয়া থালাগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। তাহারা প্রণাম করিয়া প্রণামীর টাকা পুরোহিতের হস্তে প্রদান করিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিল। প্রসাদের অল্পতা দেখিয়া পুরোহিতের লোভাতিশয্যে কেহ কেহ বড়ই বিরাগ প্রকাশ করিল ; বিশেষতঃ, পুরোহিত ঠাকুর দুইটি পাঁঠার মুণ্ডই নিজের ভোগের জন্য রাখিলেন বলিয়া, রামজয় সরকার তাহার জেঠ্‌তুতো ভাই পরমানন্দকে বলিল, "দেখ্‌চ দাদাঠাকুরের আক্কেলটা ! দুটো মুণ্ডুর একটা আমাদের দে, না দুটোই নিজের জন্যে রাখ্‌লে ! মায়ের ভোগের জন্যে পাঁচ সের সন্দেশ আন্‌লাম, পাঁচটা বৈ ফেরত দিলে না ? আমাদের বিহারী ঠাকুর এর চেয়ে ঢের সরেস লোক, এখন থেকে তার পালিতেই পূজা দিতে আস্‌ব।" পরমানন্দের বয়স বেশী হইয়াছিল, সে প্রাচীন ও বিজ্ঞ ; ছোট ভাইয়ের অসন্তোষ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল, দুঃখিতভাবে বলিল, "ছিঃ ! ও কথা বলে না, মায়ের প্রসাদ, যা পাওয়া যায়, তাই ঢের, প্রসাদ কি বেশী মেলে রে বোকা !"

কাঁসারীপাড়ার বারোয়ারীতলায় আজ ভারি ঘটা। একটি তেমাথা রাস্তার ধারে অনেকখানি যায়গা পরিষ্কার করিয়া চাটাই দিয়া সেখানে টাপোর নির্মিত

হইয়াছে। সেই টাপোরের নীচে সদ্যনির্মিত কাঁচা বেদীর উপর কালীর প্রকাণ্ড মৃণ্ময়ীমূর্তি ; সম্মুখেই দুই একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে, পাশে একডালি ফুল ও নৈবেদ্যের নানাবিধ উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘটের সম্মুখে একখানি কুশাসন পাতা ; আসন শূন্য ; পুরোহিত মহাশয়ের এখনও শুভাগমন হয় নাই ; যজমান বাড়ীর পূজা না সারিয়া তিনি এ বারোয়ারী কাণ্ডে হাত দিতে সাহস করেন নাই ; কারণ, তাঁহার বিবেচনায় বারোয়ারী পূজাটা ওঠ্‌বন্দী মহাল, আজ আছে, কাল নাই, যজমানের বাড়ীর পূজা কায়েমী সত্ত্ব, চিরদিনই বর্তমান, সুতরাং আগে যজমানের মন রাখা চাই।

বারোয়ারী কাজে সকলেই কর্তা, বিশেষতঃ যাহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ। বার জন কর্তা বলিয়াই কোনও কাজে শৃঙ্খলা নাই। সন্ধ্যার সময় পাণ্ডারা ও পল্লী-যুবকেরা অনেকে মিলিয়া দুধ ও চিনি মিশ্রিত এক গামলা সিদ্ধি পান করিয়াছে ; রাত্রি যতই গভীর হইতেছে, তাহাদের নেশাও তত পাকিয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ও মাতামাতিও ততই বাড়িতেছে! রাত্রে কবির গান হইবে, গানের আসর ঠিক করিবার জন্য কয়েক জন পাণ্ডা ও উৎসাহশীল যুবক আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

অন্য দিকে গ্রাম্যদেবতা কালীর বাড়ীতে নৈবদ্য পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। বড়বাজারের ভিতর দিয়া মহাসমারোহে নৈবেদ্য লইয়া যাইতে হইবে। সে নৈবদ্য অসাধারণ হওয়াই আবশ্যক। কারণ, বড়বাজারের দল কাঁসারীপাড়ার দলের প্রতিদ্বন্দ্বী। একখানি প্রকাণ্ড বারকোসে এই নৈবেদ্য সাজান হইয়াছে। বারকোসখানির পরিধি একখানি বড় গরুর গাড়ীর চাকার সমান, নৈবেদ্যের উপ-করণের পরিমাণও তদনুরূপ! আধ মণ ভিজে আতপ চাউল চূড়াকারে সজ্জিত, তাহার উপর একটি পাঁচ সের ওজনের গোল্লা সন্দেশ—যেন হিমালয়ের স্কন্ধে তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ;—চারি পাশে নানা রকম ভিজে পাটনাই মটর, মুগের ডাল, বরবটী ইত্যাদি, প্রত্যেক প্রকার সামগ্রী আড়াই সেরের কম নহে। গোটা চারি পাঁচ নারিকেলের শাঁস, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, পাঁচ ছয়টা শশার চাকা, আধ হাঁড়ি গুড়ে বাতাসা, তিন চারিখানি আক, খোসা ছাড়ান—খণ্ড খণ্ড ভাবে স্তূপাকারে সজ্জিত। বারকোসখানি দুইটি সমান্তরাল বংশদণ্ডের উপর বসাইয়া দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া চারি জন গোয়ালার ঘাড়ে চাপাইয়া কালীবাড়ী পাঠান হইল, সঙ্গে ঢাক ঢোল মশাল,—আর একপাল ছেলে!

অনেক রাত্রে বারোয়ারীতলায় পুরোহিত মহাশয়ের সমাগম হইল। অনেকগুলি যজমানবাড়ীতে পূজা করিয়া আজ তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, তাহার উপর কিছু বেশী রাত্রি হওয়ায় পাণ্ডারা তাঁহাকে দুই একটা কটু বাক্যও বলিয়াছে ; তিনি কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া হাত পা ধুইয়া পূজায় বসিলেন। অনেকদিন পরে আজ বারোয়ারীতলায় মহিষ বলি হইবে, তাই সেখানে পূজার বাজনা বাজিবামাত্র সমস্ত গ্রামের লোক মহিষ-বলির আমোদ দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বলির

জন্য একটি শিশু মহিষ আনাইবার কথা ছিল, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও মহিষশাবক না পাওয়ায় বারো টাকা দিয়া অগত্যা একটা অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বৃহৎকায় মহিষ আনা হইয়াছে। বারোয়ারীতলায় একটা বট গাছে দুইগাছি খাটো দড়ি দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার ঘাড় নরম করিবার জন্য দুই জন লোক সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই মহিষের ঘাড়ে ঘি মাখাইতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে বেলুন দিয়া তাহার ঘাড় ডলিতেছিল।

মধ্যরাত্রে বাজনা শুনিয়া ছেলে বুড়ো সকলে মহিষ-বলি দেখিবার জন্য বারোয়ারীতলায় ছুটিয়া আসিল ; নিকটে ধনঞ্জয় মিত্রের বাড়ীতে লোকজন সবে খাইতে বসিয়াছে, লুচির উপর পাঁঠা পড়িয়াছে মাত্র, এমন সময়ে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল ! মহিষ-বলি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সকলে তাড়াতাড়ি খানকত লুচি ও মাংস নাকে মুখে গুঁজিয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

সান্যালবাড়ীতে আহারের এখনও বিলম্ব আছে। বৃদ্ধ বংশলোচন সান্যাল তান্ত্রিকমতাবলম্বী লোক, তাঁহার পুরোহিত যে তাড়াতাড়ি পূজা সারিয়া আর পাঁচ জন যজমানের কাজ সারিতে যাইবেন তাহা হইবার যো নাই। তিনি জানেন, যথাশাস্ত্র কালীপূজা শেষ করিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি লাগে, তাই প্রতিবৎসর তাঁহার বাড়ীতে পূজার প্রকরণটা কিছু বিস্তারিতভাবেই হইয়া থাকে। কালী-পূজার রাত্রে পূর্ব দিক ফরসা হইবার অধিক পূর্বে তাঁহার বাড়ীতে কেহ আহারে বসিতে পায় না। তাই আহারের অনুরোধেই যাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, তাঁহারা কালীপূজার রাত্রে এ বাড়ীতে প্রসাদ পাইবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাইতেন না !

কিন্তু সান্যালবাড়ী গোবিন্দপুরের ছোকরা বাবুদের পক্ষে একটি প্রধান আকর্ষণের স্থান। সান্যালবাড়ী তাঁহাদের একটি প্রকাণ্ড আড্ডা ; আমোদপ্রিয় পল্লীযুবকগণের আবশ্যক পান তামাক, গান বাজনা, তাস, পাশা প্রভৃতি সকল সামগ্রীরই এখানে উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। আফিসের নব্য আমলা ও শিক্ষানবিশগণ, স্কুলকলেজের নামকাটা গ্রাম্যজমীদারগণের বংশধরবর্গ ও তাঁহাদের মোসাহেবের দল আজ সভাস্থল জুড়িয়া বসিয়া আছেন। দেওয়ালে একটি বিবসনা সুন্দরী পরী, বাহুবিস্তার করিয়া, সুদৃশ্য পাখা মেলিয়া, যেন কোন দূরতর রাজ্যে উড়িয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। তাহার এক হাতে একটি সুন্দর গোলাকার ঘড়ি, ঘড়িতে টক্‌টক্‌ করিয়া শব্দ হইতেছে ; দুই তিন হস্ত ব্যবধানে উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় ছবি, দেবসভা, সমুদ্রমন্থন, নন্দনকাননে অপ্সরীগণের প্রমোদনৃত্য—ইত্যাদি নানা প্রকার বিচিত্র দেশীয় চিত্র। প্রত্যেক চিত্রের নিকট এক একটি ছোট ব্রাকেট, তাহার উপর কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল,—ভিস্তি জল লইয়া যাইতেছে, ভারে দেহ অবনত ; ঘোড়ার সহিস মাথায় এক বোঝা ঘাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; দরজী চশমা চোখে দিয়া কাপড় শেলাই করিতেছে, অন্ধ বামহস্তে লাঠি ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া ভিক্ষা চাহিবার ভঙ্গিতে

দাঁড়াইয়া আছে—ইত্যাদি। শুভ্র ফরাসের উপর একধারে তাস, অন্যধারে পাশা চলিতেছে। বংশলোচন সান্যালের মধ্যম পুত্র পদ্মলোচনবাবু বাঁয়া তবলায় বিশেষ দক্ষ। তিনি মস্তক, গ্রীবা ও মুখের বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া, কখনও দ্রুত তালে, কখন বা ধীরে তবলা বাজাইতেছেন, আর তাঁহার নিকটে বসিয়া একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক একটা স্থূলোদর সেতারের তারে ঝঙ্কার দিয়া অতি গম্ভীর আওয়াজে গাহিতেছে,—

"কে এ রমণী নীরদবরণী
শবহৃদি 'পরে সমরে নাচিছে!"

গান শুনিয়া তাস খেলিতে খেলিতে কোন কোন যুবক ভাবাবেশে 'আহা হা!' বলিয়া তাল দিতেছে, এবং পরক্ষণেই গানের প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল না রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ইস্তকাবিন্তি' কাবার করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে দ্যূতক্রীড়াসক্ত কোনও যুবক আরও অধিক উৎসাহের সহিত চীৎকার করিয়া জানাইতেছে যে, তাহার সহযোগী এইবার 'কচে বারো' মারিতে পারিলে স্বর্ণ দ্বারা তাহার করপল্লব বাঁধাইয়া দিবে!—ইতিমধ্যে ভগ্নপাইক আসিয়া সংবাদ দিল, "কাঁসারীপাড়ায় মোষবলি হচ্ছে; আর বেশী দেরী নেই।"

তৎক্ষণাৎ গান, বাজনা, খেলা, সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। মজলিস ভাঙ্গিয়া সকলে বারোয়ারীতলায় ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বারোয়ারীতলা জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। বারোয়ারীতলায় একটি নূতন ও সুদৃঢ় হাড়িকাঠ প্রোথিত হইয়াছে; যে হাড়ি-কাঠে পাঁঠা বলি হয়, এই হাড়িকাঠ তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। চারি জন লোক নূতন দুইগাছি দড়ি দিয়া উৎকৃষ্ট মহিষটাকে বাঁধিয়া হাড়িকাঠের নিকটে লইয়া আসিল।

তখন গভীর রাত্রি। উৎসবের শত শত দীপ বহুপূর্বেই নিবিয়া গিয়াছে, কেবল পূজামণ্ডপে দুই চারিটা মশাল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। তথাপি যেন চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; গ্রামখানি প্রায় সুপ্তিমগ্ন; কেবল এই বারোয়ারীতলায় দর্শকগণের চক্ষুতে নিদ্রা নাই, নানা বর্ণের দোলাই, বালাপোস, বনাত, বা র‍্যাপার গায়ে, গ্রাম্য দর্শকগণ নিদ্রাহীননেত্রে কৌতূহলপূর্ণদৃষ্টিতে মহিষবলি দেখিতেছে। চারি জন লোকেও মহিষটাকে আয়ত্ত রাখিতে পারিতেছে না, সে একবার মশালের দিকে, একবার পুঞ্জীভূত দর্শকগণের দিকে ভীতিবিহ্বলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এবং শৃঙ্গ নত করিয়া এক একবার ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

হাড়িকাঠের কাছে একটি অগভীর গর্ত কাটা হইয়াছে; মহিষটাকে সেই গর্তের মধ্যে নামাইয়া হাড়িকাঠের মধ্যে তাহার গলা পুরিয়া তাহাতে খিল আঁটিয়া দেওয়া হইল। চারি জন লোক তাহার পদচতুষ্টয়ে চারিগাছি শক্ত দড়ি বাঁধিয়া তাহার পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া সজোরে টানিতে লাগিল। মহিষের সর্বশরীর সিক্ত, তাহার ললাট সিন্দুররঞ্জিত। নিকটে অসুরাকৃতি কামার সুবৃহৎ শাণিতখড়্গহস্তে

দণ্ডায়মান, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ,—বোধ করি, কিছু অধিকমাত্রায় মায়ের প্রসাদ পাইয়াছে,—মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা, কোমরে গামছা বাঁধা, লোকটাকে হঠাৎ দেখিলে যমদূত বলিয়াই ভ্রম হয়।

হাড়িকাঠের খিলে মহিষের গলাটি আটকাইয়া ফেলা হইলে, এক জন লোক স্খলিতস্বরে বলিল, "কৈ রে! লংকা বাটা কৈ? আঁচ না দিলে মজা হবে কেন?" মজা দেখিবার জন্য একজন লোক খানিক লংকা বাটা লইয়া আসিল। দুই তিন জন সহচর মহা উৎসাহে সেই লংকা বাটা মৃত্যুমুখকবলিত মহিষের নাকে মুখে গুঁজিয়া দিল। লংকার ঝাল নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে প্রবল যন্ত্রণায় মহিষ কিরূপ ছট্ ফট্ করে, তাহা দেখিয়া আমোদলাভ করিবার উদ্দেশ্যেই এই উপায় অবলম্বিত হয়। আর এই নিষ্ঠুর আমোদ দেখিবার জন্য সকলে বিস্ফারিতনেত্রে দণ্ডায়মান!

খুব জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল; কামার খাঁড়াখানি ভাল করিয়া বাগাইয়া ধরিল। সমস্ত বিকাল বেলাটা ধরিয়া তাহাতে শাণ দেওয়া হইয়াছে, মশালের বিক্ষিপ্ত আলোক খড়্গে পড়িয়া চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

লংকা বাটার ঝাল নাকে মুখে প্রবেশ করিবামাত্র মহিষটা ভয়ংকর গর্জন করিয়া উঠিল; নিকটে যে সকল লোক দাঁড়াইয়াছিল, এই বিকট গর্জন শুনিয়া তাহারা দশ হাত পিছাইয়া গেল। যে চারি জন লোক পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহিষের পা-বাঁধা দড়ি চারিগাছি ধরিয়া টানিতেছিল, মহিষের পদের আস্ফালনে আর তাহারা সামলাইতে পারিল না, সটান মাটিতে পড়িয়া গেল! তৎক্ষণাৎ দু' জনের হাত হইতে দড়ি সরিয়া পড়িল; সেই মুহূর্তেই কামার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া খাঁড়াখানি মাথার উপর উদ্যত করিল, কিন্তু সে আর মহিষের স্কন্ধে আঘাত করিবার অবসর পাইল না! পা একটু আলগা পাইয়াই মহিষ উপরের দিকে এমন একটি প্রবল ঝিঁকে মারিল যে, হাড়িকাঠ দুই হাত মাটী ভেদ করিয়া উঠিয়া পড়িল; মহিষটাও সংগে সংগে চারি পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সিং নীচু করিয়া লেজ তুলিয়া হাড়িকাঠটা গলায় ঝুলাইয়া লইয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে এক দিকে ছুটিয়া চলিল। আর কাহার সাধ্য তাহাকে ধরে! সকলে শুধু সবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল, এবং যে দিকে মহিষ ছুটিয়া চলিল, সেই দিকের লোকেরা ভয়ে পৃষ্ঠভংগ দিল; এক জনের গায়ের উপর আর দশ জন পড়িতে লাগিল! দর্শকগণের মধ্যে একটা মহা কলরব উত্থিত হইল। দশ বারো জন লোক উৎসর্গীকৃত মহিষের পশ্চাতে ছুটিল, কিন্তু তিমিরাবৃত অরণ্যানীবেষ্টিত গ্রাম্য-পথ দিয়া মহিষ যে ঊর্ধ্বপুচ্ছে কোথায় অন্তর্ধান করিল, কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না!

অর্ধেক আমোদ নষ্ট হইল বলিয়া দর্শকগণ আক্ষেপ করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। উৎকৃষ্ট মহিষ হাড়িকাঠ লইয়া পলাইল দেখিয়া বারোয়ারীর পাণ্ডারা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া ছবির মত অনেকক্ষণ এক স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এবং হয়ত কোন অজ্ঞাত কারণে তাহারা মা কালীর রোষভাজন হইয়াছে স্থির

করিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল।

পরদিন সকাল বেলা নদীর পর পারে নিশ্চিন্তপুরে মহিষটাকে পাওয়া গেল। সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হাড়িকাঠ নূতন করিয়া পুঁতিয়া তাহাকে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু আমোদটা আর তেমন জমিল না। একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা কাঁসারীপাড়ার লোকদের মন হইতে কিছুতেই দূর হইল না।

অনেকে সেই দিন প্রভাতেই কালীপ্রতিমা নিঃশব্দে নদীজলে বিসর্জন করিয়া আসিল। জবা ও পদ্মফুলে স্নানের ঘাট পুরিয়া উঠিল, এবং গ্রামের ছেলেরা স্নান করিতে আসিয়া সেই সকল ফুল ধরিবার জন্য আস্ফালন, লম্ফন ও সন্তরণে নদীর জল আবিল করিয়া তুলিল।

বেলা শেষ হইলে ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হইতে প্রতিমা বাহির হইয়া বাজারের দিকে চলিল। এক এক পাড়ার প্রতিমাগুলি একত্র সারি বাঁধিয়া বাহির হইল। সর্বপ্রথমে খাস ও নিশান, তাহার পর বাদ্যভাণ্ড, তাহার পশ্চাতে পাঁচ, সাত, বা দশখানি প্রতিমা সারি বাঁধিয়া চলিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিমাখানি সকলের পশ্চাতে। গ্রাম্য জমীদারের বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় প্রতিমার সঙ্গে অনেক পাইক ও বরকন্দাজ চলিল ; পাছে তাহারা অন্য জমীদারের লোক-লস্করের সঙ্গে মারামারি করে এই আশঙ্কায়, লাল-পাগড়ী-ওয়ালা চাপরাসধারী পুলিসের কনেষ্টবলেরা রুল ঘুরাইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুলিস ফৌজের অগ্রে পুলিসের দারোগা ফয়জদ্দী মিঞা গোঁফে তা দিতে দিতে পরমগম্ভীরভাবে ঐরাবতের মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পায়ে নাগোরা জুতা ; পরিধানে সাদা পাঁতলুনের উপর কাল কোট ; মাথায় বি. পি. অক্ষরাঙ্কিত কাল গোল-টুপি ; দারোগা সাহেবের গোঁপদাড়ি কপিশ বর্ণে রঞ্জিত, কিন্তু প্রাচীন কেশের স্বাভাবিক শুভ্রতা তাহাতে ঢাকা না পড়িলেও, তাঁহার বয়স যে তিন কুড়ি উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা তাঁহার সার্ভিস-বহি দেখিয়া কোনরূপেই নির্ণয় করা যায় না। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে কেবল অহিফেনের সহায়তায় দেহকে যে প্রকার অবিকৃত রাখিয়াছেন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে বৃদ্ধাপবাদ প্রদান করিতে পারিবে না।—বিশেষতঃ, কোরাণের সম্মানরক্ষার জন্যই তিনি, তিনটি বিবি বর্তমানেও, প্রায় ছয় মাস হইল, একটি 'খাপ্‌সুরত' বিবিকে 'নিকা' করিয়াছেন!

গ্রাম্যবাজার লোকে লোকারণ্য! স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা,—চাষার ছেলে-মেয়েরা পূজা দেখিবার কাপড় পরিয়া, কেহ মেরজাই গায়ে আঁটিয়া, কেহ বা ঘাড়ের উপর ভাঁজ করা ধোপদস্ত চাদর ফেলিয়া, সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে ; ঢাকীদের ঢাকের কাছে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। গ্রাম্য কালীতলায় আসিয়া গ্রামের সমস্ত প্রতিমাগুলিকে দুই সারিতে বিভক্ত করিয়া রাস্তার ধারে নামান হইল ; কাঁসারীপাড়ার বারোয়ারীর প্রতিমা ঠিক সন্ধ্যার সময় আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া সেখানে উপস্থিত করা হইল। যাহারা তক্তারামায় প্রতিমা সাজাইয়া বাহির করিয়াছিল, তাহারা তক্তারামার লাল নীল 'বেলে'র মধ্যে বাতি জ্বালিয়া দিল।

অনেকে মশাল, রঙমশাল, 'মহাতাপ' জ্বালিয়া লইল ; এবং অন্ধকার গাঢ় হইলে সকলে একত্র মিলিয়া নদীর দিকে চলিল।

সমবেত ঢাকের প্রবল বাদ্যে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ নদী-তীর পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে গেল। কেহ কেহ সাজ খুলিয়া, কেহ কেহ বা সাজ সমেত, নদীজলে প্রতিমাবিসর্জন করিয়া, গৃহে ফিরিল। ডাকের সাজ ও প্রতিমার ছটা ঘাড়ে লইয়া বাহকগণ যখন গৃহাভিমুখে ফিরিল, তখন ঢাক আবার উচ্চ রবে বাজিতে লাগিল, এবং শানাই তীব্রস্বরে আপনার হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বিসর্জনের বাজনায় বিগত-উৎসব আলোকহীন সংকীর্ণ গ্রাম্য পথে নিরানন্দ ভাব ও অবসাদ সূচিত করিতেছিল।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

গোবিন্দপুরের বাগচী-বাড়ী একেবারে গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত। বাড়ীর অদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি, এই কার্তিক মাসেও তাহাতে জল থৈ থৈ করিতেছে! দীঘির পরপারে গোচারণের মাঠ; রাখালেরা সেখানে গরু চরায়, গান করে, অদূরবর্তী ধানের জমীর আইলে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর 'কপাটী' খেলে, এবং ঝিল্লীরবমুখরিত হেমন্তের শীতল সন্ধ্যায় গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পথের ধারে খেজুর গাছের স্কন্ধবিলম্বিত 'ঠিলি' খুলিয়া রস খায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে দৈবাৎ কলসীর মধ্যে নিহিত মানকচুর টুকরার সন্ধান না পাইয়া নিঃসন্দেহচিত্তে কটুরস পান করিয়া সমস্ত রাত্রি মুখ চুলকাইয়া মরে!

দীঘির এক পাশে একটা পোড়ো মাঠের উপর কতকগুলি বুনো আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। এই নূতন পল্লীখানির নাম 'বুনোপাড়া'। বুনোরা চাষবাস করে, গৃহস্থের বাড়ী 'কৃষাণী' করে, বাড়ীতে শাকসবজী লাগাইয়া তাহাও বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। বুনোদের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী; 'রেজাগিরি' করিয়া ইহারা জীবিকা অর্জন করে। গোবিন্দপুর অঞ্চলে কাহারও অট্টালিকার জন্য সুরকীর আবশ্যক হইলে, তাহা এই বুনো স্ত্রীলোকেরাই প্রস্তুত করে; ইহারই নাম রেজাগিরি; এই কর্মটিতে বুনো রমণীদিগের একচেটিয়া অধিকার। অনেক বুনো ঘরে বসিয়া খায়, তাহাদের মেয়েরা অর্থোপার্জন দ্বারা তাহাদের প্রতি-পালন করে। ইহা তাহাদের একটি অবশ্যকর্তব্য কর্ম। বুনোদের বিবাহে একটি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে;—বিবাহ শেষ হইলে বরটি ধীরে ধীরে একখানি কুটীরের চালের উপর উঠিয়া বসে, আর তাহার বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে আহ্বান-

পূর্বক অনুনয়ের সহিত বলিতে থাকে,—

"চালে থেকে নামো তুমি,
ঘুঁটে কুড়িয়ে পুষবো আমি।"

কোন কোন বুনো স্ত্রীর এই অভয়বাণীকেই চিরজীবনের সম্বল মনে করিয়া এক পয়সাও উপার্জন করে না; তাহাদের কাজের মধ্যে উৎসব-উপলক্ষে ধেনো মদ খাওয়া, এবং মাদল বাজাইয়া গান করা। মাদল বাজাইয়া যখন তখন ইহারা অন্যের দুর্বোধ্য বিচিত্র সুরে গান গাহিয়া স্তব্ধ শান্তিপূর্ণ গ্রামে একটা বিকট কলরবের স্রোত প্রবাহিত করে।

কালীপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বুনোপাড়া হইতে উৎসবের শেষ চিহ্ন এখনও অন্তর্হিত হয় নাই;—দিবারাত্রি সংগীতধ্বনি ও মাদলবাদ্যের বিরাম নাই।

বাগ্‌চীদের মেয়ে চারুশীলা এবার অনেক দিন পরে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। আশ্বিনমাসের শেষেই তাহার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু সে আজ দুই বৎসর ভাইফোঁটা দেয় নাই; শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া জানাইল, ভাইফোঁটার পর কার্তিক মাসের শেষে বা অগ্রহায়ণের প্রথমে তাহাকে লইয়া গেলেই ভাল হয়। চারু শাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূ, তিনি বধূকে বড় ভালবাসিতেন, বধূ তাঁহাকে কখনই পুলিসের মত ভীতিদায়ক জীব বলিয়া মনে করিত না। শাশুড়ী বধূর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; অগ্রহায়ণের প্রথমেই দাসী ও পাল্কী পাঠাইবেন, এ কথা লিখিয়া চারুকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

চারুশীলার বয়স এই সবে তের বৎসর। মুখখানি যেমন সুন্দর, স্বভাবটি তেমনই মিষ্ট! মুখে সর্বদাই হাসি লাগিয়া আছে; চক্ষু দুটি কোমল ভাবে পূর্ণ। চারু বড়লোকের বধূ হইলেও, মায়ের শিক্ষাগুণে, এই বয়সেই অনেক গৃহকর্ম শিখিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু বাপের বাড়ী আসিয়া তাহার তিন বৎসরের ছোট ভাইটিকে কোলে পিঠে করিয়া, তাহার মুখে পুনঃপুনঃ চুম খাইয়া, এক শত বার তাহাকে ভিন্ন রকমে সাজাইয়া, তাহার দিন কাটিয়া যাইত। বাপের বাড়ী আসিয়া দুই-এক দিন অন্তরই সে তাহার ছোট বোন লক্ষ্মীর ঝাঁকড়া চুলের গোছা ও কতকগুলি গুছি লইয়া চুল বাঁধিতে বসিত, কিন্তু দুই তিন ঘন্টা চেষ্টা করিয়াও সে মনের মত করিয়া চুল বাঁধিতে পারিত না; তখন সে রাগ করিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে চারিগাছ মলের ঝঙ্কার তুলিয়া দীঘিতে জল আনিতে যাইত। জল বহিবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যার আগে গর্তের পাশ দিয়া বনের ধার দিয়া ছোট পিতলের কলসীটি কাঁকে লইয়া একবার তাহার দীঘিতে না গেলেই চলিত না।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্বদিন রাত্রি হইতে চারুর চক্ষে ঘুম নাই! কখন রাত্রি পোহাইবে, কতক্ষণে সে ভাইফোঁটার আয়োজন করিবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! অনেক রাত্রে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্বদিক ফরসা হইবামাত্র চারুর ছোট বোন লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাজি লইয়া ফুলবাগানে ফুল তুলিতে গেল। কার্তিক মাসের প্রথম হইতেই যমপুকুর পূজা করিবার নিয়ম। সে এবার পুকুরপূজা করিতেছে ; তুলসীতলায় সে একটা ছোট—এক হাত লম্বা পুকুর কাটিয়াছে ; পুকুরে জল ঢালিয়া তাহার মধ্যে হেলাঞ্চা কলিমুর লতা পুতিয়া দিয়াছে ; পুকুরের পাড়ে হলুদ গাছের চারা লাগাইয়াছে ; তাহার পাশে মুগ কড়াই ছিটাইয়া দিয়াছে ; মুগের অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—এখনও তাহা পল্লবিত হয় নাই। পাছে ছাগল কি গরুতে লক্ষ্মীর সাধের পুকুরের লতাপাতাগুলি খাইয়া যায়, কি কাহারও ছেলেমেয়ে ভাত খাওয়ার পর তাহা স্পর্শ করিয়া 'পচাইয়া' দেয়, এই ভয়ে চারু পুকুরটি কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছে,—সম্মুখে একটি ছোট কঞ্চির দরজা, দড়ি দিয়া বাঁধা।

লক্ষ্মী শিউলীতলায় আসিয়া সাজি ভরিয়া শিউলী ফুল কুড়াইল। প্রস্ফুটিত সুন্দর শিশিরসিক্ত ফুলগুলি লোহিত বৃন্তের শুভ্র কোমল সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া বৃক্ষমূল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে. আর বালিকা রক্তিম ঊষায়, জীবজগৎ জাগ্রত না হইতেই, ফিঙেগ তাহার তরুকোটর হইতে বাহির হইবার পূর্বেই, দহিয়াল তাহার পুচ্ছ খুলিয়া মুক্ত আকাশে একবার খানিকটা উড়িয়া আসিয়া বাঁশের উচ্চতম শাখায় বসিয়া ঊষার আগমনীগান ধরিবার পূর্বেই, বনদেবীর মত ফুল কুড়াইয়া সাজি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর, গোটাকত জবা, করবী, স্থলপদ্ম, উঁচু উঁচু ডাল নোয়াইয়া পাড়িয়া লইয়া গিয়া, ফুলগুলি তাহার ক্ষুদ্র পুকুরের ধারে মানের পাতায় ঢালিয়া রাখিল। পুকুরটির চারিদিক সযত্নে নিকানো হইলে, তাহার চারি দিকে ফুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে তাহার মনে পড়িল যে, পূর্বদিন রাত্রে শুইবার সময় তাহার দিদি তাহাকে খুব ভোরে জাগাইয়া দিতে বলিয়াছিল।

লক্ষ্মী পুকুর সাজাইতে সাজাইতে উঠিয়া গিয়া দিদিকে ডাকিল। চারু উঠিয়া দেখিল, সকলেই জাগিয়াছে ;—চারি দিক পরিষ্কার ; উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে। চারু লক্ষ্মীর উপর রাগ করিয়া বলিল, "এতখানি বেলা হয়েছে, এখনো আমাকে জাগিয়ে দিস্‌নি কেন রাক্ষসী?" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "সত্যি দিদি! আমি সেকথা ভুলেই গিয়েছিলাম, পুকুর সাজাতে সাজাতে মনে পড়ে গেল, তা এখনও বেশী বেলা হয় নি।"

চারু কাপড় ছাড়িয়া দূর্বা তুলিতে গেল। ফুলবাগানে চামেলী গাছের জাফরীর কাছে বেশ বড় বড় সুন্দর দূর্বা জন্মিয়াছিল ; চারু কতকগুলি দূর্বা তুলিয়া সেগুলি ধুইয়া একখানি রেকাবীতে রাখিল। তাহার পর চন্দনপাটা পাড়িয়া খানিক চন্দন ঘষিল। ধান দূর্বা ও চন্দনে রেকাবখানি সাজান হইলে, চারুবালা পিসীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লক্ষ্মীকে বামার বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

চারুশীলাদের বাড়ীর কাছেই বামার ঘর। বামা জাতিতে কৈবর্ত, শুদ্ধ শান্ত ও অতিপবিত্রচরিত্রা বিধবা ; তাহার নির্মল চরিত্রের জন্যই সে পুরলক্ষ্মীগণের

শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পাত্র হইয়াছিল। সংসারে সে নিতান্ত একাকিনী ; কিন্তু গোবিন্দপুর গ্রামের সকল গৃহস্থেরই ঝি বৌ যেন তাহার আপনার জন ! গ্রামের পুরুষবর্গের সহিত তাহার একটা না একটা সম্বন্ধ আছে,—কেহ তাহার দাদা, কেহ কাকা, কেহ মামা, ইত্যাদি। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহার একটা সাধারণ পদবী দিয়াছিল,—সে সকলেরই পিসী। যে বালক বাল্যকালে বামাকে পিসী বলিয়া ডাকিয়াছে, এখন সে যুবক, পুত্রের পিতা ; কিন্তু এখন তাহার শিশু পুত্রটিও বামাকে দেখিবামাত্র দুটি হাত বাড়াইয়া স্খলিতস্বরে আদর করিয়া বলে, "পিতি ! তোলে নে !" কেহ যদি কখন বামাকে জিজ্ঞাসা করে, "বামা ! সংসারে ত তোমার কেউ নেই, তোমার দিন চলে কি ক'রে ?" তাহা হইলে বামা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উত্তর দেয়, "কেন ? আমার এমন সব সোনার চাঁদ ভাইপো ভাইঝি থাক্‌তে আমার অভাব কি ?"

সত্যই সংসারে বামার কোনও অভাব নাই। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। সে যে গরীব, সংসারে সে যে দুঃখিনী বিধবামাত্র, তাহাকে দেখিলে, বা তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে, এ কথা একবারও কাহারও মনে উদিত হয় না। পল্লীবধূগণ তাহাকে আপনাদের সুখদুঃখভাগিনী ভগিনীর ন্যায় মনে করে ; গৃহকর্ত্রীগণ সৎপরামর্শদাত্রী হিতৈষিণী বলিয়া মনে করেন। কোন যুবতী শাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন, তিনি বামার নিকট আপনার মর্মব্যথা প্রকাশ করিয়া দুঃখভার লাঘব করিলেন। বামা হাসিতে হাসিতে সেই রূঢ়ভাষিণী শাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিল, এবং নানা কথার প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে বলিল, "হ্যাঁ দেখ মাসীমা, তুমি তোমার বৌর মনে ওরকম ক'রে কষ্ট দিও না ; তোমার ত ঐ একটি বৈ বৌ নয়, তোমার কথা শুনে মুখভার ক'রে থাকে, তা কি তোমারই দেখ্‌তে ভাল লাগে ? দোষ দেখ্‌লে দু' কথা বুঝিয়ে বলাই ভাল, ছেলেমানুষ বৈ ত নয়। মনে ব্যথা দিয়ে কথা বললে কাউকে কখনও আপনার করা যায় না।" বামা এমন ভাবে কথা পাড়ে, এবং এমন সাবধানে তাহার মন্তব্য প্রকাশ করে যে, গৃহিণী তাঁহার বধূর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিবারই অবসর পান না। শেষে বামা বধূকে ডাকিয়া শাশুড়ী-বধূর মনোমালিন্য দূর করিয়া দেয়।

ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলাইতে, তাহাদের ঘুম পাড়াইতে, বামার মত ক্ষমতা গোবিন্দপুরের কোন রমণীরই ছিল না। ছেলেমেয়েরা তাহার অত্যন্ত বাধ্য। দশ বৎসর বয়সে চারুশীলার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরদিন সকাল বেলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চারু চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছিল।—সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে না। প্রিয়তমা শিশু কন্যাকে বিদেশে নিতান্ত অপরিচিত লোকের বাড়ী পাঠাইতে হইবে ভাবিয়া, চারুর মার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু বিদায় না দিয়া ত উপায় নাই ! কাহাকে তাহার সঙ্গে পাঠান যায়, এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল ; বাড়ীর দাসদাসীদের অনেকের কথাই উঠিল, কিন্তু চারু বাঁকিয়া বসিয়াছে, সে কাহারও সঙ্গে যাইতে রাজী নহে। অবশেষে মা যখন বলিলেন,

"তোমার বামা পিসী তোমার সঙ্গে যাবে, কেঁদ না, লক্ষ্মী মা আমার!" তখন চারু অনেকটা স্থির হইয়াছিল ; সে বুঝিয়াছিল, বামা পিসী সঙ্গে থাকিলে আর তাহার কোন ভয় নাই! যেন সেই বর্ষীয়সী বিধবা সেই দূর দেশের অপরিচিত গৃহ হইতে অতি সাবধানে মায়ের অঞ্চলের নিধি মায়ের কাছে পুনর্বার ফিরাইয়া লইয়া আসিবে। গৃহিণী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বামা চারুর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল, এবং ছাঁদলাতলায় দাঁড়াইয়া সস্নেহে অঞ্চল দিয়া চারুর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল,

"চারু যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে বামা পিসী, সঙ্গে সেজেছে!"

কুনো বিড়ালের বদলে বামা পিসী সঙ্গে গেলে কেমন হয় চারু?" তখন এই বিষাদময় বিদায়দৃশ্যের মধ্যে, অশ্রুতে তাহার চোখের পাতা ভিজে থাকিলেও, মেঘের অন্তরালপথে প্রাতঃসূর্যের স্নিগ্ধ কিরণের ন্যায় মৃদুহাস্যে চারুর ওষ্ঠ-প্রান্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

সেই সময় হইতেই চারুর সঙ্গে বামার বেশী আত্মীয়তা হইয়াছিল। নিজের কোন কাজ পড়িলেই সে বামাকে ডাকিত। আজ সকালে লক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া আনিলে বামা স্মিতমুখে বলিল, "কি মা চারু, আজ সকালে আবার পিসীকে কি দরকার? শ্বশুরবাড়ী কিছু খবর-টবর নিয়ে যেতে হবে নাকি?" বিবাহের সময় ছাঁদলাতলায় দাঁড়াইয়া তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিনে বামা পিসী চারুকে যে কথা কয়টি বলিয়াছিল, সে আজও তাহা ভোলে নাই। তাই হাসিয়া বলিল, "না পিসী, একবার তুমি কুনো বিড়ালের কাজ করেছ, আর তোমাকে কুকুর বিড়ালের কাজ কর্তে হবে না! তুমি এই টাকাটা নিয়ে বাজারে যাও, ভাল ঝাড়া পান আর ভাল সন্দেশ-টন্দেশ যা পাও নিয়ে এস গে, আজ যে ভাইফোঁটা।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ক্রয় বিক্রয়ের কিছু ধূমধাম আছে বলিয়া আজ খুব সকালেই বাজার বসিয়াছে। বামা পানের দোকানে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া এক পণ ঝাড়া পান কিনিল ; কিন্তু এক পণ পান কিনিতে তাহাকে দেড় পণ কথা খরচ করিতে হইল। বারুই মাগী ভারি 'বেচাল', পানের গোছার উপরে ও নীচে দুই দশটা বড় পান দিয়া ভিতরে 'কুলের পাতার মত' ছোট ছোট পান পুরিয়া দিয়াছে। বামাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা! বামা পানের গোছা খুলিয়া ফেলিল, এবং বাছিয়া বাছিয়া ছোট পানগুলি বাহির করিয়া ফেরত দিল ; নিজের হাতে বড় বড় পান বাছিয়া লইল, হাসিয়া বলিল, "কেবল বোঁটা গুণে পয়সা দেব, পয়সা ত দিদি, এত সস্তা নয়!" বারুইপত্নী বলিল, "এমন বাছা বাছা পান আমি কাউকে দিইনে।" বামা তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিল, "এক পণ পানের জন্যে এতগুলি পয়সাও আমি কাউকে দিইনে!"—বারুইবৌ চুপ করিয়া গেল। বামা কেমন পদার্থ, তাহা গোবিন্দপুরের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে গ্রামের ময়রারা ছাবার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়াছে।

বামা এই ছাপা, গোল্লা ও রসগোল্লা প্রভৃতি কয়েক রকম মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। চারু এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া সুপারী কাটিতেছিল। সুপারী কাটা শেষ হইলে সে পান সুপারী, ধনের চাল, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ মশলা দুই-এক মুষ্টি দিয়া তিনখানি রেকাবী ও বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া আর তিনখানি রেকাবী সাজাইল ; তাহার পর ভাইফোঁটা দিবার জন্য মাঝের ঘরে তিনখানি আসন পাতিল ; পরিষ্কার গেলাসে তিন-গেলাস জল রাখিল ; রেকাব কয়েকখানি বিবিধ মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া চারু লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী, দুই দাদাকে আর যোগীনকে ডেকে আন ; আর তুইও কাপড় ছেড়ে আয় : কিছু খাস্ টাস্ নি তো ? তুইও ফোঁটা দিবি।"

লক্ষ্মী তাহার আঁচল লুটাইতে লুটাইতে, কালো কুঞ্চিত কেশের নিবিড় স্তবক দোলাইতে দোলাইতে, উপেন ও যোগীনকে ডাকিতে গেল। সুরেন সকলের ছোট, তাহার বয়স তিন বৎসর মাত্র, চারু তাহাকে একখানি নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া, গায়ে জামা, পায়ে মোজা পরাইয়া দিল, এবং ক্রেপের চাদরখানিতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, মাথায় নরম পাতলা চুলগুলির মধ্যে একটি সিঁথি কাটিয়া, তাহাকে একখানি আসনের উপর বসাইয়া দিল।

উপেন ও যোগীন কাপড় চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত হইয়া আসনের উপর বসিল। তাহাদের দেখাদেখি সুরেনও কোন প্রকার অস্থিরতা প্রকাশ করিল না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রেকাবীর উপর সজ্জিত স্তূপাকার সন্দেশের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল !

চারু প্রথমে বামহস্তে রেকাব হইতে ধান দূর্বা তুলিয়া তিনবার তাহার দাদার মাথার উপর দিল, এবং বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া চন্দন লইয়া দাদার কপালে তিনবার তাহা স্পৃষ্ট করিল, তাহার পর মশলা, পান ও সন্দেশে পূর্ণ দুখানি রেকাবী দাদার উভয় হস্তে স্থাপন করিয়া নতমস্তকে ভূমিস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর চারু ছোট ভাই দুটির কপালে ফোঁটা দিল। যোগীন চারুকে প্রণাম করিল দেখিয়া, সুরেনও দিদির পায়ের কাছে মাথা লুটাইল।

এইবার লক্ষ্মীর ফোঁটা দিবার পালা। দিদির দেখাদেখি লক্ষ্মীও ভাইফোঁটা দিল। চারু হাসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী, তুই দাদাকে ফোঁটা দিলি, ভাইফোঁটার মন্তর বলেছিস্ ?" লক্ষ্মী দিদির দিকে মুখ তুলিয়া তাহার চক্ষুর উপর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া বলিল, "কোন্ মন্তর দিদি ? তুই ত মন্তর বলিস্‌নি !" চারু হাসিয়া বলিল, "দূর ছুঁড়ী, মন্তর কি চেঁচিয়ে বলে ? মন্তর মনে মনে বলতে হয় ; সেই যে তোকে বলেছিলাম, 'ভায়ের কপালে'—" লক্ষ্মী হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে,—

'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়্‌লো কাঁটা'।"

এমন সময় ঠাকুরদাদা মহাশয়,—গৌরবর্ণ, উন্নতদেহ, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুল-

গুলির অধিকাংশই শুভ্র, মুখে শিশুর ন্যায় সরল প্রসন্ন হাস্য,—সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীগণ তাহাদের উৎসব লইয়া মহাব্যস্ত ! এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সুকোমল স্নেহার্দ্র হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং এই জীবনসন্ধ্যায় বাল্যকালের এমনই একটি মধুর স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হৈমন্তিক প্রভাত, শৈশবের নিত্যসহচর প্রীতিপ্রফুল্ল ভাইভগিনীগণের সঙ্গসুখ, কথায় কথায় তাহাদের সঙ্গে আড়ি ও ভাব, পিতামাতার স্নেহোচ্ছ্বসিত শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি, একে একে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িয়া গেল ! আজ জীবনের এই প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়াও তাঁহার মনে হইল,—সে যেন সেদিনের কথা ! কিন্তু শৈশবের সেই আনন্দময় খেলাঘর এখন ভগ্ন ; বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে আর কেহ নাই, সেই সকল চিরপরিচিত মুখ একে একে পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়াছে। কেবল তিনিই একা সকলের স্মৃতি বুকে ধরিয়া, সকলের চিন্তার ভার মাথায় লইয়া, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি জীর্ণ সেতু নির্মাণ করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন ; এক অভিনব জগতে বাল্যের সেই সুমধুর খেলার পুনরভিনয় দেখিতেছেন। তাই তিনি চারু ও লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, “আজ তোরা দুই বোনে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইফোঁটা দিচ্ছিস্ ! আমি বুড়োটা কি তোদের কেউ-ই নই ? হায় হায় ! বুড়ো ব'লে কি একবার জিজ্ঞাসা করিতেও নাই ? আজ আমি তোদের কি ক'রে বোঝাব যে, আমিও একদিন ঐ উপেন যোগীনের মত ছেলেমানুষ ছিলাম, আমারও কপালে ফোঁটা দিবার লোক ছিল ?”

চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদামহাশয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “দাদাম'শায় ! তোমার জন্যে অনেক সন্দেশ আলাদা ক'রে তুলে রেখেছি ; তুমি সে দিন যে ভাইফোঁটার একটা শোলোক বলেছিলে, সেইটে আবার বল না ?”

দাদামহাশয় চারুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার কোমল পুষ্পস্তবক-তুল্য প্রফুল্ল গাল দুটি টিপিয়া বলিলেন, “তুই ত পর হ'য়ে গিয়েছিস্ রে চারু ! তোকে ত আর বেঁধে রাখবার যো নেই। লক্ষ্মী এখনও পর হয় নি, ও এখনও আমার মাথার পাকা চুল দুই একগাছা তুলে দেয় ! লক্ষ্মী দিদিকে এখন একটি রাঙ্গা বরের কোলে তুলে দিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচি ! তখন বুড়ো মাথাটা এক-মাথা পাকা চুল নিয়ে জ্বালাতন হয়ে মর্‌বে,—কি বলিস্ লক্ষ্মী ?”

লক্ষ্মী সুরেনের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরদাদাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল ; বলিল, “দাদাম'শায়, আজ আমি তোমার মাথা থেকে একশ'টা পাকা চুল তুলে দেব, শোলোকটা বলে দাও !” দাদামহাশয় বলিলেন, “সে শ্লোক কি তোদের মুখ দিয়ে বেরোবে ? শোন তবে, দাদাকে ভাত দিবার সময় বলতে হয়,—

'ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥'

তা তোরা ত ভাইফোঁটা দিলি, এখন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানোর কি হবে ?”

চারু বলিল, "আমরা কি রাঁধতে একেবারেই জানিনে দাদাম'শায়? দাও না তুমি বাজার থেকে তরি-তরকারী আনিয়ে, রাঁধ্‌তে পারি কি না দেখ!"

"আচ্ছা দেখি আজ, কেমন রাঁধতে শিখেছিস্‌—যদি জিনিসপত্রগুলো নষ্ট করিস্‌ ত সেই শ্যালার কাছ থেকে সব জিনিসের দাম আদায় করবো!"

চারু কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "কার কাছ থেকে আদায় করবে বল্লে দাদাম'শায়?"

দাদামহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আরে তোর বর! আর কোন শ্যালার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আছে?"

চারু এবার অপ্রতিভভাবে গর্জন করিয়া উঠিল, "যাও দাদাম'শায়, তুমি ভারি দুষ্টু!"—সে হঠাৎ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

দাদামহাশয় নাতিনী-সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া বাজারে চলিলেন।

আজ বাজারে নানাপ্রকার জিনিসের আমদানী হইয়াছে। দাদামহাশয় বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাল মাছ, পটোল, বেগুন, লাল আলু প্রভৃতি তরকারী কিনিলেন। বাজারে সকল তরকারী কিনিতেও হইল না. বুনো-বাড়ী হইতে লাউ ও সূর্য্যিকুমড়ো আনাইয়া লওয়া হইল। পালঙ্‌ শাক. শিম ঘরের বাগানেই যথেষ্ট ছিল। নানারকম তরকারী, ডাল, মাছ, মুড়িঘণ্ট, তিলপিটুলি বেগুনভাজা, লাল-আলুর গুড়-অম্বল, নলেন গুড়ের পায়েস,—দেখিতে দেখিতে একটা ভোজের আয়োজন হইল! মুড়িঘণ্ট ও পায়েস চারুর মা রাঁধিলেন; মাছ. কলায়ের ডাল ও দুই তিনখানি তরকারী চারু নিজে রাঁধিল; বিধবা পিসীমা নিরামিষ তরকারী, সুক্তানি গুড়-অম্বলে সিদ্ধহস্ত—সেগুলি তিনিই রাঁধিয়া দিলেন।

দাদামহাশয় নাতি-নাতিনীদের সঙ্গে লইয়া আহারে বসিলেন। তিনি কলায়ের ডাল খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, ডালটা কে রেঁধেছে রে? অনেক দিন এমন চমৎকার ডাল খাইনি।"—চারু আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া দাদামহাশয়ের পাতের উপর হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "রান্না ভাল হয়নি ব'লে বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে! ঠাকুমার মত রান্না শিখ্‌তে পারিনি ব'লে এত ঠাট্টা কেন দাদাম'শায়? ঠাকুমার যদি একবার দেখা পাই ত রান্নাটা তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শিখে নিই।"

দাদামহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তোর ঠাকুমা ভালই রাঁধতো বটে. তা তুইও খাসা রাঁধতে শিখেছিস্‌;—তোর রান্না খেয়ে তোর শ্বশুর ভারি খুসী হবে।"

এই প্রশংসায় চারুর মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিল। সে আর এক বাটী ডাল আনিয়া দাদামহাশয়ের পাতে ঢালিয়া দিল। বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ সর্বনাশ! কল্লি কি চারু? বুড়ো বয়সে খাওয়া দাওয়ার উপর একটু লোভ হয় বটে. তা এতখানি কলায়ের ডাল খাইয়ে কি বুড়ো দাদাকে মেরে ফেল্‌বি?"

সকলে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিলেন। চারু পান ছেঁচিয়া একখানি রেকাবীতে করিয়া তাহা দাদামহাশয়ের কাছে আনিয়া দিল। তিনি আহারান্তে

শয়ন করিয়া গড়গড়ার নলে ওষ্ঠসংযোগ করিলেন ; লক্ষ্মী তাঁহার মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাকাচুল তুলিতে লাগিল। এক দুই করিয়া সে চুলগুলি গণিতে লাগিল। ক্রমে দাদামহাশয়ের নয়নপল্লবেও নিদ্রার আবির্ভাব হইল ; তিনি বলিলেন, "কত চুল তুলবি ভাই? ও যে গুণে ফুরোবে না! যা, তুই খেলা কর্‌গে।"

ছুটি পাইয়া লক্ষ্মী সুরেনের সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্ধ্যাকালে দাদামহাশয় কাপড়ের দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুইখানি ঢাকাই শাড়ী আনিয়া দুই ভগিনীকে দান করিলেন ; বলিলেন, "তোদের ভাই-বোনের মধ্যে চিরদিন যেন এমনই ভাব থাকে, তোদের হাসিমুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন এ বুড়োর বাকি দিন ক'টা সুখে কেটে যায়।"

অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে পড়িতে চারু শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু পিতৃগৃহের এই বৈচিত্র্যময় আনন্দস্মৃতি তাহার কোমল হৃদয়ে অনেকদিন জাগরিত ছিল।

কার্তিকের লড়াই

কার্তিক পূজার পর দিন অপরাহ্ণে গ্রামের কার্তিকগুলিকে পথে বাহির করিয়া যে উৎসব হয়, তাহারই নাম আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'কার্তিকের লড়াই'। দেব-সেনাপতির যুদ্ধোদ্যমের কোনও লক্ষণ ইহাতে প্রকাশিত না হইলেও, ইহা যে 'কার্তিকের লড়াই' নামে কি জন্য খ্যাত, তাহা নির্দেশ করা কঠিন ; তবে নামটি বহু পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোবিন্দপুর গ্রামে কার্তিকের লড়াই একটি বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ উৎসব।

কার্তিকপূজার পাঁচ সাত দিন পূর্ব হইতে গোবিন্দপুরের কুমোরেরা মাটীর কার্তিক গড়িতে আরম্ভ করে। গ্রামে সত্তর প'চাত্তরখানি কার্তিকের পূজা হইয়া থাকে ; কোন কোন বাড়ীতে জোড়া কার্তিকের পূজা হয় ; রমণীগণ অনেকে 'মানসা' করিয়া কার্তিকপূজা করেন। এই সকল কার্তিকের অধিকাংশই কুমার-বাড়ীতে নির্মিত হইয়া থাকে। সাধারণ কার্তিক একখানা দুই তিন টাকা মূল্যেই পাওয়া যায়। যাঁহাদের বাড়ীতে 'অসাধারণ' কার্তিকের পূজা হয়, তাঁহারা বাড়ীতে কুমোর আনাইয়া কার্তিক গড়াইয়া লন। সাধারণ কার্তিকগুলি একই ছাঁচে গঠিত,—হয়ত কোন কোনখানি একটু বৃহদায়তন, কিন্তু পরাণ চৌধুরী ও পীতাম্বর হালদারের বাড়ীর কার্তিক যেমন অসাধারণ, তাঁহাদের কার্তিকের লড়াইয়ের আড়ম্বরও তদনুরূপ অতিরিক্ত। এই দুই ব্যক্তির কার্তিকপূজাতেই গ্রাম উৎসব-মুখর হইয়া উঠে।

কার্তিক মাস চিরকালই ত্রিশ দিনে শেষ হয় ; এ মাসের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পূর্বে প্রায় সকল উৎসবগৃহেই ঢাক বাজিয়া উঠিল।

কুমোরের বাড়ী হইতে সকলের চণ্ডীমণ্ডপেই কার্তিকের শুভাগমন হইয়াছে।

অনুচ্চ বেদীর সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া, বেদীতে কতকগুলি ধান ছড়াইয়া, তাহার উপর কার্তিকের অধিষ্ঠানের স্থান হইয়াছে। কার্তিক ঠাকুর ময়ূরের উপর গম্ভীর-ভাবে বসিয়া আছেন ; মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল,—কালি দিয়া পাট রঙ করিয়া এই চুল প্রস্তুত হইয়াছে ; কোনও কার্তিকের গোঁফ কালি দিয়া অঙ্কিত ; কোনও কার্তিকের ওষ্ঠে গোঁফের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই,—অত্যন্ত কিশোর। সকল কার্তিকেরই এক হাতে ধনুক, অন্য হস্তে শর। কেহ শরের গায়ে পাখীর পালক ও ডগায় ইস্পাতের ফলা লাগাইয়া কার্তিকের বীরত্বের কিঞ্চিৎ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে ; কেহ কঞ্চি দিয়া তীর ধনুক প্রস্তুত করিয়া কার্তিকের হাতে দিয়াছে ; —অস্ত্র-আইন-শাসিত দেশে দেবসেনাপতির উপযুক্ত হাতীয়ার! কার্তিকের পায়ে মাটীর জুতা, কাল রঙের উপর ঘামতেল মাখাইয়া দেওয়াতে তাহা ঠিক বার্ণিশ জুতার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। কার্তিকের পরিধানে পট্টবস্ত্র ; কেহ বা শান্তি-পুরে লাল কল্কাপেড়ে ধুতি পরাইয়া দিয়াছে ; কেহ বা তাহার কার্তিকটি নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখিয়া, ঢাকাই বা নীলাম্বরী কাপড়েই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কার্তিকের করতল হিঙ্গুলরঞ্জিত, ঘন হরিতালের প্রলেপে সর্ব-শরীর পীত, দেহের পীতাভা পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পরিধের বস্ত্রের কোঁচা সম্মুখভাগে গোঁজা ; কোন কার্তিকের কোঁচা ময়ূরের পিঠের উপর দিয়া পদপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, কোঁচান চাদর স্কন্ধে ঝুলিতেছে, বাহুতে ডাকের গহনা, মাথায় তাজ ; কোন কোন কার্তিকের সজ্জা দেখিয়া নববিবাহিত গ্রাম্য যুবকের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রার কথা মনে পড়ে! এমন বীর দেবতার বাহনেরও বীরত্বপ্রদর্শনে কুণ্ঠা নাই! কার্তিককে পিঠে লইয়া বাহন ময়ূর বেচারা কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিতেছে না! সে তাহার সুদীর্ঘ গলদেশ বক্র করিয়া সুতীক্ষ্ণ ওষ্ঠে একটা সর্পের গলদেশ, ও দক্ষিণ পদে তাহার লেজ ধরিয়া আকর্ষণের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, আহত সর্পের মুখ হইতে সূক্ষ্ম দ্বিধা-ভিন্ন জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রসারিত ময়ূরপুচ্ছে কুমোরেরা কৃত্রিমচাঁদ আঁকিয়া দিয়াছে ; কোন কোন কার্তিকের ময়ূর গোটাকতক আসল ময়ূরপুচ্ছ পশ্চাতে বাঁধিয়া ধন্য হইয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটা ছোট শামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছে। মধ্যে কোনও অবলম্বন না থাকায় তাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য একটা বাঁশের ঠেকো দিয়া তাহাকে উঁচু করিয়া তোলা হইয়াছে। শামিয়ানার সঙ্গে দড়িতে গোটা দুই তিন কাচের লণ্ঠন ঝুলিতেছে, লণ্ঠনের ভিতর এক পয়সা দামের ছোট ছোট কেরো-সিনের টিমি, তাহা হইতে আলো অপেক্ষা অধিকপরিমাণ ধূম নির্গত হইতেছে ; ধূমে লণ্ঠনের কাচগুলি কালিমাখা হইয়াছে। কার্তিকের দুই পাশে লম্বা লম্বা দুটি কাঠের দীপগাছায় মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছে ; সম্মুখে পূজার উপকরণ সজ্জিত ;—এক পাশে গোটাকতক হাঁড়ি—তাহার মধ্যে আতপ চাউল ; বারকোসে ডাল, ডালের উপর কাঁচকলা, আলু ; কলার পাতায় খানিক সৈন্ধব লবণ।

পল্লীরমণীগণ আজ কার্তিকের ব্রতপালনের জন্য উপবাস করিয়া আছেন। অপরাহ্নকালে পুরোহিত ঠাকুর যজমানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বহু-পুরাতন, বিবর্ণ, তালপত্রনির্মিত লম্বা পুঁথিখানি খুলিয়া উপবাসনিরতা সংযত-হৃদয়া রমণীগণকে কার্তিকের জন্মকথা শুনাইতেছেন। দক্ষিণা অতি সামান্য,—একটি পয়সা, বা দুই একটি সুপারী ; পুরোহিত ঠাকুর তাহাতেই সন্তুষ্ট।

পরিবার বৃহৎ ও সংসার অসচ্ছল হইলেও গ্রাম্য-পুরোহিত জনার্দন সার্ব-ভৌম মহাশয় যজমানদিগের নিয়ত হিতকামনা করেন। যজমানের সুখ ও ঐশ্বর্য-কালে তিনি নিজের 'প্রাপ্য গণ্ডা' তাহার কাছে আদায় করিয়া লন বটে, কিন্তু যজমানের দুঃসময়ে পারিশ্রমিকের কোন আশা না রাখিয়া তাহার গৃহের ক্রিয়া-কর্ম পরমসহিষ্ণুচিত্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সার্বভৌম মহাশয় লোকটি অনতিদীর্ঘ। মাথায় খাট চুলের মধ্যে একটি হ্রস্ব টিকি, দিবসের অধিকাংশ সময়েই সেখানে একটি না একটি ফুল গোঁজা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দাড়ি গোঁফ কামানো, ললাটে একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা ; গ্রীষ্মকালে তিনি 'রাধাকৃষ্ণ'-নামাঙ্কিত নামাবলীতে দেহ আবৃত করিয়া রাখেন, কিন্তু শীত পড়িলেই তাঁহার পৈতৃক লাল বনাতখানি বাহির করেন ; দীর্ঘকালের ব্যবহারেও তাহা বিবর্ণ হয় নাই ; পাছে তাহাতে তেল কি কোন প্রকার ময়লা লাগে, এই ভয়ে সার্বভৌম মহাশয় প্রথমে তাঁহার মস্তক ও দেহ সাদা উড়াণীতে ঢাকিয়া তাহার উপর বনাতখানি গায়ে দেন। তাঁহার বামহস্তে সর্বদাই একটি শামুক থাকে, সেই শামুকের গর্ভে তিনি তাঁহার স্বনির্মিত নস্য রাখেন। ছেলেরা 'হাডু ডুডু' বা দাণ্ডাগুলি খেলিতে খেলিতে যেমন দেখিতে পায়,—সার্বভৌম মহাশয় পথ দিয়া যাইতেছেন, অমনই তাহারা খেলা বন্ধ রাখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, সকলেই একবাক্যে বলে, "দাদাঠাকুর, একটু নস্য !"—দাদাঠাকুর শামুকটির ঢাকনী খুলিয়া প্রশান্তহাস্যে সকলের হাতে এক এক বিন্দু নস্য ঢালিয়া দেন,—ছেলেরা মহানন্দে তাহা নাসারন্ধ্রে পুরিয়া সজোরে টানিতে থাকে, এবং হাঁচিয়া কাশিয়া চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তোলে !

আজ ব্রতকথা শুনাইতে হইবে বলিয়া সার্বভৌম মহাশয় পট্টবস্ত্রখানি পরিধান করিয়া যজমানবাড়ী আসিয়াছেন। পায়ে একজোড়া ঠনঠনের চটি,—তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার এক যজমান কলিকাতা হইতে এই চটি আনাইয়া দিয়াছিলেন ;—পথের ধূলায় সেই তালি-খচিত অতি প্রাচীন চটি জুতার জীর্ণ অঙ্গ ধূসরিত, তাহাতে পুরোহিত ঠাকুরের জানু পর্যন্ত আচ্ছন্ন। যজমানবাড়ীতে পদার্পণ করিয়া প্রথমে তিনি এক ঘটি জলে পদপ্রক্ষালন করিলেন ; অনন্তর সিক্তপদে একখানি কুশাসনে বসিয়া তিনি পুঁথির পাতায় দৃষ্টিস্থাপন করিয়া সুর করিয়া কার্তিকের জন্মকথা পাঠ করিতে লাগিলেন।

রমণীগণ সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে নতদৃষ্টিতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই মধুর শ্লোক শুনিতেছেন ; সকলেই চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল।

কেবল দুই-এক জন বর্ষীয়সী বিধবা হরিনামের ঝোলার মধ্যে চারিটি অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কাঠের মোটা মালা ছড়াটি ঘুরাইতেছেন, এবং একবার ঘুরান শেষ হইলেই ঝোলাটি ধীরে ধীরে ললাটে স্পৃষ্ট করিয়া পুনর্বার নূতন করিয়া জপ আরম্ভ করিতেছেন। পুরোহিত অনর্গল পুঁথি পড়িয়া যাইতেছেন।

পাঠ সাঙ্গ করিয়া পুরুতঠাকুর অন্য এক যজমানের গৃহে চলিলেন। আজ তাঁহার বিস্তর কাজ, সকল যজমানের বাড়ীতে ব্রতকথা শুনান শেষ হইলে তিনি পূজা করিতে বাহির হইবেন ; তাঁহার অনেক যজমানের বাড়ীতেই কার্তিকপূজা হয়।

পূজাবাড়ীতে কার্তিকের অদূরে প্রতিবেশিনী বিধবাগণ নূতন হাঁড়ি আনিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই হাঁড়ির নাম "বরের হাঁড়ি"। বিধবারা পরদিন এই হাঁড়িতে পাক করিয়া উপবাসের পারণ করিবেন।

পরাণ চৌধুরীর বাড়ীতে আজ পূজার কিছু অতিরিক্ত ধূম। পরাণ চৌধুরী জমীদার মানুষ। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন ; কয়েক বৎসর হইল, পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। কন্যাদায়গ্রস্ত স্বশ্রেণীস্থ ভদ্রসন্তানগণের ও তাঁহার হিতৈষিবর্গের অনেক অনুরোধেও তিনি পুনর্বার পাণিগ্রহণে সম্মত হন নাই। যুবতী কন্যাই তাঁহার একমাত্র অভিভাবিকা। কন্যার পুত্রাদি না হওয়াতে চৌধুরী মহাশয় মহা-সমারোহে কার্তিকপূজা করিয়া আসিতেছেন। যদিও এ পর্যন্ত ইহাতে কোনও ফললাভ হয় নাই, তথাপি প্রতি বৎসরই চৌধুরীভবনে ষড়ানন নির্বিঘ্নে পূজা পাইতেছেন ; সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দপুরের ভদ্র অধিবাসিগণ, ইস্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত, ডাকঘরের বৃদ্ধ ডাকমুন্সী ও তাঁহার ছোকরা কেরাণী, দেওয়ানী ও ফৌজ-দারী আদালতের হেড কেরাণী, সেরেস্তাদার, পেস্কার, নাজীর, মুহুরী প্রভৃতি আমলাবর্গ, এমন কি, পেয়াদারা পর্যন্ত কার্তিকপূজার রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া থাকেন। কেবল গ্রাম্য থানার দারোগা গমেজউদ্দীন মিঞা মুসলমান বলিয়া নিমন্ত্রিত হন না। কিন্তু প্রতি বৎসর কার্তিকপূজার পর দিন তাঁহার বাসায় একটা খাসী, পাঁচ সের ময়দা, তিন সের ঘৃত, আধ সের লবণ ও আরও নানাবিধ সামগ্রীপূর্ণ সিধা প্রেরিত হয়। সরকার বাহাদুরের চাকর হইলেও গমেজউদ্দীন মিঞা নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নহেন ; সুতরাং অপরাহ্নে যখন প্রতিমা বাহির হয়, তখন তিনি তাঁহার জমকালো পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ কনেষ্টবলদলকে পশ্চাতে লইয়া পরাণবাবুর কার্তিকের অগ্রবর্তী হইয়া চলেন, এবং চৌধুরী মহাশয়ের কার্তিক কোনও অপরিসর পথে আসিয়া পড়িলে, যদি অন্য লোকের কার্তিক দৈবাৎ তাহার সম্মুখে পড়ে, তাহা হইলে তিনি মহাগর্জনে পরাণবাবুর কার্তিকের পথ পরিষ্কার করিয়া সরকারী কর্তব্যপালন করেন !

রাত্রি নয়টার সময় গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা চৌধুরী মহাশয়ের বহির্বাটিতে সমাগত হইলেন। অধিকাংশ পল্লী-যুবকের মস্তকেই কম্ফর্টার

জড়ান, যেন বর্ণপরিচয়ের এক একটি 'ঙ' মাথায় পাগড়ী দিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট! কাহারও গায়ে সার্জের চাদর, বা বালাপোশ ; পায়ে ষ্টকিং ; কাহারও হাতে বাঁশের, কাহারও হাতে কাঠের ছড়ি। এ সময়ে পল্লী অঞ্চলে প্রায়ই কুকুর ক্ষেপিয়া থাকে, তাই ছড়ি ভিন্ন কাহাকেও পথ চলিতে দেখা যায় না। অধিকাংশ ভদ্রলোকই পুরাতন চটি বা তালি-দেওয়া গোড়ালি-বর্জিত পাদুকায় পদ ঢাকিয়া আসিয়াছেন, নিমন্ত্রণের লোভে নূতন জুতা হারাইতে ইঁহাদের কাহারও আগ্রহ নাই।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে শামিয়ানার নীচে গোটাকতক 'ঝাড়' ও 'হাঁড়ি' ঝুলিতেছে : তাহা হইতে বাতির স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। আঙ্গিনায় একটা বড় সতরঞ্চি পাতা, চারি পাশে আরও কয়েকখানি মাদুর বিস্তীর্ণ। আজ এখানে কার্তিকপূজা উপলক্ষে 'ঢপ' হইবে ; একজন বয়স্কা ও একটি কিশোরী গায়িকা 'ঢপ' গাহিবে!—আহারাদি শেষ হইলেই পালা আরম্ভ হইবে।

কিন্তু আহারাদির কিছু বিলম্ব আছে, তাই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বাহিরের আটচালায় বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। দেওয়ালে কতকগুলি 'দেওয়াল-গিরিতে' বাতি জ্বলিতেছে। উপরে চাঁদোয়া : চাঁদোয়া ভেদ করিয়া যে তিনগাছি দাড়ি ঝুলিতেছে, তাহাতে তিনটি 'বেল' টাঙ্গান,—দুই দিকে দুটি সবুজ, মধ্যে একটি লাল বেল। নীচে সতরঞ্চির উপর ফরাস বিছানো, শুভ্র ফরাসের উপর পিতলের বৈঠকে দুই তিনটি রূপা-বাঁধানো হুঁকা, চারি ধারে অনেকগুলি স্থূলোদর 'গেন্দা' বালিশ,—শুভ্র বালিশগুলি অতি বৃহৎ চালকুমড়োর মত পড়িয়া আছে! চৌধুরী মহাশয় একটি তাকিয়া ঠেস দিয়া অর্ধনিমীলিতনেত্রে রৌপ্যনির্মিত কারুকার্যখচিত ফর্সীর দীর্ঘ নল মুখে পুরিয়া তাম্রকূটসুধা পান করিতেছেন ; অম্বুরী তামাকের সুবাসিত ধূম কুণ্ডলীকৃতভাবে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। চৌধুরী মহাশয়ের পাশেই একখানি বৃহৎ রৌপ্যময় রেকাবীতে একরাশি পান, একটা পানের উপর খানিক চুণ। চৌধুরী মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া অনেক গ্রাম্য ভদ্রলোক উপবিষ্ট। ইঁহাদের অনেকেই বেকার, কেহ কেহ উমেদার। চৌধুরী মহাশয়ের মনস্তুষ্টিসাধনই ইঁহাদের এখন প্রধান ব্রত। ইঁহাদের কেহ পান চিবাইতেছেন, কেহ বাঁধা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার চাটুয্যে বাবুদের একটা ফৌজদারী মকদ্দমায় জব্দ হইবার গল্প বলিতেছেন ; সেই গল্প চৌধুরী মহাশয়ের কর্ণে যেন সুধাসেচন করিতেছে। গল্প করিতে করিতে তাম্রকূটপায়ী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কলকেটাতে কিছু নেই বোধ হচ্ছে।" অমনি চৌধুরী বাবু তাকিয়া হইতে মস্তকটি ঈষৎ ঊর্ধ্বে তুলিয়া হুঙ্কার করিলেন, "নীলে, তামাক দিয়ে যা! পাজী বেটারা সব থাকিস্ কোথা?"

নীলে ওরফে নীলমণি খানসামা তখন প্রাঙ্গণের পাশে, যেখানে একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছিল, সেইখানে বসিয়া বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্যবর্গের সঙ্গে হাস্যামোদে

কালক্ষেপণ করিতেছিল। তাহারও তখন পুরা মজলিস ; পরদিন কে কিরূপ বাহার দিয়া কার্তিকের লড়াই দেখিতে বাহির হইবে, বর্তমান মুহূর্তে তাহারই প্রসংগ হইতেছিল। কিন্তু নীলুর শ্রবণেন্দ্রিয় বিলক্ষণ সজাগ ছিল। কর্তা মহাশয়ের হুংকার তাহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র সে সভা ত্যাগ করিল, এবং "দন্ডে দন্ডে তামাক! একটু যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো, তার যো নেই"—এই মন্তব্য উচ্চারণ করিতে করিতে তামাক সাজিতে গেল ; এবং গুঁড়ির আগুনে কলিকা পূর্ণ করিয়া থামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কলিকাতে দুই একটা দম দিয়া তাহা মোসাহেব বাবুর হুঁকার উপর স্থাপন করিল! চৌধুরী মহাশয়ের ফরসী-শীর্ষস্থ জিঞ্জিরি-শোভিত রূপার সরপোশ-ঢাকা প্রকাণ্ড কলিকাতে তাওয়া চড়ান ছিল, আড় চক্ষে সে চাহিয়া দেখিল, তখনও তাওয়াতে গুলের আগুন গন্ গন্ করিতেছে, সুতরাং আপাততঃ কর্তার কলিকা-পরিবর্তন করিবার আবশ্যক নাই বুঝিয়া, সে আবার নিজের সভায় কম্বলের উপর আসিয়া বসিল।

যথাকালে চন্ডীমন্ডপে আহারের স্থান হইল। সারি সারি কুশাসন, কলাপাত ও মাটীর গেলাস পড়িয়া গেল। আহার করিতে যাইবার পূর্বে সকলে একবার ঠাকুরদালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিয়া লইলেন। চৌধুরী বাবুর বাড়ীতে কার্তিক চিরদিনই রাজবেশে পূজা গ্রহণ করেন। গোবিন্দপুরে আর কোনও বাড়ীতেই রাজকার্তিক দেখা যায় না। সুতরাং এ কার্তিকের সম্মান অন্য সকল কার্তিকের অপেক্ষা অধিক। রাজকার্তিকের মস্তকে সুবর্ণপ্রভ কিরীট, কর্ণে কুন্ডল, এক হস্তে সুচিত্রিত শরাসন, অন্য হস্তে শর ; পরিধানে রক্তবর্ণ সাটীনের ইজার চাপকান, তাহার উপর সোনালী রঙের চুমকী বসান, পায়ে জরীর জুতা, একটি সুরঞ্জিত চিত্রশোভিত মৃৎসিংহাসনে রাজকার্তিক উপবিষ্ট। ময়ূর-যুগলের পৃষ্ঠদেশে এই সিংহাসন সংস্থাপিত ; ময়ূর দুটি মৃত্তিকানির্মিত, কিন্তু তাহাদের সর্বাংগ ময়ূরপক্ষ দ্বারা সুকৌশলে সমাবৃত, তাহাদের কন্ঠদেশে জীবিত ময়ূরের ন্যায় ময়ূরকন্ঠী পালক,—পশ্চাতে দীর্ঘ পুচ্ছ ; কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ তার দিয়া একত্র বন্ধ, পুচ্ছগুলি ময়ূরযুগলের পশ্চাতে সুকৌশলে সজ্জিত, এবং শতচন্দ্র-সমন্বিত পরমশোভাময় সেই প্রসারিত পুচ্ছ কার্তিকের পৃষ্ঠদেশে সুদৃশ্য 'চালি'র মত শোভা পাইতেছে।—যেন ময়ূর দুটি আনন্দে ও গর্বে অধীর হইয়া পেখম ধরিয়াছে! কার্তিকের ময়ূরাসনের প্রান্তভাগে চারিটি সোপান, সর্বনিম্নতম সোপানের উভয় প্রান্তে দুই জন মৃন্ময় বরকন্দাজ,—স্কন্ধে সংগীন-শোভিত বন্দুক, বাম পার্শ্বে কোষবদ্ধ তরবারি, মস্তকে শুভ্র-পালক-খচিত জরির টুপি, গন্ডদ্বয়ে গালপাট্টা, ললাটে লোহিত ত্রিবীর তিলক ; তাহারা উভয়ে অধরদংশন পূর্বক যেন কোনও অনির্দিষ্ট অনধিকার প্রবেশাকাঙ্ক্ষীর দিকে ভ্রূকুটীকুটিল তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ইহার উপরের সোপানের উভয় প্রান্তে দুইটি অশ্বারোহী সৈনিক ; অশ্বারোহিদ্বয় নীলবর্ণ অশ্বে আরূঢ়, অশ্বদ্বয় ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখের পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়া আছে। অশ্বারোহি-

দ্বয়ের পরিচ্ছদ ঘোর লোহিতবর্ণ, কটিদেশে কোমরবন্ধ, 'রেকাবদলে' ভর দিয়া বীরদ্বয় জীনের উপর বসিয়া আছে, বাম হস্তে লাগাম, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা, তাহার অগ্রভাগে সোনালি জগ্‌জগা ঝম্‌মক্‌ করিতেছে, বর্শা উদ্যত করিয়া বীরদ্বয় যেন কোন শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহার ঊর্ধ্বস্থ সোপানের উভয় পার্শ্বে দুইটি রমণীমূর্তি—পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে কালি দিয়া আঁকা চুড়ি, টানা টানা ভ্রূ,—ভ্রূযুগলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কালো টিপ ; রমণীদ্বয়ের বর্ণ হরিদ্রাভ, কেবল করতল ও ওষ্ঠাধর হিঙ্গুলের রঙে ডগ্‌ডগ্‌ করিতেছে, উভয়ের হস্তে এক একগাছি মোমের বিবিধবর্ণরঞ্জিত ফুলের মালা, তাহাদের লজ্জানম্র আয়ত নেত্র দুটি নাসা-বিলম্বিত উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নোলকের উপর ন্যস্ত। সর্বোচ্চ সোপানে দুইটি ক্ষুদ্রকায়া অপ্সরী, দেবশিশুর ওষ্ঠের মত সুন্দর দুইখানি প্রফুল্ল ওষ্ঠ, অতি মৃদুস্পর্শে বীণার তার যেমন কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠে, দেখিয়া বোধ হয়, তেমনই ভাবের মৃদুস্পর্শে এই দেবলোকবাসিনীদের ওষ্ঠও হাস্যবিকশিত হইয়া উঠিবে ; সুগোল সুগঠিত গোলাপী গণ্ডস্থলে যেন সরলতা ও প্রফুল্লতা ক্রীড়া করিতেছে ; বেগুনী রঙের বস্ত্রের ভিতর দিয়া অঙ্গের উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে ; মস্তকে কৃত্রিম লতাপুষ্পনির্মিত সুদৃশ্য মুকুট ; দক্ষিণ হস্তে বেণু ও বামহস্তে লোহিত পতাকা।

প্রতিমাদর্শন শেষ হইলে সকলে আহারে বসিলেন। আহার শেষ ও ঢপ আরম্ভ হইতে রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল।

কার্তিকের সম্মুখে প্রাঙ্গণতলে ঢপ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধেরা মস্তকে চাদর জড়াইয়া আসরে আসিয়া বসিল। যুবকেরা একটু দূরে বসিয়া সেকালের ও একালের ঢপের সমালোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে ঢপ, কবি, কীর্তন, পাঁচালী—সকল রকম গানের আলোচনা আসিয়া পড়িল। তর্ককোলাহল ক্রমে সমুচ্চ হইয়া উঠিল। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া কেহ ঢুলিতে লাগিল, কাহারও বা হাই উঠিতে লাগিল, কেহ বা অধীর হইয়া ঢপওয়ালীর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেদের এ সকল দিকে কিছুমাত্র খেয়াল নাই! তাহারা সতরঞ্চির প্রান্তভাগে বসিয়া বিষম জটলা বাধাইয়া দিয়াছে ; হাসি গল্পও চলিতেছে ;—আবার কেহ কাহাকেও কিল মারিতেছে, কেহ বা কিল খাইয়া প্রতিফলদানের জন্য চিমটি কাটিয়া তিন হাত দূরে সরিয়া বসিতেছে!

এমন সময় গান-আরম্ভ-সূচনাস্বরূপ বাদ্যযন্ত্রে দুই একটি মৃদু আঘাত হইল ; ক্ষণকালের মধ্যে সভাস্থলের কোলাহল মন্দীভূত হইল। যাহারা চিকের অন্তরালে বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহারা আলস্য ছাড়িয়া নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বৃদ্ধা ঢপওয়ালী কার্তিকের জন্মকাহিনী গাহিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধেরা তামাক টানিতে টানিতে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সেই গান শুনিতে লাগিল ; যুবকগণের তর্কস্রোতে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়িল ; বালকদিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ থামিয়া

গেল। বৃদ্ধা গায়িকা কখন কথায়, কখন দ্রুত ছড়ায়, কখন তাল-লয়-বদ্ধ অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত দীর্ঘ সুরে সেই অলৌকিক গাথা গাহিতে লাগিল।—বলদৃপ্ত দুর্দান্ত অসুরগণের নিদারুণ অত্যাচারে ত্রিদিবধাম শ্রীভ্রষ্ট ; বন্দনাগীতিমুখরিত নন্দন-কানন নিরানন্দ শ্মশানতুল্য ; মন্দাকিনীর আর সে শোভা নাই ; পারিজাতে আর তেমন গন্ধ নাই ; অপ্সরাদের প্রমোদনৃত্য থামিয়া গিয়াছে ; দেবগণ দুঃখে ম্রিয়-মাণ, অপমানে নতশির ; দেবেন্দ্রাণী শচী, কন্দর্পজায়া রতি—সকলেই দানবহস্তে অশেষরূপে নিগৃহীতা। ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় দেবরাজের সহস্র লোচন হইতে সহস্র ধারে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইতেছে।—বৃদ্ধার কোমলকণ্ঠনিঃসৃত দেবগণের দুঃখদৈন্যপ্লাবিত সকরুণ সঙ্গীতধারা শ্রোতৃবর্গের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় আপ্লুত করিয়া তুলিল ; সকলে স্থান কাল ভুলিয়া বহুপ্রাচীন যুগের একটি সংকটময় পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িল ; সেই বিষাদসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ও দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিক্রম করিতে করিতে, দর্শকের নয়নসমক্ষে শুভ্রতুষারকিরীটী কৈলাসের পদপ্রান্তবাহিনী সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনীর ফেনোর্মিমালা, বিজন শরবন, হরমনোমোহিনী নগেন্দ্র-নন্দিনী পার্বতীর মাতৃরূপ ও রজতগিরিনিভ দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্য মূর্তি মায়াচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; অবশেষে সকল চিত্র নিষ্প্রভ করিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দর, পঙ্কজলোচন, গৌরকান্তি, অমরবৃন্দবন্দনীয় শিশু-দেবতার মূর্তি তাহাদের চিত্তপটে প্রতিফলিত হইল। তখনও সেজের উজ্জ্বল আলোক চণ্ডীমণ্ডপ-মধ্যবর্তী ময়ূরাসন কার্তিকের সুন্দর মুখের উপর বিম্বিত হইতে-ছিল,—সকলে ভক্তিপরিপ্লুতহৃদয়ে সেই দেবমূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বৃদ্ধাগণ প্রাণ খুলিয়া গায়িকার প্রশংসা করিলেন ; রমণীগণের বিষাদ ও ব্যাকুলতা যেন আনন্দাশ্রু প্রবাহে ভাসিয়া গেল।

ঢপ চলিতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, হালদার-বাড়ী ছায়াবাজীর পুতুল-নাচ হইতেছে। শুনিয়া ছেলেরা আর মুহূর্তকালও সেখানে বসিল না, পাঠশালার ছুটি হইলে ছাত্রেরা যেমন এক সঙ্গে গোল করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হয়, ঢপের আসর হইতেও তাহারা সেই ভাবে বাহির হইয়া হালদার-বাড়ীর দিকে ছুটিল।

দুই পাশে বন, মধ্যে সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ ; সেই পথে হালদার-বাড়ী যাইতে হয়। পথের দুই ধারে আস্যাওড়া ও কালকাসিন্দের গাছ, লালভেরাণ্ডার জঙ্গল, চিতে ও জামালকোটার বেড়া দেওয়া গৃহস্থদের বাগান। কোথাও একপাশে এক ঝাড় বাঁশ,—আর এক দিকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। বাঁশ ও তেঁতুলের ঘন পল্লবের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে ; লতায় পাতায় খদ্যোতপুঞ্জ মিট্-মিট্ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে আলোকের স্ফুরণ করিতেছে, দূর মাঠে শৃগাল ডাকিতেছে ; গৃহস্থদের গৃহপ্রান্ত হইতে গ্রাম্যকুকুরগুলি চিরশত্রু শৃগালের কোলা-হলে উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতেছে। ছেলেরা ত্রস্তপদে এই গ্রাম্যপথে

ছুটিয়া চলিয়াছে। বাতাসে এক একবার পথপ্রান্তবর্তী গাছের পাতাগুলি নড়িয়া উঠিতেছে।—একটা শুষ্ক বটপত্র নৈশসমীরণপ্রবাহে শাখাচ্যুত হইয়া একটি ছেলের গায়ে উড়িয়া পড়িল, ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

হালদার-বাড়ী উপস্থিত হইয়া দর্শকগণ দেখিল, পূজার দালানের সম্মুখে একটা জায়গা চাটাই দিয়া ঘিরিয়া সেখানে পুতুল-নাচ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক চারি দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হালদার-বাড়ীতে তখন পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। আহারাদির বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ঠাকুরঘরে আলোকের কোনও আড়ম্বর নাই, একটা উচ্চ দীপ-গাছার উপর একটা মাটীর ডেল্‌কো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে ; কয়েকখানি নৈবেদ্য রেকাব দিয়া ঢাকা রহিয়াছে ; ঘরের মধ্যে একটিও লোক নাই, শুধু একটা ক্ষুধার্ত কালো বিড়াল সেখানে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল লোক ছায়াবাজীর পুতুল-নাচ দেখিতেই ব্যস্ত !

বাজনা বাজিতেছে, ছায়াবাজীর পুতুলেরা অদৃশ্য-হস্তচালিত হইয়া, নাচিতেছে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছায়াবাজীর দলের লোক তালে তালে পা ফেলিয়া নূপুর বাজাইতেছে ; দর্শকগণ ভাবিতেছে, বুঝি পুতুলের পায়েই নূপুর বাজিতেছে ! কিন্তু পটান্তরালবর্তী লোকগুলি চাপা গলায় অনুনাসিক স্বরে পুতুলের বক্তৃতাস্বরূপ যে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছে, সেগুলি কিছুমাত্র সুশ্রাব্য নহে।

ছায়াবাজীতে নানাপ্রকার দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছিল। একটা জেলে নদীর ধারে বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছে, দৈবক্রমে একটা কুমীর আসিয়া সেই বঁড়শী গিলিল, প্রকাণ্ড মাছ পড়িয়াছে ভাবিয়া জেলে ছিপ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে জলে নামিয়া পড়িল, জলে পদস্পর্শ হইবামাত্র কুমীর জেলের পা চাপিয়া ধরিল ; জেলে তখন ছিপখানি ফেলিয়া দিয়া হতভম্ব ভাবে দুই হাতে মাটী আঁকড়াইয়া ধরিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না। কুমীর তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া গেল। নদীটি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সাগরে পরিণত হইল ; সমুদ্রবক্ষে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা আসিয়া উপস্থিত !—গণেশকে কোলে লইয়া কমলে-কামিনী দূরে কমলবনে বসিয়া গণেশের মুখচুম্বন করিতেছেন,—রমণী পদ্মবনে বসিয়া হস্তী গিলিতেছেন ভাবিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময়ের সীমা নাই !

বায়স্কোপের ছবির মত মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র ও কমলবন অন্তর্হিত হইল। তখন দেখা গেল, পঞ্চবটীবনে জটাবল্কলধারী রামলক্ষ্মণের আবির্ভাব হইয়াছে ! সূর্পনখা নাচিতে নাচিতে আসিয়া লক্ষ্মণের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল। লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার নাসাকর্ণ কাটিয়া দিলেন। সূর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে দশমুণ্ড রাবণের কাছে গিয়া নাকি সুরে বলিল, 'দাঁদাঁ গোঁ দাঁদা, নখাঁ বেঁটা আঁমার নাঁক কাঁন কেঁটে নিয়েছে" ; দশানন এ কথা শুনিয়া

দশটা মাথা নাড়িয়া রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঘোরতর যুদ্ধ! হনুমান দীর্ঘলেজ লইয়া লাফাইয়া রাবণের মাথায় উঠিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া পলাইতে না পলাইতে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-উপলক্ষে ভীমের সঙ্গে রাজগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভীম একজন রাজাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া অন্য একজন রাজার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছেন, এবং দুই রাজাই মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। অর্জুন বাণবৃষ্টি করিয়া জন কত রাজাকে অস্থির করিয়া দিতেছেন ; দূরবর্তী ব্রাহ্মণেরা ভীমার্জুনের বিক্রম দেখিয়া হাত মুখ নাড়িয়া ও বিষম অঙ্গভঙ্গি করিয়া নানা প্রকার ইঙ্গিত করিতেছেন,—দেখিয়া দর্শকগণ পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল!

এই প্রকার বিবিধ দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় পুতুল-নাচ বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। উৎসবভবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এবং ঢাকীরা দুই একবার ঢাক বাজাইয়া মাথার কাছে ঢাকগুলিকে বিশ্রাম করিতে দিয়া কাঁথায় সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ ; চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার ; কেবল দূরবর্তী পল্লীতে চৌকীদারেরা এক একবার "এ গেরস্ত, জাগ হো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ ও গ্রামবাসিগণের নিদ্রিত চেতনাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রির উৎসববার্তা নূতন করিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিল। অপরাহ্নে তিনটার পূর্বেই কার্তিকের বরণ হইয়া গেল। প্রত্যেক বাড়ীতেই ঠাকুর বাহির করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাগচী-বাড়ীতে তক্তারামা সাজান হইল ; কার্তিক বাহকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তক্তারামায় প্রবেশ করিলেন। লোহিতবস্ত্রমণ্ডিত তক্তারামার প্রত্যেক ফোকরে দড়ি দিয়া কাচের 'হাঁড়ি' ও 'বেল' টাঙ্গানা,—'হাঁড়ি'গুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতি ; কার্তিকের সম্মুখে দুই দিকে দুইটি পরীর মূর্তি, মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বাতি বসাই-বার জন্য এক একটি ছিদ্র, তাহার ভিতর বাতি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁশের আড় বাঁধিয়া তাহার উপর কার্তিককে চড়াইয়া পথে বাহির করা হইল। যাহারা জোড়া-কার্তিক পূজা করিয়াছে, তাহারা দুই কার্তিককে বাঁশের মাচার উপর মুখোমুখি বসাইয়া বাজারের দিকে লইয়া চলিল।

দুই প্রহরের পর হইতেই বাজার লোকে লোকারণ্য। আজ দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। পথের ধারে কেবল দুইখানি পানের দোকান বসিয়াছে, জলচৌকীর উপর ছোট ছোট বাটীতে নানা রকম পানের মশলা। পাশে ছোট ঝোড়াতে পানের বিড়ে। মেছোবাজারে দুই এক ঝুড়ি মাছও আসিয়াছে। কিন্তু ক্রেতা অপেক্ষা আজ দর্শকের সংখ্যাই অধিক। মেছোবাজারে জনসংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। আজ সকলের মুখেই কার্তিকের লড়াইয়ের কথা। ছোট ছেলেমেয়ে হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলেই ভাল কাপড় পরিয়া রাস্তায়, বাজারের মধ্যে, ইঁদারার পাশে ও

বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া কার্তিকের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেলা চারিটার পর বাদ্যভাণ্ডসহকারে গ্রামবাসিগণ একে একে নিজ নিজ কার্তিক লইয়া বাজারে প্রবেশ করিল। আট দশখানি বাঁশ আড়াআড়ি করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর কার্তিকের 'পাট' বসান হইয়াছে ; 'পাট' বাঁশের সঙ্গে এমন শক্ত করিয়া বাঁধা হইয়াছে যে, কার্তিকের নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য নাই ! কার্তিকের আঁড় ঘাড়ে লইয়া আট দশ জন লোক চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 'নাচনের' বাজনা বাজিতেছে, আর লোকগুলি তালে তালে পা ফেলিয়া কার্তিককে নাচাইতে নাচাইতে চলিয়াছে।

ক্রমে দুই এক করিয়া অনেকগুলি কার্তিক বাহক-স্কন্ধে নাচিতে নাচিতে বাজারে প্রবেশ করিল। দত্তপাড়ার কার্তিক, বক্সীপাড়ার কার্তিক, কাঁসারীপাড়ার, তাঁতিপাড়ার, আচার্যপাড়ার,—সকল পাড়ার কার্তিক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ও বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জোরে জোরে বাজনা বাজিতেছে, আর বাহকেরা কার্তিক ঘাড়ে লইয়া নাচিতে নাচিতে বাজারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ধুলা উড়িতেছে ; ঢাক বাজিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধ্বনি উঠিতেছে ;—হর্ষকলরবের বিরাম নাই।

বেলা শেষ হইয়া আসিলে চৌধুরী বাবুদের রাজকার্তিক সদলবলে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন বাহক বাঁশ বাঁধিয়া রাজকার্তিকের সিংহাসন কাঁধে করিয়া চলিয়াছে,—এক জন লোক কার্তিকের সিংহাসনের পশ্চাতে বসিয়া দড়ি দিয়া ময়ূরপুচ্ছ টানিতেছে, অমনি পুচ্ছগুলি একবার সংকুচিত হইয়া যাইতেছে, আর সেই দড়ি ঢিল দিতেছে, অমনি ময়ূরপুচ্ছ আবার প্রসারিত হইতেছে ; সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক খাস, নিশান, ছাতি, আড়ানি লইয়া চলিয়াছে ; অনেকের হাতে মশাল, রঙমশাল ও মহাতাপ ; বড়লোকের চাকরেরা তাহাদের মনিবের ছোট ছোট ছেলেদের লাল সবুজ পোষাকে সাজাইয়া টুপী ও জুতা পরাইয়া কার্তিকের সঙ্গে সঙ্গে সজীব কার্তিকের মত তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া ফিরিতেছে ! চৌধুরীবাড়ীর কার্তিকের পশ্চাতে বাগচীবাড়ীর তক্তারামা। বাগচী-দের মেজ বাবু টেড়ি কাটিয়া, ফ্লানেলের শার্টের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া, এক হাতে কোঁচার অগ্রভাগ ও অন্য হাতে একখানি ছড়ি লইয়া তাঁহাদের কার্তিকের আগে আগে চলিয়াছেন। তাঁহার মুখে ব্যস্তভাব ! চলিতে চলিতে তিনি এক একবার পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া ঢুলীদিগকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সমান তালে বাজাই-বার হুকুম দিতেছেন, কাহারও পিঠে বা ছড়ির দুই একটা গুঁতা মারিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দিতেছেন, যেন এরূপ না করিলে তাঁহাদের কার্তিক লড়াইয়ে পরাস্ত হইবে ! এক এক পাড়ার কার্তিকের দল সমবেত বাদ্যভাণ্ড অগ্রবর্তী করিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া চলিয়াছে। সকলের পশ্চাতে দর্শকবৃন্দ ;—পথের ধুলায় তাহাদের জানু পর্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে ; ধুলা উড়িয়া তাহাদের নাকে মুখে প্রবেশ

করিতেছে, তথাপি সকলে পরমপুলকিতচিত্তে ভিড় ঠেলিয়া কার্তিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং কোনও পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর কাছে আসিয়া কর্তৃপক্ষের আদেশ-অনুসারে বেহারারা এক মিনিট কাল পথে দাঁড়াইয়া বাতায়ন-অন্তরালবর্তিনী অন্তঃপুরিকাদিগের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য কার্তিকের মুখখানি সেই দিকে ফিরাইয়া ধরিতেছে, এবং ঢাকীরা বাদ্যকুশলতা দেখাইবার জন্য ঘাড় ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া লম্ফঝম্ফসহকারে বিকট ঢক্কাধ্বনিতে সন্ধ্যার আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।

সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কার্তিকের 'আড়ং' গ্রাম্য কালী-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন ঢং ঢং করিয়া আরতির ঘণ্টা বাজিতেছিল, এবং পুরোহিত ঠাকুর ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ নাড়িয়া দেবীর আরতি করিতেছিলেন। কালীমন্দিরের সম্মুখে পথের দুই ধারে প্রতিমাগুলি নামাইয়া বাহকেরা কিছু-কাল বিশ্রাম করিয়া লইল। মন্দিরপ্রাঙ্গণ, মন্দিরের সন্নিকটবর্তী তমাল-তল দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ হইয়া গেল ; মশাল জ্বালান হইল ; বাতি, রঙমশাল প্রভৃতি জ্বলিয়া উঠিল ; দুই চারিটা হাউই হুস্ হুস্ শব্দে আকাশে উঠিয়া সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কার্তিকের বীরদর্প ঘোষণা করিতে লাগিল ; এক সঙ্গে তুমুলভাবে সমস্ত ঢাক বাজিয়া উঠিল, এবং বাহকেরা হরিধ্বনি করিয়া কার্তিক ঘাড়ে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পুনর্বার আলোকমালাবেষ্টিত জনকোলাহলপূর্ণ বাজারের মধ্য দিয়া নদীর দিকে চলিল।

নদীর কিয়দ্দূর হইতে দর্শকগণ গৃহমুখে ফিরিয়া আসিল। নদীতীরে কার্তিকের পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলিয়া লওয়া হইল। চৌধুরী বাবুদের রাজ-কার্তিকের তাজ, ময়ূরের পুচ্ছ, বস্ত্রাদি, সমস্ত খুলিয়া লইয়া, ক্ষুদ্রকায়া নদীর এক বুক জলে তাহাকে বিসর্জন দেওয়া হইল। তখন ঢাকের বোল পরিবর্তিত হইল ; অন্য প্রকার বাজনা বাজিতে লাগিল, এবং সানাইয়ের বিদায়কাতর সকরুণ হৃদয়ভেদী ক্রন্দন শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, 'কার্তিকের লড়াই' শেষ হইয়াছে।

নবান্ন

বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতেই নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসের একটি আনন্দপূর্ণ প্রয়োজনীয় গার্হস্থ উৎসব। পল্লীবাসিগণের মধ্যে হিন্দুমাত্রেই পিতৃপুরুষ ও দেবগণের উদ্দেশে নূতন চাউল উৎসর্গ না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করেন না। প্রাচীনগণ মনে করেন, নবান্ন না করিলে যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে। এমন কি, অনেক প্রবাসীও এই উপলক্ষে প্রবাস হইতে গৃহে সমাগত হইয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মিলিয়া নবান্ন করিতেছেন,—এ দৃশ্য পূর্বে আমাদের পল্লী অঞ্চলে বিরল ছিল না। কিন্তু আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার বিস্তারে আমাদের উৎসবানুরাগ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। আবার অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয়-বাহুল্যের আশঙ্কায় বহুদূরবর্তী প্রবাস হইতে মধুরস্মৃতিমণ্ডিত পল্লীগ্রামের উৎসব-ভবনে উপস্থিত হইয়া নবান্নে যোগদান করিতে পারেন না। নবান্ন না করিলে প্রত্যবায় থাক না থাক, দীর্ঘকাল পরে বালক-বালিকাগণের কলকণ্ঠঝঙ্কারে মুখরিত স্নেহপূর্ণ পল্লীগৃহে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া অচিরোৎপন্ন নূতন চাউলের অন্নগ্রহণের মধ্যে এমন কোমল মাধুর্য ও প্রীতিকর ভাব আছে,—যাহা গৃহচ্যুত প্রবাসীর বিরহবিষাদপ্লাবিত একক জীবনের পক্ষে একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয় ; এই মধুর পুণ্যস্মৃতিটুকুকে বৈচিত্র্যহীন জীবন-পথের সম্বল করিয়া বিরহী পথিক দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসযাত্রা করিতে পারে।

গোবিন্দপুর গ্রামে যে সকল গৃহস্থের বাস, তাহাদের অধিকাংশেরই উপ-জীবিকা চাষ। যাহারা জমীদারের সেরেস্তায় বা নীলকুঠীতে চাকরী করে, তাহাদেরও দুই দশ বিঘা জমী ও একখানি লাঙ্গল আছে ; ইহাতে তাহাদের

সংবৎসরের চিঁড়া মুড়ির উপযুক্ত ধান, ডাল ও তৈলের সংস্থান হয়, দু' পাঁচ জন লোকও হাতে থাকে। কোন কোন বৎসর অজন্মা হইলেও তাহারা চাষ ছাড়িতে চাহে না, যেন ইহা তাহাদের দিনপাতের একটি প্রধান উপলক্ষ! জমীদারী সেরেস্তার বা নীলকুঠীর কাজ শেষ করিয়া গ্রামবাসিগণ যে দু' দণ্ড অবসর পায়, সে সময়টুকু তাহারা রাখাল কৃষাণদের সঙ্গে জমীর কথা, লাঙ্গল ও বলদের কথা, ফসলের কথা লইয়াই কাটাইয়া দেয়। সুতরাং এ কালে কৃষিকার্যে সর্বত্র লক্ষ্মীলাভ না হউক, পল্লীবাসীর কার্যহীন চিত্তকে সংযত রাখিবার ইহা একটি অব্যর্থ উপায়।

মজুমদারেরা গোবিন্দপুরের এক ঘর বনিয়াদী গৃহস্থ। গ্রামে প্রবাদ আছে, পূর্বে তাঁহাদের জমীদারী ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহাদের জমীদারী বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যায়। প্রবাদে ইহাও প্রকাশ যে, পদ্মাপারে তাঁহাদের জমীদারী ছিল। বর্তমান মজুমদারগণের পিতামহ গুরুগোবিন্দ মজুম-দারের মোক্তার জয়রাম গাঙ্গুলী প্রভুর জমীদারীর কালেক্টরীর খাজনা লইয়া জেলায় যাইতেছিল। যে দিন কালেক্টরীতে খাজনা দাখিল করিবার কথা, সেই দিন প্রভাতে জয়রাম মোক্তার একখানি ভিজে গামছা পরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মজুমদার বৃদ্ধের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল ; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুগোবিন্দ জানিতে পারিলেন, তাঁহারই সর্বনাশ হইয়াছে, খাজনার টাকা সমেত মোক্তারের নৌকা গঙ্গায় ডুবিয়াছে, মা গঙ্গা সকলই গ্রহণ করিয়াছেন, কপর্দকমাত্র উদ্ধার হয় নাই।

গুরুগোবিন্দ নিজের অবস্থা বুঝিলেন ; বুঝিলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার জমীদারী লাটে উঠিবে ; শত শত ব্যক্তিকে যিনি অন্নদানে নিত্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, তাঁহাকে সপরিবারে অন্নকষ্টে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু নিরুপায়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সুদূর সদরে পাঠান রেলওয়ে টেলিগ্রাফের সম্বন্ধবর্জিত দেশের পক্ষে অসম্ভব। মোক্তার ব্রাহ্মণের ছেলে ; 'ভরা' ডুবির কথা বিশ্বাস না হইলেও গুরুগোবিন্দ তাহাকে অধিক কিছু বলিলেন না, কেবল বিরক্তিভরে বলিলেন, "মা গঙ্গা আমার সর্বনাশ করিলেন, কিন্তু তোমার লজ্জাটুকু ত বজায় রাখিয়াছেন দেখিতেছি ; সব গিয়াছে, তোমার গামছাখানি ত যায় নাই! আচ্ছা যাও, এ টাকার জন্য তোমার আর কোন দায়িত্ব রহিল না।"

কিন্তু মজুমদারদের প্রেরিত খাজনার টাকাতেই সেই সম্পত্তি ক্রীত ও হস্তা-ন্তরিত হইয়া গেল।—জমীদার ফতুর ও মোক্তার জমীদার হইল। আর সেই দিন হইতেই মজুমদারেরা চাষী গৃহস্থ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"

এ প্রবাদটা মজুমদার-পরিবারে বেশ ফলিয়া গিয়াছিল। দৈববিড়ম্বনায় ইঁহারা

লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু কমলা চঞ্চলা হইয়াও সেই সরল-হৃদয় উদারস্বভাব ধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ জমীদারকে পরিত্যাগ করিলেন না। সমস্ত জমীদারী নিলামে উঠিলেও, কৃষিকর্ম হইতেই গুরুগোবিন্দ মজুমদারের সোনার সংসার বজায় রহিল। গুরুগোবিন্দের পরলোকগমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এই চাষের আয় হইতেই সাতগেছের জমীদারদের নিকট চক শ্যামনগর মহালখানি ক্রয় করিয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন গোবিন্দপুরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; এ জন্য তাঁহাকে জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয় নাই।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে যে পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম গ্রাম্যবিগ্রহ গোবিন্দদেবের নামানুসারে গোবিন্দদীঘি রাখা হইয়াছিল। অদূরে গোবিন্দদেবের মন্দির। গোবিন্দদীঘির পূর্ব পশ্চিম দুই দিকে দুইটি সান বাঁধান ঘাট, উপরে সুবৃহৎ সুদৃশ্য চাঁদনী। পূর্বদিকের ঘাটে পুরুষেরা ও পশ্চিমদিকের ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকেন। মন্দিরের অল্প দূরেই মজুমদারদের প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী,—ধান, গোধূম, অড়হর, মসিনা, ছোলা প্রভৃতি শস্যে পনের-ষোলটি গোলা বোঝাই। মছিরুদ্দীন বিশ্বাস এই গোলাবাড়ীর গোমস্তা। মছিরুদ্দীন অনেক দিনের পুরাতন চাকর, প্রভুর অত্যন্ত বিশ্বাসী। ধান 'বাড়ি' দেওয়া, আসামীদিগের নিকট হইতে ধান ও অন্যান্য শস্য আদায় করা, গোলা-বাড়ীর জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা মছিরুদ্দীনের কাজ।

এই গোলাবাড়ী ও মজুমদার-বাড়ীর ব্যবধান অধিক নহে। মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপখানি সুবৃহৎ। বাড়ীতে কেবল সেইখানিই খড়ের ঘর ; আর সমস্তই পাকা ইমারত। বাড়ীর পাশেই গোয়ালবাড়ী, গোশালায় বড় দুইখানি ঘর, চাষী গৃহস্থ বলিয়া ইঁহাদের পঁচিশ-ত্রিশটা বলদ আছে, গাই গরুর সংখ্যাও দশ-বারটি। গোয়ালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ইষ্টকবদ্ধ গামলার সারি। এক পাশে ঘরের মত উচ্চ বিচালির গাদা, এবং একটি অনতিদীর্ঘ ভুষির ঘরে বাঁশের মাচার উপর চাল সমান উচ্চ করিয়া ভুষি রাখা হইয়াছে। মধ্যাহ্নকালে যখন গরুগুলি গোয়াল ছাড়িয়া মাঠে চরিতে বা জমীতে চাষ দিতে যায়, তখন গোয়ালবাড়ীটা শূন্য পড়িয়া থাকে : শূন্যতাভরে যেন খাঁ খাঁ করে। কিন্তু অপরাহ্নকালে গোয়ালের অভিনব শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষাণেরা ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাঙ্গল-গুলি ঘরের 'ভিতে' 'আড়' করিয়া ফেলিয়া রাখে ; দুই চারি জন রাখাল বাঁকের দুই দিকে টিনের ক্যানেস্তারা ঝুলাইয়া পুকুর হইতে জল আনিয়া সেই জলে 'জাবনা' ভিজাইবার জন্য গামলাগুলি পূর্ণ করিতে থাকে ; কোন কোন রাখাল বড় বিচালিকাটা বঁটিতে বিচালি 'চুরাইতে' আরম্ভ করে ; বিচালি 'চুরান' শেষ হইলে গামলায় 'জাব' মাখিয়া বলদগুলিকে গামলার কাছে বাঁধিয়া দেয়। বলদ-গুলি নাকমুখ ডুবাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে, এক একবার মুখ উর্দ্ধে তুলিয়া ব্যস্তভাবে খাদ্যচর্বণ করিতে থাকে, কখন বা পরস্পরের সিং-এ সিং বাধাইয়া

মারামারি করে। কৃষকেরা গোয়ালঘরের চালে 'পানাই'গুলি গুঁজিয়া রাখিয়া, বাঁশের চোঙগা ভরিয়া গৃহকর্ত্রীর কাছে তৈল লইয়া, তাহা সর্বাঙ্গে উত্তমরূপে মাখিয়া দীঘিতে স্নান করিতে যায়। রাখালেরা সন্ধ্যার সময় গাভীগুলিকে গোচারণক্ষেত্র হইতে চরাইয়া আনিয়া গোয়ালঘরে পুরিয়া রাখে ; দুই একটি দুগ্ধবতী গাভীকে রান্না-বাড়ীতে লইয়া গিয়া গামলায় সঞ্চিত ফেনজল খাওয়াইয়া আনে, এবং গোবৎসগুলিকে গোয়ালের প্রান্তবর্তী কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া আসে ; গোয়ালঘরে 'সাঁজাল' জ্বালা হয় ; সাঁজালের ধূমে চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন সাঁজালের চারি দিকে বসিয়া রাখাল কৃষাণেরা অগ্নিতে হাত পা সেঁকিতে সেঁকিতে স্ব স্ব সুখদুঃখের কথা আলোচনা করিতে থাকে। কোন কোন মাতব্বর কৃষাণ চণ্ডীমণ্ডপে একখানি কম্বলের উপর বসিয়া মজুমদারদের ছোট কর্তার অপেক্ষা করে। ছোট কর্তা সন্ধ্যার পর মাঠ হইতে ঘুরিয়া বহির্বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করে, তিনিও তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া বস্ত্রাদিপরিবর্তনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

তখন বহির্বাটীতে একটি অনুচ্চ তৈলানুলিপ্ত কাঠের দীপগাছার উপর একটা ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। রামধন বাবু অগ্রহায়ণের শীতেও কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে খড়ম পায়ে দিয়া চণ্ডী-মণ্ডপে সমাগত হন। তখন প্রভু ও ভৃত্যবর্গের মধ্যে নানা কথার আলোচনা চলিতে থাকে,—কোন্ জমীতে কেমন চাষ চলিতেছে, 'লাল' জমীর অবস্থা কেমন, এবার-কার চাষে লোকসান হইবে, কি খরচটা মাত্র উঠিতে পারে, মরিচের আবাদে কিরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিলের অবস্থা কিছুমাত্র আশাপ্রদ নহে, প্রায় সকল ক্ষেতেই 'আঁচা' লাগিয়াছে—ইত্যাদি এত বিষয়ের আলোচনা চলে যে, তদ্দ্বারা বাঙলা গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের একখানি প্রকাণ্ড রিপোর্ট প্রস্তুত হইতে পারে। কৃষকেরা সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে অসঙ্কোচে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যায়, প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে কিছু রূঢ়তা, পদগত পার্থক্য, বা সঙ্কোচের কারণ আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে নিতান্ত আত্মীয় ও প্রিয়তম সুহৃদ বলিয়া মনে করে। কোন কোন কৃষাণ অন্যান্য কৃষিজীবীর ফসল অপেক্ষা তাহার প্রভুর ফসলের অবস্থা যে অনেক ভাল, তাহার প্রমাণের জন্য নানাপ্রকার নজীর প্রয়োগ করে, এবং প্রভুর মন কিছু প্রফুল্ল আছে, ইহা বুঝিতে পারিলেই, শীতবস্ত্র, নূতন পানাই, বা অরক্ষণীয়া কন্যার আসন্ন বিবাহের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়া কিছু 'আগাম মাহিয়ানা' পাইবার 'আরজ' করে। ছোটকর্তা সকলকেই মিষ্টবাক্যে ভরসা দিয়া গভীর রাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

তিন ভ্রাতার মধ্যে রামধন মজুমদার সর্বকনিষ্ঠ হইলেও তিনিই কর্তা। তাঁহার অপর দুই সহোদর প্রবাসী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণধন স্টুয়ার্ট কোম্পানীর

জমীদারী হাটলক্ষ্মীপুরের নীলকুঠীর দেওয়ান। মধ্যম ভ্রাতা হারাধন স্বরূপ-পুরের জমীদার নীলকমল বাবুর সদর নায়েব। প্রবাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের স্ত্রীপুত্রাদি বাড়ীতেই থাকেন, সুতরাং তাঁহারা বিদেশে চাকরী করিলেও তাঁহাদের মন সর্বদা বাড়ীতেই পড়িয়া থাকে। পূজার সময় ও অন্যান্য প্রধান উৎসব উপলক্ষে বড় কর্তা ও মেজ কর্তা যখন বাড়ী আসেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে নৌকাবোঝাই হইয়া কত সামগ্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই। নৌকা গ্রামের ঘাটে লাগিবামাত্র গ্রামের মধ্যে মহা কলরব উপস্থিত হয়, নৌকার জিনিসপত্র দেখিবার জন্য ঘাটের ধারে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মজুমদারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে বেশ সম্প্রীতি আছে, কিন্তু বধূদের মধ্যে স্নেহবন্ধনের অভাব লক্ষিত হয় ; বিশেষতঃ কৃষ্ণধনের অর্ধাঙ্গিনী সৌদামিনী ঠাকুরাণী কিছু রুক্ষভাষিণী। তাঁহার স্বামী তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন করেন বলিয়া অনেক সময়েই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঝঙ্কার করেন, এবং নিজের সুখসচ্ছন্দতার মধ্যে নানাপ্রকার কাল্পনিক ত্রুটির অবতারণা করিয়া কনিষ্ঠ দেবর রামধনের প্রতি কঠিন ভাষারও প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহাতে রামধন বড় কষ্ট পান। তাঁহার উপর সংসারের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত আছে বলিয়াই মুখরা ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে অপরাধী মনে করেন ভাবিয়া, কখন কখন তিনি সংকল্প করেন, সংসারের কর্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইহাতে বড় দাদা পাছে মনে বেদনা পান, সংসারের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি মনের কষ্ট মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখেন। অবশেষে একবার পূজার সময় তিন ভাই একত্র হইলে একদিন রামধন কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণধনকে বলিলেন, "দাদা, এ সংসারের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে ; যতদিন সংসারের কর্তৃত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, ততদিন করিয়াছি। এখন আপনি এ ভার বড়বৌ কি অন্য কাহারও হাতে দিয়া আমাকে ছুটি দিন।"

বুদ্ধিমান কৃষ্ণধন ভ্রাতার মনঃকষ্টের কারণ বুঝিতে পারিলেন ; তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া স্নেহমধুরস্বরে বলিলেন, "ভাই ! নির্বোধ স্ত্রীলোকেরা না বুঝিয়া কত সময় কত অন্যায় কথা বলে, আমরা যদি তাহা সহ্য না করি, তাহাতে যদি আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সংসার টিকিবে কি করিয়া ? আমাদের সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে করিয়া দেখ, তিন ভাই আমরা এক মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছি, মা বাবা দু'জনেই আমাদের রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, মা-বাপের সেই স্নেহ ও আশীর্বাদের সম্মানও রাখিব না, আমাদের মনের মধ্যেও একটা ছাড়াছাড়ির ভাব দাঁড়াইবে ? ইহাতে কেবল আমাদেরই ক্ষতি, এমন নহে, পরিবারটা পর্যন্ত যে নষ্ট হইয়া যাইবে ! ভাঙা শক্ত নহে, কিন্তু একটা পরিবার গড়িয়া তোলা বড় কঠিন। বৌরা ত পরস্পর বিবাদ করিবেই, আমাদের মনের ব্যথা তাহারা কিরূপে বুঝিবে ?" দাদার এই স্নেহগর্ভ উপদেশে রামধনের মনের বেদনা দূর হইল।

ইঁহাদের ভগিনী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী বিধবা। তিনি সর্বকনিষ্ঠা হইলেও সংসারের কর্ত্রী। তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনার উপরেই সংসারের সকল সুখ ও সুবিধা নির্ভর করে। পরিবারে তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, তথাপি সেই বৃহৎ পরিবারের তিনিই যেন মেরুদণ্ড। সংসারের সকল ভার তিনি মাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্বশুরকুলে কেহ নাই বলিয়া সেই সংযতহৃদয়া, পবিত্রচরিত্রা ধর্মশীলা বিধবা ভ্রাতৃগণের সংসারে সুখসচ্ছন্দতা-বিতরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সাংসারিক কর্তব্য বড় গুরুতর, অপক্ষপাতে তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃজায়াগণের নিকট কখন কখন রুক্ষ বচন শুনিতে হইত, কিন্তু সংসারের মঙ্গলের দিক চাহিয়া তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে সকলই সহ্য করেন ; মনে যখন অত্যন্ত কষ্ট পান, তখন তিনি তিন ভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু সবলে রোধ করিয়া প্রার্থনা করেন, "হে হরি, হে জগন্নাথ, ইহাদের সকলকে সুখে রাখ, আমাকে তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় দাও : সংসারে যাহার কোনও বন্ধন নাই, তাহাকে কেন এমন করিয়া বাঁধিয়া কষ্ট দিতেছ ? দিনান্তে দু' দণ্ড তোমার নাম করিব, তাহারও যে অবসর নাই !" বাড়ীর দাসদাসীরা তাঁহাকে যেমন ভয় করে, তেমনই ভালবাসে। পাছে তিনি মুখ ভার করেন, এই ভয়ে 'গোয়ালকাড়ুনী' খুব সকালে আসিয়া গোয়ালঘর পরিষ্কার করিয়া যায়। দাসীরা অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ছড়া ঝাঁট দিয়া আঙিনাখানি আয়নার মত তকতকে করিয়া রাখে। তাহার পর বাড়ীতে যে কয়টা ধানের গোলা আছে, তাহাদের ও তুলসীমন্দিরের সম্মুখভাগ গোলাকার করিয়া নিকাইয়া দেয়। রৌদ্র উঠিলে কেহ আঁস্তাকুড়ে বসিয়া বাসন মাজিতে আরম্ভ করে, কেহ রান্নাঘর নিকাইতে বসে।

কাত্যায়নী দেবী অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়া বস্ত্রাদি ছাড়িয়া একখানি কুশাসনে বসিয়া মালা জপিতে আরম্ভ করেন। শেষে একটু ফরসা হইলে ফুলবাগান হইতে কতকগুলি পুষ্পচয়ন করিয়া কলাপাতে মুড়িয়া কিছু গ্রাম্য বিগ্রহকে উপহার পাঠাইয়া দেন, এবং নিজে পূজা করিবেন বলিয়া কতকগুলি একখানি পরিষ্কার পিতলের রেকাবীতে করিয়া তুলসীমূলে রাখিয়া দেন।

আজ অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচুই তারিখ। গ্রামের পণ্ডিত সার্বভৌম মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া বলিয়াছেন, আজ নবান্নের অতি প্রশস্ত দিন। তাই আজ গোবিন্দপুরের ঘরে ঘরে নবান্নের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্থপল্লীতে আজ আনন্দকলরবের বিরাম নাই। আজ পাঠশালা বন্ধ। গুরুমহাশয় ভিন্ন গ্রামে যজমানবাড়ী নবান্ন করিতে যাইবেন। পাঠশালার পড়োরা আজ মনের আনন্দ চাপা দিতে না পারিয়া বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল বাড়ীতেই নবান্নের উদ্যোগ চলিতেছে, কিন্তু মজুমদার-বাড়ীর আয়োজনই কিছু অতিরিক্ত। নবান্ন করিবার জন্য বড় কর্তা ও মেজ কর্তা চাকরীস্থান হইতে বাড়ী আসিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিন ভ্রাতাই বালাপোষ গায়ে দিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। রাখাল কৃষাণেরা প্রভুগৃহে আসিয়া কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া রোদ পোহাইতে লাগিল। পাড়ার দুই পাঁচ জন আত্মীয় প্রতিবেশী আসিয়া কর্তা-দের কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

প্রভাতের রৌদ্র বকুলগাছের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া মজুমদারদের চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। নবমুকুলিত সজিনা গাছের একটা উচ্চ শাখায় বসিয়া একটা চীল রৌদ্র পোহাইতেছে। কয়েকটি নিষ্কর্মা ভদ্রলোক মোটা মার্কিনের চাদর গায়ে দিয়া সতরঞ্চির উপর বসিয়া সশব্দে তামাক টানিতেছেন,—সেকালের উৎসবানন্দের গল্প চলিতেছে, সংগে সংগে তাহাদের সুখস্মৃতি উথলিয়া উঠিতেছে। এই প্রথম শীতের মধুর প্রভাতে যেন কাহারও কোন কর্ম নাই, কেবল কয়েকখানি খালি গরুর গাড়ী হট্ হট্ শব্দ করিতে করিতে সম্মুখের পাকা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, আর পাঁচ সাত জন 'মেটে' মজুর কোদাল লইয়া ও ঝুড়ি ঘাড়ে করিয়া গল্প করিতে করিতে কাহার বাড়ীতে মাটীর প্রাচীর গাঁথিতে চলিতেছে।

আজ আর রাখাল কৃষাণদের মাঠে যাইতে হইল না। তাহারা মনিববাড়ীতে নবান্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছে। বাড়ীর বাগানটা বড় জংগলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পূজার পর আর সে জংগল পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া, তিন ভায়ে কয়েক জন কৃষাণকে সংগে লইয়া সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুশাণিত কাটারীর আঘাতে বহুসংখ্যক আগাছার ধ্বংস হইল। গোবিন্দপুরে মজুমদারদের কলাবাগানের বিশেষ খ্যাতি ছিল ; বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড দুই কাঁদি মর্তমান কলা পুষ্ট হইয়া ছিল—কলার ভারে গাছ দুটি হেলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদের গায়ে বাঁশের 'ঠেকো' লাগাইয়া গাছ দুটিকে সোজা করিয়া রাখা হইয়াছে। কলা-কাঁদির উপর রাত্রে বাদুড় পড়িয়া সর্বোচ্চ ছড়ার কয়েকটি কলা অর্ধভুক্ত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে, সেই দিনই কাঁদি দুটি কাটিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। কাঁদি দুটি অংগনমধ্যে নীত হইলে তাহারা অবিলম্বে রজুবন্ধ অবস্থায় বৈঠখানার কড়িকাঠের সন্নিকটবর্তী হইয়া স্বর্গযাত্রী ত্রিশংকু রাজার ন্যায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। পাকিলে তাহা নামাইয়া পরিবার ও আত্মীয় প্রতিবেশিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কলাগাছ দুটির একটি কাটিয়া তাহার 'পেট্‌কো' ছাড়াইয়া একজন কৃষক থোড়-গুলি রান্নাঘরে দিয়া আসিল। আর একটি গাছ আস্ত রাখা হইল, এই থোড় নিঃশেষিত হইলে সেই গাছটি কাটা হইবে।

আজ নবান্নের দিন 'পাখরী' গাইয়ের নূতন 'দোহা পাতা' আরম্ভ হইবে। পাখরী বড় দুষ্ট গাই, তাহার মা 'ভাঁড়ভাংগী' দুই বেলা ছয় সের দুধ দিত ; পাখরী নবপ্রসূত গাই ; তাহার বাছুরটির বয়স একুশ দিন মাত্র হইয়াছে। সে কেমন দুধ দেয়, তাহা দেখিবার জন্য বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দোয়াল হরি ঘোষ গাই দুইতে আসিলে সকলে তাহার সংগে গোয়ালবাড়ীতে

উপস্থিত হইলেন। হরি ঘোষ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া শুনিল, গরু দুহিবার ভাঁড়টা পূর্বরাত্রে উনানের মুখে তাতাইতে দেওয়া হয় নাই। সেই ভাঁড়ে গরু দুহিলে পাছে দুধ 'নটাইয়া' যায়, এই আশঙ্কায়, পিসীমার পরামর্শে হরি ঘোষ একটি পরিষ্কার পিতলের বড় ঘটি লইয়া গরু দুহিতে গেল। পাখরীর সম্মুখের এক-খানি পদে বাছুর বাঁধিয়া সে দোহনে প্রবৃত্ত হইবে, এমন সময় পাখরী লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল, কিছুতেই তাহার বাঁটে হাত দিতে দিল না। তখন হরি দোহাল গরুর লেজের কেশে রচিত ছাঁদন-দড়ি দিয়া পাখরীর পশ্চাতের পা দুইখানি বাঁধিয়া গোদোহনে প্রবৃত্ত হইল। পাখরী আর পূর্ববৎ অস্থিরতা-প্রকাশের সুবিধা না পাইয়া নতমুখে ব্যাকুলভাবে বৎসের গা চাটিতে লাগিল। পাখরীকে দোহা হইতেছে শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ কৌতুকভরে দরজার ফাঁক দিয়া গোয়ালবাড়ীতে উঁকি দিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া গোয়ালের অদূরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রামধন বাবুর ছোট ছেলে অজয়কুমার তাহার জেঠামহাশয়দের কাছে ভদ্রলোক সাজিয়া উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে, নীলাম্বরী কাপড়খানি পরিয়া লইবার চেষ্টায় তাহার দিদি হরিপ্রিয়ার কাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতেছিল, কিন্তু সেখানে অকৃতকার্য হইয়া সে কাপড়খানি কক্ষে লইয়াই সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল! নবজাত শুভ্র সুন্দর বাছুরটিকে গরুর সম্মুখের পদে আবদ্ধ দেখিয়া তাহার বড় কৌতুকবোধ হইল ; সে আনন্দে অধীর হইয়া তাহার চঞ্চল দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া দুই শূন্য হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, কাপড়খানি কক্ষ হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া আধ-আধ-স্বরে বলিল, "বাবা, হলে পাকলিকে দুচ্চে, চ্যাঁ চুঁ গবল গুঁ—আমি বাচুল নোব।"—বাবা বলিলেন, "এখন বাছুর কি নেয়? এখন বাছুর নিলে পাখরী মারবে।" এই কথা শুনিয়া বালক কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, দুই ক্ষুদ্র হস্তে বাপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "গরু মালবে, বাবা কোয়ে কল।" পিতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন ; সস্নেহে বলিলেন, "না মারবে না, দুধ দেবে ; দুধ খাবে না?" দুধ খাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। "দুদ্ কুকী কাবে" বলিয়া সে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে গোদোহন দেখিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার কাছে কাপড় নাই, সে নতদৃষ্টিতে কাপড়ের সন্ধান করিতেই দেখিতে পাইল, তাহার ভগিনী শুভ কাপড়খানি কুড়াইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অমনি সুর ধরিল, "বাবা! আমি কাপল পলবো।" পিতা তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে হরি ঘোষ গোদোহন শেষ করিয়া উঠিল ; ঘটিটা ঈষৎ বাঁকাইয়া অর্ধ ছটাক পরিমাণ দুগ্ধ বসুমতীকে দান করিল, তাহার পর এক ঘটি জল ঢালিয়া হাত পা ধুইয়া ফেলিল। হরি ঘোষের হাত পা ধুইবার পূর্বে কাত্যায়নী দেবী তাহাকে যাইতে দিতেন না। তিনি জানিতেন,

দোহালের অংগে যদি দুধ শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে গরুর বাঁটেও দুধের অভাব হয়! পাখরী এক বারেই প্রায় পাঁচ সের দুধ দিয়াছে—এ আনন্দে সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

গোয়ালবাড়ী পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই অজয়ের জ্যেঠতুতো বোন লীলা আসিয়া ডাকিল, "অজা রে! ক্ষেতা নারকেল পাড়তে ডাব গাছে উঠেছে। নারকেল নিবি ত আয়!" এ কথা শুনিয়া অজয়কুমারের আর কোঁচা গুজিবার অবসর হইল না। কোঁচা লুটাইতে লুটাইতে সে অন্যান্য ভাইভগিনীগণের সংগে গৃহপ্রান্তস্থ নারিকেলবাগানের দিকে ছুটিল। ক্ষেতা বৃক্ষারোহণে শাখামৃগের ন্যায় সুনিপুণ, দশ মিনিটের মধ্যে সে একরাশি নারিকেল পাড়িয়া ফেলিল। ছেলেমেয়েরা এক একটা নারিকেল হাতে লইয়া মায়ের কাছে ছুটিল।

বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে ভাংগা ছাতি মাথায় দিয়া এক জোড়া শততালিবিশিষ্ট ছেঁড়া চটিতে ধূলিধূসরিত বিবর্ণ চরণযুগলের সম্মান কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া পেয়ারী আচার্য মজুমদার-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পেয়ারী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ পুরুষ, মস্তকের সম্মুখভাগ সযত্নে কামানো, হস্তস্থিত ছাতার দামাটে একখানি গামছা বাঁধা,—স্নানের সময় সেখানি গামছা, বাজার করিবার সময় সেখানি মাছ তরকারী বাঁধিবার নেকড়া ও নিদারুণ গ্রীষ্মে সেখানি তালবৃন্তের প্রতিনিধি! পেয়ারী আচার্যকে গোবিন্দপুরে কে না জানে? হরিনামকীর্তন না করিলেও পেয়ারী সর্বদাই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু', তাহার কপালে দীর্ঘ তিলক, গলায় কাঠের তিন কণ্ঠী মোটা মালা, দাড়ি গোঁফ কামানো, সদা হাস্যচ্ছটালাঞ্ছিত উদ্‌ঘাটিত দন্তশ্রেণীতে শোভিত মুখখানিতে কোন প্রকার রাগ বা অভিমানের ভাব নাই। গোবিন্দপুরের সমস্ত লোকের ঠিকুজীকোষ্ঠী পেয়ারী স্বহস্তে প্রস্তুত করে; ঠিকুজীকোষ্ঠীতে ছবি আঁকিতে, তুলটের কাগজের পীতবর্ণটি ঘোরাল করিতে, মোটা মোটা করিয়া মুক্তার মত লিখিতে পেয়ারীর নিপুণতা গ্রামের সর্বজনবিদিত।

ঠিকুজীকোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া পেয়ারী আচার্যের আয় নিতান্ত অল্প হয় না। এতদ্ভিন্ন কোন বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, অথবা শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, পেয়ারী সকলের আগে সেখানে আসিয়া জোটে, এবং কলার পেট্‌কো কাটিয়া ষোড়শমাতৃকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বসে। আজ নবান্ন উপলক্ষে এক-আধটা ভাল রকম সিধা পাইবার সম্ভাবনা আছে; বিশেষতঃ মজুমদার-বাড়ীর বড়কর্তা ও মেজকর্তা নবান্ন উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছেন, টাকাটা সিকেটা প্রাপ্তির সম্ভাবনা একান্তই প্রবল; তাই পেয়ারী যথাসময়ে মজুমদার-বাড়ীতে আসিয়া দর্শন দিল। মজুমদারদের উভয় কর্তাকে চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া সে স্মিতমুখে বলিল, "প্রণাম হই দাদামশাই! তবে কবে বাড়ীতে শুভাগমন হলো? প্রাণ গতিক সব মংগল ত? বৈষয়িক্ক সংবাদও অবশ্যই শুভো। আর দাদা! আপনারাই হলেন এ দেশের প্রধান বেক্তি, আপনারা যদিস্যাৎ মধ্যে মধ্যে বাড়ী না আস্‌বেন ত দেশের

গুমোর রক্ষে কি ক'রে হয়?" এইরূপ সম্ভাষণাদি শেষ হইলে আচার্যঠাকুর একখানি লম্বা মোটা 'কামারে' ছুরী লইয়া একটি কলাগাছ কাটিতে লাগিল। এ কাজে তাহার হাত খুব চলে ; ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে কদলীবৃক্ষটিকে একরাশি 'খোলা'য় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল ; তাহার পর উঠিয়া বলিল, "দাদা, আজ নবান্নের দিন বাজারটা একবার ঘুরে আসি, আজ বাড়ী ফেরবার সময় সিধেটা যেন পাই ; আপনাদের আশ্রয়েই বাস কচ্ছি।"

আজ কিছু সকালে বাজার বসিয়াছে। নবান্ন উপলক্ষে আজ বাজারে শশা, আখ, শাঁক আলু, লাল 'সাঁকারকুন্ড' আলু প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল বিক্রয় হইতে আসিয়াছে। মজুমদারদের পুরাতন ভৃত্য ক্ষেতু দাদা আজ ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ফলফুলারি ও তরকারী লইয়া আসিল। কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সকাল সকাল স্নান করিয়া আসিয়া প্রথমে নূতন গরুর দুধ প্রায় এক পোয়া গঙ্গাকে দিবার জন্য ঘটীতে ঢালিয়া নদীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর আর আধ সের দুধ, কতকগুলি ফুল, ফল, নূতন আতপ চাউল, চিনি, কাঁচাগোল্লা প্রভৃতি জিনিস গ্রাম্যবিগ্রহ গোবিন্দদেবের মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে নবান্নের আয়োজন আরম্ভ হইল। আচার্য-কর্তিত কলার পেট্‌কোতে তিনি নবান্নের জন্য গৃহে প্রস্তুত আতপ চাউল এক এক মুষ্টি রাখিয়া, একটা বড় পাত্রে কতকগুলি ফলমূল, আখ, আলু, কলা, মূলো, নারিকেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখিলেন, এবং একটা বড় পাথরের খোরায় এক খোয়া কাঁচা দুধ, একটা 'খেত্তুরে' বাটীতে এক বাটী নূতন খেজুরে গুড় ও বড় পিতলের রেকাবীতে বাতাসা, কাঁচা গোল্লা, গুড়ে মোণ্ডা প্রভৃতি মিষ্টান্ন রাখিয়া দিলেন ; ছেলে-মেয়েরা অদূরে বসিয়া সদ্যঃস্নাতা সিক্তকেশা শুভ্রবসনা পিসীমার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

নবান্নের যোগাড় করিয়া কাত্যায়নী কৃষ্ণধনকে বলিলেন, "দাদা! সকাল সকাল স্নান ক'রে এস. উদ্যোগ ত সবই আছে, এখন পুরুত কাকা এলেই হয় ; এতখানি বেলা হয়েছে,—ছেলেমেয়েরা মুখে জলটুকু দিতে পায় নি, বাছাদের নাড়ী 'পিতিয়ে' গেল।" কৃষ্ণধন ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তৈলসিক্ত বালকবালিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নদীতে চলিলেন ; ক্ষেতা খানসামা কতকগুলি শুষ্ক কাপড় লইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, পুরোহিত বাচস্পতি ঠাকুর হাত-পা ধুইয়া ভিজে গামছা কাঁধে ফেলিয়া কুশাসনের উপর বসিয়া আছেন। তাড়া-তাড়ি একখানি পট্টবস্ত্র পরিয়া 'দোবজা'তে সর্বশরীর ঢাকিয়া কৃষ্ণধন নবান্ন করিতে বসিলেন। প্রথমে দেবগণ ও স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে সেই নূতন আতপান্ন ভক্তিভরে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অবশেষে তিনি চাউল, দুধ, গুড়, ফল-মূল, সমস্ত সেই প্রকাণ্ড পাথরের 'খোরাটা'তে ঢালিয়া মাখিয়া লইলেন।

তখন ছেলেরা কলাপাতে অল্পপরিমাণ নবান্ন লইয়া চারি দিকে ছুটিয়া

চলিল। কেহ ছাদের উপর কাক শালিক প্রভৃতি পাখীর জন্য তাহা রাখিয়া আসিল ; কেহ ঢেঁকির ঘরে গিয়া ইঁদুরের গর্তে খানিক ঢালিয়া দিল ; মাছদের নবান্ন খাওয়াইতে একটি ছেলে নদীতে চলিল ; একটি ছেলে খানিকটে নবান্ন গরু বাছুরের জন্য গোয়ালঘরে লইয়া গেল ; কেহ শৃগালের জন্য চাট্টি চাউল, খান দুই শাঁক আলু ও একটুকরা পাকা কলা লইয়া বাঁশবনে কিংবা আশ্যাওড়ার জঙ্গলে ফেলিয়া আসিল। সকল জন্তুর জন্য নবান্ন বিতরিত হইলে, গৃহস্থপরিবারগণ একত্র সমবেত হইয়া, দুধ গুড় ও নানাবিধ ফল মূল মিশ্রিত চাউল খাইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর, বৌ ঝিরা এক এক বাটী চাউল লইয়া রান্নাঘরের বারান্দায়, উননের ধোঁয়ায়, ভিজে চুলে, পা মেলিয়া বসিয়া, সিক্ত তন্ডুলরাশি নতমুখে চর্বণ করিতে লাগিল। রাখাল, কৃষাণ ও পরিবারস্থ অনুগত ব্যক্তিগণ—সকলেরই নবান্ন হইয়া গেল, এমন কি, গ্রাম্য ভিখারিণীগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে লইয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াও এই আনন্দরসের আস্বাদনে বঞ্চিত হইল না। যে সকল ছেলেমেয়ে জরপ্লীহায় ভুগিতেছে—দুধ-বার্লি ভিন্ন ডাক্তার যাহাদিগের জন্য অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করেন না, তাহারা পর্যন্ত দুটি চাউল মুখে দিয়া আজ নিয়মরক্ষা করিতেছে।

গ্রাম্যদেবতা গোবিন্দদেবের বাড়ীতে আজ নবান্নের প্রচুর আয়োজন। যে সকল গরীব দুঃখী অর্থাভাবে নবান্নের আয়োজন করিতে পারে নাই, কিংবা অশৌচাদি-বশতঃ যাহাদের নবান্ন হয় নাই, তাহারা গোবিন্দদেবের প্রসাদ আনাইয়া সপরিবারে তাহাই মুখে দিতেছে।

আজ সকল বাড়ীতেই আহারাদির বিশেষ আয়োজন ; পাঁচ তরকারী, ঘি ভাত, ভাজা, বড়া, দুই তিন রকম ডাল, ভাল মাছ, গুড়-অম্বল, দৈ, পায়েস, কোন উপকরণই আজ বাদ পড়িবার যো নাই। গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা হুঁকা টানিতে টানিতে দাবা ও পাশা খেলিতে বসিয়া গিয়াছেন, গড় গড় করিয়া হুঁকা ডাকিতেছে, বিসুবিয়সের ধূম-উদ্গিরণের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে ; 'কিস্তী!' 'কচেবারো!' প্রভৃতি শব্দের বিরাম নাই। একটু আড়ালে বসিয়া যুবকদের দল সশব্দে তাস পিটিতেছে।

ছেলেরা সমস্ত দুপুরটা বাড়ীর বারান্দায়, চিলেকোঠার ছাতে, অন্দরের বাগানে, গোয়ালঘরের অন্তরালে, লুকোচুরি খেলা শেষ করিয়া, বৈকালে দলে দলে দত্তবাগানে গিয়া জুটিল। এক দল 'চামুচ' খেলিতে আরম্ভ করিল। এক জন বুড়ী হইয়া বসিল, আর এক জন তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথাটা দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া বুড়ীর পাহারায় নিযুক্ত হইল ; ইতিমধ্যে বিপক্ষদলের একটি ছেলে এক দমে 'চু' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সকলকে তাড়া করিয়া বুড়ীকে মুক্তিদানের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে বুড়ী উঠিতে সাহস করিল না, ধরা পড়িলেই তাহাদের দলের পরাজয়, কিন্তু যে দলে বুড়ী আসিয়া বসিয়াছিল, সে দলের ছেলেরা 'মরিবার' ভয়ে

বিপক্ষদলস্থ 'চু' শব্দে ধাবমান বালকটির স্পর্শ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দূরে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল ; 'বুড়ী' একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, নিকটে কেহ নাই—তাহার পথ মুক্ত—তখন সে উঠিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজের কোটে পলাইয়া গেল ; বিপক্ষদলের কেহ কেহ তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় ছুটিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পশ্চাতে যেমন শুনিল,—"চু-উ-উ-উ", অমনি চক্ষুর নিমিষে দূরে পলাইয়া গেল, কিন্তু বুড়ী নিজের কোটে পা দিবামাত্র তাহাদের পরাজয় হইল।

মুক্ত প্রান্তরে আর এক দল বালক দান্ডাগুলি লইয়া মত্ত হইয়াছে। 'গুবা'র 'গুলি'তে 'দান্ডা'র অগ্রভাগ সজোরে পতিত হইতেছে, গুলি লাফাইয়া উঠিতেছে, আর শূন্যেই তাহা দান্ডা দ্বারা পুনর্বার প্রহত হইয়া বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে ; দৈবাৎ গুলি ছুটিয়া গিয়া আমবাগানের পাতার মধ্যে বাধিতেছে, অমনি দান্ডাহস্ত ক্রীড়ামত্ত বালক সজোরে হাঁকিতেছে, "নেই ঝোড়োল !" অর্থাৎ, ঝোড়ে বাধিয়াছে, সুতরাং মাটী স্পর্শ করিবার পূর্বে সেই গুলি ধরিয়া ফেলিলে কোন ফল নাই !

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক এক দল ছেলে 'হাডু ডুডু' খেলার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অদূরে ঘাসের উপর দুই দলের দলপতি 'মূল খেড়ু' বসিয়া গিয়াছে। আর দুই জন ছেলে একটু দূরে গিয়া এক-পরামর্শ হইয়া এক একটি কল্পিত নাম পাতাইয়া আসিতেছে, এবং সহাস্যে 'মূল খেড়ু'দের জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কে নেবে রে হীরেমন, কে নেবে রে ময়না ?" মূল খেড়ুদ্বয়ের মধ্যে যাহার সেবার মনোনীত করিবার পালা, সে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া উভয়ের কৌতুকোদ্দীপ্ত চক্ষু ও হাস্যতরঙ্গায়িত মুখের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিতেছে, "আয় রে আমার ময়না !" যাহাকে সে চায়, দৈবক্রমে যদি সে ময়না হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উচ্চ হাস্য পড়িয়া যায়, তাহার সেই ক্ষুদ্রদলের মধ্যে আনন্দকোলাহলের তরঙ্গ বহিতে থাকে !

আজ এক মধুর হেমন্তের অবসানকালে নবান্নের দিন অপরাহ্নে পল্লীপ্রান্তে হর্ষকলরব ও উৎসাহের অন্ত নাই। নদীতীরবর্তী সুবৃহৎ ষষ্ঠীগাছের ছায়ায় আজ গ্রামস্থ রাখাল কৃষাণ ও মজুরেরা সমবেত হইয়াছে, আজ তাহাদের বর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের দিন, আজ কেহ কাজে যায় নাই। ইহারা কোথাও 'মালামো' করিতেছে, কেহ কেহ লাঠি খেলিতেছে, তিন চার জন বাজি রাখিয়া সর্বাগ্রে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার আশায় প্রাণপণে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্র গোবিন্দপুরের প্রান্তভাগে আজ আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যার লোহিত তপন নদীর পশ্চিমে দূরস্থ আমকাঁঠালের বাগানের অন্তরালে অস্ত গেল ; অন্ধকারের ছায়া-যবনিকা ধীরে ধীরে প্রকৃতির শ্যামল অঙ্কে প্রসারিত হইল।

মাটীর প্রদীপে গৃহস্থের গৃহ ও খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকে তিমিরাচ্ছন্ন বন রমণীয় শোভা ধারণ করিল ; পল্লীরমণীগণ নদীজলে গা ধুইয়া কলসী

ভরিয়া জল লইয়া গল্প করিতে করিতে এবং মধ্যে মধ্যে কৌতুকহাস্যে সান্ধ্য অন্ধকারাবৃত ঝিল্লীরবমুখরিত সংকীর্ণ বনপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গৃহে ফিরিল ; বায়সের দল তীব্র চীৎকারে ক্ষুধার্ত জীবনের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দ্রুতপক্ষে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইল ; বাদুড়েরা নিবিড়পত্র তেঁতুলশাখা ও বাঁশবন পরিত্যাগ করিয়া আহার-অন্বেষণে নিঃশব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিল।

এমন সময় নেশাখোর বাউলের দল বাজারের সন্নিকটবর্তী শিবমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া ডুগি বাজাইয়া সমতালে—

"বাঁশের দোলাতে উঠে. কে হে বটে
শ্মশানঘাটে যাচ্ছে চলে ?"

এই "দেহতত্ত্ব"-বিষয়ক গান গাহিয়া শান্ত স্তব্ধ স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মৌন-ব্রত ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পোষলা

বনভোজনের প্রথা একালের সভ্যসমাজেও প্রচলিত আছে। এই বনভোজন ব্যাপারই আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'পোষলা' নামে প্রথিত। বঙ্গপল্লীসমূহে এই বনভোজন পৌষ মাসেই অনুষ্ঠিত হয় ; পল্লী অঞ্চলে অন্য সময়ে বনভোজনের প্রথা নাই।

প্রকৃতপক্ষে পৌষ মাসই পোষলার উপযুক্ত কাল। এই সময়ে পল্লীসমূহে গৃহস্থগৃহে খাদ্যদ্রব্যের অভাব থাকে না। আকাশ নির্মল, সূর্যের সমুজ্জ্বল কিরণ প্রীতিকর, এবং তরুলতাবেষ্টিত কাননভূমি যেমন সুদৃশ্য, তেমনই সুপরিচ্ছন্ন। অন্তঃপুরের বৈচিত্র্যহীন চির-অভ্যস্ত পাকশালায় যথানিয়মে প্রতিদিন আহার করিতে করিতে অতৃপ্তি জন্মে। অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পাকগৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার প্রকৃতিজননীর মুক্ত প্রাসাদদ্বারে আতিথ্যগ্রহণের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে! সেকালে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ,—অতি অল্প লোকেই এ উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিত ; একালে জীবন-সংগ্রামের তাড়নার আতিশয্য সত্ত্বেও এই ভাবটি এখনও পল্লীসমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

বৎসরের মধ্যে এই সময়েই পল্লীগ্রামে খাদ্যসামগ্রী স্বচ্ছল থাকে। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। ধান 'কাটাই' 'মাড়াই' হইয়া গোলায় উঠিতেছে ; অনেকেরই বাড়ীতে খেজুরে গুড়ের 'বাইন',—নিত্য নূতন খেজুরে গুড়ে হাঁড়ি কলসী পূর্ণ হইতেছে ; ক্ষেত্রে অড়হর, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিশস্যের অবস্থা উত্তম। সকলের গৃহেই অপর্যাপ্ত তরকারী ; সামান্য একখানি কুটীরে যাহার বাস— তাহারও কুটীরখানির পাশে কয়েকটি সতেজ বেগুনগাছে কালো কালো বেগুন ঝুলিতেছে ; সম্মুখে দুই হাত জমীতে পালঙ্ শাক লক্‌লক্ করিতেছে ; শিম ও লাউর শ্যামল লতা কুটীরের চালখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; একটু

খুঁজিলেই দুই একটা কচি লাউ ও আট দশ গণ্ডা 'আলতাপাতি' শিম পাওয়া যায় ; কানাচের সজিনা গাছে থোকা থোকা সজিনা ফুল। মেটে আলু, শাদা ও লাল আলু, মুলো, কচু, বেগুন, পেঁয়াজের কলি প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীতে বাজার পূর্ণ,—যেমন টাট্‌কা, তেমনই সুলভ। বাজারে বিল খাল হইতে নানাজাতীয় মাছেরও আমদানী হয় ;—বড় বড় কৈ, মাগুর, দীর্ঘপদ কৃষ্ণকায় 'গল্দা-চিংড়ি' তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাগ্দিনীরা সকালবেলা গৃহস্থবাড়ীতে ছোলা মটরের শাক ও তারামণির ফুল ঝোড়া বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসে, এবং আধ পয়সার চাউলের বিনিময়ে যতগুলি শাক বা ফুল দিয়া যায়, তাহা একটি বৃহৎ পরিবারের পক্ষেও যথেষ্ট। তথাপি যে সকল পল্লীবাসী সহরাঞ্চলসুলভ শীতের শ্রেষ্ঠ তরকারী কপি কড়াইশুঁটীর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁহারা পল্লী-জননীর নিতান্ত অকৃতজ্ঞ সন্তান!

পৌষ মাস পড়িবামাত্র ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত পোষলার আয়োজন আরম্ভ করে। পাঠশালায় গুরুমহাশয় আসিবার পূর্বে, স্কুলে টিফিনের অবকাশে, বৈকালে খেলা করিবার মাঠে, এমন কি, রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়াও, এই গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ চলে! দিন স্থির করিতে তত বাদানুবাদ হয় না, কিন্তু স্থান স্থির করিতে তাহারা যে আন্দোলন উপস্থিত করে, লাট-সভার বাজেটের বক্তৃতাও তাহার তুলনায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত! প্রথমে কেহ হয়ত গ্রামের সন্নিকটবর্তী কোন মাঠের নাম করিল। আর তিন জন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ও রকম 'জল-টানা' মাঠে কি পোষলা করা চলে?" তখন হয়ত আর একটা মাঠের নাম হইল। তাহার নিকটে জলাশয় আছে বটে, কিন্তু সেখানে নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নেপথ্যের বড় অভাব। মধ্যাহ্নকালে রন্ধন ও আহারাদি ফাঁকা জমীতে চলিতে পারে না। অনেক তর্কবিতর্কের পর বসন্তপুরের মাঠই পোষলার প্রশস্ত স্থান বলিয়া স্থির হইল। কারণ, তাহার নিকটেই একটি জলপূর্ণ দীঘি আছে, এবং 'জোড়াবটগাছতলা' হইতে তাহার দূরত্বও অধিক নহে। রবিবারে উৎসবের দিন নির্ধারিত হইল।

যে সকল গরীবের ছেলে বেশী পয়সা সংগ্রহ করিয়া বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া ধুমধামে পোষলা করিতে না পারে, তাহারা সকলেই স্ব স্ব আহারের উপযুক্ত পরিমাণ চাল, ডাল, লবণ, তেল, বেগুন, আলু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নির্দিষ্ট মাঠে উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে দুই একটি পয়সা চাঁদাও দিতে হয়। এই পয়সা দিয়া মাছ, পায়েসের জন্য দুধ ও গুড় ইত্যাদি সামগ্রী ক্রীত হইয়া থাকে। নান জনের নানা বর্ণের চাল ও নানাজাতীয় ডাল একত্র মিশিয়া তাহাদের খাদ্যদ্রব্যে এক নূতন আস্বাদন প্রদান করে।

এইরূপে চাল ডাল বাঁধিয়া ও মায়ের নিকট হইতে দুইটি করিয়া চারিটি পয়সা চাহিয়া লইয়া, বিপিন ও বিনোদ দুই ভাই রবিবার সকালে বন্ধুবর্গের সহিত বসন্তপুরের মাঠে পোষলা করিতে গেল।

দামিনী ও বিধু, বিনোদ-বিপিনের ছোট। দামিনীর বয়স আট বৎসর, বিধুর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সকালে দাদাদের সঙ্গে পোষলায় যাইতে না পাইয়া দুই ভাই বোন ভারি হাঙ্গাম বাধাইল। মা পুত্র কন্যা দুটিকে ভুলাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। বাক্স হইতে ফরাসী ছিটের একখানি পুরাতন দোলাইয়ের এক অংশ ছিঁড়িয়া ব্যাকুলা কন্যার বিবাহসম্ভাবিতা মেয়ের জন্য প্রদান করিলেন! বিপিনের এক বন্ধু তাহাদের বাড়ীর জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের বিসর্জনের সময় খানিক রাঙতা তুলিয়া সৌহার্দের নিদর্শনস্বরূপ বিপিনকে দান করিয়াছিল ;—বিপিন সেই তুচ্ছ পদার্থ অমূল্য রত্নের ন্যায় সযত্নে রাখিয়াছিল ;—দামিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুতুলের গহনা গড়াইবার উদ্দেশ্যে সেই রাঙতার কিয়দংশও তাহাকে অর্পণ করা হইল। বিধুকে অন্য দিন অপেক্ষা বেশী করিয়া 'সরাগুড়' দিয়া মুড়ি দেওয়া হইল। কিন্তু তাহারা পোষলার ঝোঁক ছাড়িল না।

বেলা অধিক হইয়া উঠিল। রাখাল গোয়ালঘর হইতে গরু বাহির করিয়া মাঠে চরাইতে লইয়া গেল। দুই একটি ভিখারিণী পিতলের চক্‌চকে ঘটি হাতে লইয়া "রাধাকৃষ্ণ! চাট্টি ভিক্ষা পাই গো মা জননী!" বলিয়া গোময়লিপ্ত অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাগ্দিনী ঝুড়ি-বোঝাই শাক আনিয়া "ছোলার শাক নেবে গো মা ঠাক্‌রুণ!" বলিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এমন সময় দত্তদের ন'গিন্নি স্নানান্তে মুক্তকেশে শুভ্রবেশে একখানি হাতা হাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৌমা! এখনও যে উনন জ্বালনি দেখছি! আজ একবার সকাল সকাল খোলা জ্বালব—মনে করচি।" বিপিনের মা বলিলেন, "না মা! আজ রবিবার, ইস্কুলের ভাতের ত তাড়াতাড়ি নেই, তাই এখনও উননে আগুন দিই নি ; বিপিনেরা দু' ভায়ে আজ পোষলা করতে গিয়েছে, এরা ভাই বোনে যেতে পায়নি বলে কেঁদে খুন ; তা বল দেখি ঠাকরুণ, ওদের কি ক'রে তাদের সঙ্গে ছেড়ে দিই?" দত্তগৃহিণী বলিলেন, "তা এক কাজ কর না কেন? তোমাদের ঐ গোয়ালবাড়ীটাতে আজ ওদের পোষলা রেঁধে দাও, তা হলেই ওরা শান্ত হবে।"

বিপিনের মা ভাবিলেন, এ কথা মন্দ নয়। ছেলেমেয়ের জন্য তিনি গোয়াল-বাড়ীতেই পোষলা রাঁধিবেন, স্থির করিলেন। গোয়ালবাড়ীটি বেশ পরিষ্কার, ঝর্‌ঝরে। এক দিকে গোয়ালঘর, অন্য দিকে ঢেঁকিঘর, তার পাশেই একখানা লম্বা চালা। এই চালাতে না আছে এমন জিনিস নাই!—কতকগুলি কাঠ, ঘুঁটে ; গোটাকতক মাটীর কলসী, অধিকাংশই কাঁধা-ভাঙ্গা ও সচ্ছিদ্র ; এক পাশে একটি ছোট বাঁশের মাচা, তাহার উপর দুই ছালা শিমুলের তুলো, কতকগুলো পাকাটি, চুকো শাকের বীজ আঁটি করিয়া বাঁধা, আধ কলসী পালঙ্ শাকের বীজ ; আধ-খানা ভাঙ্গা জাঁতা, দু'খানি সুরকীমাখা বরগা ও খান দুই তিন ছেঁড়া চাটাই ; এবং এক কোণে একটা ইঁদুরের গর্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত এক রাশ ঝুরো মাটী!

গোয়ালবাড়ীর পাশেই বেগুন ও শাক সবজীর 'বেড়'। প্রাঙ্গণখানি ছায়াচ্ছন্ন : একটা ঝাঁকড়া কুলগাছ, একটা শিউলীগাছ, একটা বড় নিমগাছ ও গোটাকত

পেয়ারা ও কাঁঠালের অনতিবৃহৎ চারা সমস্ত উঠানটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে ; সকালে সূর্যদেব পূর্বাকাশের কিছু ঊর্ধ্বে উঠিলেই দূরে দীঘির প্রান্তবর্তী বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া, নিম্ববৃক্ষের ব্যবধানপথে এই গোয়ালবাড়ীর দিকে তাঁহার কিরণ-দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে তাঁহার প্রখর কিরণ বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এই গোয়ালবাড়ীটিই শিশু-দিগের জন্য পোষলা রাঁধিবার প্রশস্ত স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।

কুলগাছের তলে একটি ছোট 'তিউড়ী' খুঁড়িয়া দামিনী ও বিধুর জন্য তাহাদের মা পোষলা রাঁধিতে বসিলেন। বেড়ের মধ্যে বেগুনগাছে কাল কাল বেগুন ও চালের উপর শিম ফলিয়াছিল ; তাহাই তিনি তুলিয়া আনিয়া ভাজিয়া দিলেন। গাছ হইতে একটা পাতি লেবু তুলিয়া তদ্দ্বারা অম্বলের অভাব পূর্ণ করিলেন। কিন্তু ভাই বোনে পায়েসের জন্য বড়ই 'বায়না' করিতে লাগিল, তাই বিপিনের মা বৃদ্ধা দাসী গোবরার মাকে শীতল ঘোষের বাড়ী হইতে আধ সের টাট্‌কা খেজুরে গুড় আনিতে বলিলেন। শীতল ঘোষ তাঁহাদের অনেকগুলি খেজুর গাছ কাটিয়াছিল। প্রত্যেক গাছের জন্য গৃহস্থ দুই সের হিসাবে গুড় পাইয়া থাকে ; যাহারা গুড় না লয়, তাহারা দুই সের গুড়ের মূল্যস্বরূপ দুই আনা পয়সা পায়। কিন্তু যাহারা ছেলেমেয়ে লইয়া সংসার করে, তাহারা পয়সার পরিবর্তে গুড়ই লইয়া থাকে। বিপিনের মাও গুড় লইতেন।

গোবরার মা গুড় লইয়া আসিল। সকালে মাঠে চরাইতে লইয়া যাইবার আগে রাখাল বুধী গাইকে দুইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। বিপিনের মা দুধের ভাঁড় হইতে আধ সের দুধ লইয়া এক মুষ্টি আতপ চাউল ও টাট্‌কা খেজুরে গুড় দিয়া ছেলেমেয়েকে পায়েস রাঁধিয়া দিলেন। দামিনী ও বিধু পোষলা করিয়া শান্ত হইলে, গৃহিণী সেই স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া স্নানে চলিলেন।

তখন খুব বেলা হইয়াছে। আর নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় নাই। তাই তিনি কূপ হইতে তাড়াতাড়ি দু' ঘড়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিয়া ভিজে চুলগুলি মাথার সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধিয়া রান্নাঘরে চলিলেন। চুলঝাড়টা তাঁহার শুকাইবারও আর অবসর হইল না ; কারণ, তিনি জানিতেন, বাড়ীর কর্তাটির মনিব জমীদারের বাড়ী হইতে বুভুক্ষু অবস্থায় গৃহে ফিরিবার আর বিলম্ব নাই, মাঠ হইতে রাখাল কৃষাণদেরও ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পোষলা অনেক বাড়ীতে এইরূপেই সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধদিগের পোষলার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মাসের অর্ধেক অতীত হয় দেখিয়া বৃদ্ধ জমীদার রামকিঙ্কর চৌধুরীর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর পোষলার আয়োজনার্থ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন! ইতিমধ্যে তাঁহার অন্যতম বয়স্য কার্যানুরোধে কলিকাতায় গেল। তাহাকে কপি, কড়াইশুঁটী ও কমলা লেবু প্রভৃতির বরাত দেওয়া হইল।

পাঁচ সাত দিনের মধ্যে এই সকল পল্লী-দুর্লভ তরকারী ও ফল আনীত

হইলে কৃষ্ণকিঙ্করের পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া পোষলা করিতে চলিলেন। তাঁহার দলে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। অনেক আমোদপ্রিয় পল্লীযুবকও সে দলে জুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনের নানাবিধ সরঞ্জাম চলিল ;—চাউল আধ মণ, প্রচুর-পরিমাণ তৈল, ঘৃত, তরকারী, দুই তিন রকম ডাল, বাটা মশলা, বড় বড় কড়া, ডাল ভাত ঢালিবার পিতলের ডেক্‌চী ইত্যাদি সঙ্গে চলিল। বেলা দশটার সময় নদীর পশ্চিম পারে মাধবপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল। নৌকা তীরে লাগিবামাত্র আরোহিগণ ঝুপঝাপ করিয়া নামিয়া পোষলার উপযুক্ত স্থানের আবিষ্কারে যাত্রা করিল। দুই জন পরিচারক জিনিসপত্র পাহারা দিতে লাগিল।

মাধবপুর গ্রামখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীর পাড়ের ঠিক উপরেই দুই তিনখানি বড় বড় আটচালা ঘর, একটি মণ্ডলদের গোলাবাড়ী, সারি সারি গোলা, প্রাঙ্গণে তিন চারিটি উচ্চ নারিকেল গাছ, গ্রামপ্রান্তবর্তী নদীতীর হইতে এগুলি চিত্রের ন্যায় সুন্দর দেখায় ; পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ ও দেবদারু, তাহাদের ঊর্ধ্বশাখায় বসিয়া নানাজাতীয় বিচিত্রবর্ণ পক্ষী কলরব করিতেছে ;—দোয়েল গান ধরিয়াছে, শ্যামা শিষ দিতেছে, হল্‌দে পাখী 'বৌ-কথা-কও'র অবিরাম ঝঙ্কারে কোনও অনুদিষ্টা, অভিমানিনী মৌনবতী পল্লীবধূর অভিমানভঙ্গের নিষ্ফল আশায়, আপনার কণ্ঠ ক্লান্ত করিয়া তুলিতেছে। নদীর ক্রমনিম্ন তীরদেশে সাদা কালো ছাগলের দল মাথা নীচু করিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে ; একটা অস্থিচর্মসার কুকুর দীর্ঘ ঘাসের আড়ালে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নতমুখে একখানি হাড় চিবাইতেছে ; নদীর কিনারায় সবুজ শৈবালরাশির মধ্যে সম্মুখের দুই-পা-বাঁধা একটা ঘোড়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখ নামাইয়া কি খাইতেছে ; দূরে দূরে দুই তিনটা ডাহুক ও জলপিপি সুদীর্ঘপদে দামের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর অপর পারে এক জন ধোপা এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পাটের উপর ময়লা কাপড় আছড়াইতেছে, তাহার সঙ্গিনী দুইটি রজকিনী সদ্যোধৌত কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরিয়া মাটীর উপর মেলিয়া দিতেছে, এক একবার হাঁড়ীতে করিয়া জল লইয়া সেই কাপড়গুলির উপর ছড়াইয়া দিতেছে। একটু দূরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। নদীতীরস্থ একটা ইঁটের পাঁজার কাছে দাঁড়াইয়া দুই জন রাখাল পাল্লা দিয়া নদীজলে ঢিল ছুঁড়িতেছে ;—কাহার নিক্ষিপ্ত ঢিল বেশী দূরে যায়, তাহারা ইহারই পরীক্ষায় ব্যস্ত,—এ দিকে তাহাদের দুই একটা গরু চরিতে চরিতে দল ছাড়িয়া ধোপার কাপড়ের উপর গিয়া পড়িতেছে, আর ধোপার ছয় বৎসরের একটি চাদর-পরা ছেলে বামহস্তে একটা প্রকাণ্ড পেটমোটা ডাবা হুঁকা ও দক্ষিণ হস্তে চিতের ডাল লইয়া গরু তাড়াইতে যাইতেছে !

মাধবপুর পল্লীর অদূরে একটা প্রকাণ্ড বাগান। সেই বাগান পোষলার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল। বাগানটি ছায়াপূর্ণ, আবর্জনাবর্জিত, নদী হইতেও দূরবর্তী নহে। এই বাগানে আম, তেঁতুল, কৎবেল, চালতা ও লিচু গাছেরই সংখ্যা অধিক ; অন্যান্য গাছও অনেক আছে। একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল

গাছের নীচে তিন চারিটা বড় বড় 'তিউড়ী' খোঁড়া হইল। যুবকের দল বৃক্ষ-শাখায় সাদা, লাল ও হলুদে রঙের শীতবস্ত্র ঝুলাইয়া, জুতা ছাড়িয়া, কেহ তরকারী কুটিতে, কেহ চাউল ধুইতে, কেহ কাঠ কাটিতে, কেহ বা উনান জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। চারি দিকে সকলেই শশব্যস্ত। হাস্যকলরোলে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত—যেন কতকগুলি লোক এই শান্ত সুন্দর অরণ্যভূমিতে মৃগয়া করিতে আসিয়াছে। দূরে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে ঘুঘুর দল এই কলরবের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া গলা ফুলাইয়া মাথা নোয়াইয়া 'ঘু-ঘু—ঘু' শব্দে উচ্ছ্বসিত প্রণয়বেগ প্রশমিত করিতেছে। জামরুল গাছের ডালে একটা কাটঠোক্‌রা ঠক্ ঠক্ করিতেছে, এবং অদূরে একটা কদম্বের আগ্‌ডালে একটা চিল বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে অতিকরুণ তীব্র স্বরে শীতকাতর জীবনের কঠোর বেদনা ও বৈচিত্র্যহীনতার পরিচয় দিতেছে।

কৃষ্ণকিংকর বাবুর অনুগত দুই চারি জন ব্রাহ্মণযুবক রন্ধনকার্যে বিশেষ দক্ষ। সকল বিষয়েই তাহারা ধনুর্ধর! গাঁজা টানিতে, মদ খাইতে, মারামারি করিতে, অপরাধে বা নিরপরাধে বাবুর জুতা খাইতে, এবং বাবুর প্রসন্নতালাভকালে প্রহারের সুদ ও আসল পোষাইয়া রসগোল্লা গিলিতে অত্যন্ত মজবুত! সকাল নাই, বিকাল নাই, দুপুর নাই, সন্ধ্যা নাই, সকল সময়েই তাহারা গোবিন্দপুরের রাস্তায়, নদীর ধারে, পুকুরের পাড়ে, গৃহস্থের বাগানের প্রান্তবর্তী সরু গলি-পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ; পরিধানে চওড়াপেড়ে কাপড়, পায়ে সদ্যোব্রুস জুতা, গায়ে কামিজ বা কোট, কখনও তাহার উপর কোঁচান চাদর, কখনও র্যাপার ; কাহারও হস্তে ছাতা, কাহারও হাতে ছড়ি,—কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছে, সর্বজ্ঞের প্রপিতামহও তাহা বলিতে পারেন না! কিন্তু কৃষ্ণকিংকর বাবুর এই সকল কিংকরের গতি ত্রস্ত, মুখের ভাব ব্যস্ত, চক্ষু সর্বত্রগামী! দেখিয়া মনে হয়, কোনও ধনবানের বংশধর বুঝি পিতার অগণিত অর্থে আপনাদিগের তীক্ষ্ম বিষ-দন্ত ক্ষয় করিতেছে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কাহারও চ.ল চুলা নাই। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া ইহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র কৃষ্ণকিংকরের তৈলাক্ত স্কন্ধে ভর করিয়াছে ;—এ দিকে তাহাদিগের দুঃখিনী মাতা পৈতা কাটিয়া কিংবা কোনও অবস্থাপন্ন ভদ্র-লোকের বাড়ীতে পাচিকার কাজ করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছেন! ইহাদিগকে পথে দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খেলাধুলা ছাড়িয়া রাস্তা হইতে দূরে পলাইয়া যায় ; পল্লীর গৃহস্থযুবতীর দল সভয়ে ঘোমটা টানিয়া পথ হইতে দশ হাত তফাতে দাঁড়ায়। গাছীরা খর্জুররসসঞ্চয়ের উদ্দেশে খেজুরগাছে 'ঠিল্লি' বাঁধিতে উঠিয়া দৈবাৎ ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, এবং রস চুরি যাইবার ভয়ে ঠিলির মধ্যে পর্যাপ্তপরিমাণে মানকচু রাখিয়া দেয়, কিন্তু 'নষ্টস্য কান্যা গতিঃ'? সন্ধ্যার পর ইহারা পাঁচ সাত জনে মিলিয়া রস চুরি করিতে গিয়া যখন দেখিতে পায়, সকল ঠিলির মধ্যেই মানকচু চাকা চাকা করিয়া কাটা

রহিয়াছে, তখন নৈরাশ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া ঠিলিগুলি ভাঙিয়া দিয়া গৃহে প্রস্থান করে। প্রভাতে নির্বোধ গাছী বুঝিতে পারে, ঠিলিতে মানকচু না দেওয়াই ছিল ভাল, রস চুরি যাইত বটে, কিন্তু ঠিলিগুলি ভাঙিত না।

যাহা হউক, এই সকল 'আটপিঠে' 'দশকর্মান্বিত' ব্রাহ্মণযুবক ও অন্য অনেকে বন হইতে কাঠ ভাঙিয়া আনিল ; খোন্তা দিয়া মাটি খুঁড়িয়া উনন প্রস্তুত হইলে রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল। বেলা অনেক হইয়াছে, এবং শীত কিছু কমিয়াছে দেখিয়া, তৈলচর্চিতদেহে অনেকে স্নান করিতে গেল।

তখন বেলা বারোটা। গ্রামের গৃহস্থরমণীগণ সংসারের কাজ সারিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন ; নিশ্চিন্তমনে স্নান করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে কত গল্প, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা, কত হাসি, কত বেদনাভরা করুণবচন ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার সংখ্যা নাই ; ছোট ছোট মেয়েরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া 'গামছা ছাঁকা' দিয়া মাছ ধরিতেছে ;—কোনও বার গামছা ভরিয়া গুগ্‌লি উঠিতেছে, কোনও বার শুধু বালি উঠিতেছে, আর তাহাদের ওষ্ঠস্খলিত কৌতুকতরল সরল হাস্যে নদীতট প্রতিধ্বনিত হইতেছে ! দুই তিন জল বৃদ্ধা জলের ধারে একখানা কাঠের গুঁড়ির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া তেল মাখিতেছে, মাটি দিয়া মাথা ঘষিতেছে ; কেহ বা বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছে ; কয়েকটা বক নিম্নতটবর্তী শুশুনির জমীর উপর শনৈঃ শনৈঃ দীর্ঘ লঘু পদ নিক্ষেপ করিয়া আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পোষলার দল নদীতে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, নিতাই মাঝির মাছের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে ;—খালুয়ের ভিতর নানা রকম মাছ,—মোটা মোটা গল্লা চিংড়ি, মাঝারী রকমের কালবোস, নৌচি, মিরগেল, বড় বড় খয়রা,—দেখিয়া বাবুদের মনে যৎপরোনাস্তি লোভের সঞ্চার হইল। তাহারা খালুই সমেত সমস্ত মাছ পোষলার কাছে লইয়া গেল। নিতাই মাঝি বাবুদের অনুসরণ করিল। তাহার পুত্র বাঁশী দাঁড়ের উপর জালখানি ঝুলাইয়া গৃহে চলিল। কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু গ্রামের বাজারে মাছের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না ; বিশেষতঃ মাছগুলি খুব টাট্‌কা। বাবুদের মাছের দরকার অত্যন্ত বেশী, এ কথা বুঝিতে পারিয়া নিতাই খালুয়ের সমস্ত মাছের দাম দুই টাকা চাহিল। কিন্তু অবশেষে বারো গণ্ডা পয়সাতেই সমস্ত মাছ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। যদিও এইরূপ 'থাওক' দরে সমস্ত মাছ বেচিয়া তাহার লাভ হইল না, কিন্তু কি করিবে ? কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু জমীদার, তিনি ইচ্ছা করিলে নিতাইকে 'ভিটে-মাটি' ছাড়া করিতে পারেন। যাহা হউক, এত লোকসান দিয়াও সে ভরসা করিল যে, এবার বাবুকে ধরিয়া তাহার বাড়ীর কাছের আম-কাঁঠালের বাগানখানি কিছু কম টাকায় জমা করিয়া লইবে।

রান্নাবান্না সমস্ত শেষ হইলে হঠাৎ দেখা গেল, একটা জিনিসের বড় অভাব

রহিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে পেঁয়াজ আনা হয় নাই! নৌকা করিয়া নদী পার হইয়া গ্রামের বাজার হইতে পেঁয়াজ আনিতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে. হয়ত তত বেলায় সব্জীরা দোকান তুলিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে,—ভাবিয়া, এক জন মোসাহেব তখনই সব্জীপাড়ার দিকে ছুটিল; এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে এক কোঁচড় পেঁয়াজ ও আদঝুড়ি পেঁয়াজের কলি লইয়া উপস্থিত হইল। "রামকান্ত বড় যোগাড়ে ছোকরা!" বলিয়া সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! রামকান্তও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া দংষ্ট্রাপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিল, "আমাদের বাবুর হুকুম হ'লে কি না কর্‌তে পারি? দুপুর রাতে বাঘের দুধ আনিতেও এ শর্ম্মা অক্ষম নয়।" কিন্তু তৎকালে ব্যাঘ্রদুগ্ধের আবশ্যক না হওয়ায় রামকান্তের এই বাহাদুরী পরীক্ষা করিবার কাহারও অবসর হইল না! বিশেষতঃ, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। একটি তিউড়ীর উপরে একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ে পায়েস চড়িয়াছে, টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে, আর একটা টুলের উপর গামছা-কাঁধে এক জন লোক প্রকাণ্ড একখানা হাতা দিয়া নূতন খেজুরে গুড় ও আতপ-চাউল-মিশ্রিত সেই লোহিতাভ দুগ্ধরাশি আলোড়িত করিতেছে। অন্যান্য সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সন্নিবদ্ধ! কেবল একটু দূরে একটা আমগাছের ছায়ায় দুই দল ছেলে 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতেছিল, এবং আরও খানিক দূরে বৃক্ষাদিবর্জ্জিত, রৌদ্রতপ্ত, 'উক্‌নে'-পূর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলি অধিকবয়স্ক বালক মহা উৎসাহে ব্যাট্‌বল খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় মিষ্টান্ন ও দধি লইয়া ময়রা ও গোয়ালা পোষলা-ক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইল। ময়রা 'আধাছানা'র সন্দেশ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই; গোপবন্ধুও 'শুকোদই' পাতিবার সমস্ত অব্যর্থ কৌশল বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সন্দেশ ও দধি দেখিয়া কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর গদাধরপ্রমুখ বয়স্যবর্গ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এ সন্দেশ গোয়ালাবাড়ীর দিক দিয়াই যায় নাই! আর যে দই, ইহাকে 'শুকো' বলিলে কাহাকে 'রূশি' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিস্তর গবেষণা দ্বারাও নিরূপণ করিতে অক্ষম! গোয়ালা ও ময়রা উভয়েই তাহাদের এত যত্নের দই সন্দেশের এইরূপ নির্দ্দয় সমালোচনা শুনিয়া, স্বগতভাবে এই সকল চাটুকার-পুঙ্গবগণের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিল, তাহা শত্রুর উদ্দেশেই সচরাচর উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত কখনও খাদ্যদ্রব্যের তালিকাভুক্ত হয় নাই!

রন্ধন শেষ হইলে সারি সারি পাতা পড়িল। ছেলেরা দাণ্ডাগুলি ও ব্যাট্‌বল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া সারি বাঁধিয়া আহারে বসিয়া গেল। কয়েক জন পরিবেশক ভিন্ন সকলেই ভোজনে যোগ দিল। ধীরে ধীরে আহার শেষ করিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল।

জবারক্ত তপনদেব বাগানের অন্তরালে পশ্চিম আকাশপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন।

বাগানের অসমোচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর দীর্ঘ ছায়া মাঠের উপর পড়িয়া, ক্রমে দীর্ঘতর হইয়া, মিলাইয়া গেল। শেষে গোধূলির ছায়া জল স্থল আচ্ছন্ন করিল। পোষলার দলস্থ সকলে মোটা কাপড়ে সর্বশরীর ঢাকিয়া নৌকায় উঠিল।

যখন গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগান হইল, তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, আকাশে অনেক নক্ষত্র ফুটিয়াছে, বাগানে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকচ্ছটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং নদীর অপরপারস্থ বাগানের অভ্যন্তরবর্তী বুনোপাড়া হইতে ম্লান মৃৎ-প্রদীপ মৃদু আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

পারঘাটের কাছে বটগাছের নীচে নৌকা লাগিল। তখন পারঘাটের খেয়া নৌকায় 'মসক'-পূর্ণ একগাড়ী গুড় নদী পার হইতেছিল। অদূরবর্তী গৌরদাস বাবাজীর আখড়া হইতে খোল করতালের মিশ্রধ্বনি উঠিয়া আসন্ন কীর্তনের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল ; এবং পারঘাটের উপরে শিমুলগাছের নীচে মাঝি-দের অন্ধকারময় শয়নকুটীর হইতে কে এক জন গায়িতেছিল,—

"বেলা গেল, সন্ধ্যে হ'ল, পার কর আমারে !"

অন্ধকারপূর্ণ স্তব্ধ সায়াহ্নে নদীপ্রান্তবর্তী কুটীরশায়ী নিরক্ষর গায়কের এই তাললয়হীন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে বিরাগী শ্রান্ত হৃদয়ের অস্পষ্ট বেদনার করুণ ধ্বনি, বিষণ্ন সৌম্য সন্ধ্যার মৃদু নিশ্বাসের ন্যায়, শ্রোতার সমবেদনা ও দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় মনোহরগঞ্জের ডাকহরকরা অনেক দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাঝি, নৌকা বাঁধো।"

গান বন্ধ করিয়া নীলমণি মাঝি শশব্যস্তে ডাকের নৌকা ঘাটে লইয়া আসিল। ঝম্ ঝম্ করিয়া ঘুঙ্গুর বাজাইয়া ডাকহরকরা নৌকায় উঠিয়া ডাকের বোঝাটা নৌকার উপর ফেলিল, তাহার পর বলিল, "ইঃ!—বড্ডা জাড়! নীলুদাদা! কল্-কেটা কোথায় গো!"

তামাক সাজিয়া ডাকহরকরা টিকে ধরাইবার জন্য চক্মকি ঠুকিতে লাগিল : এদিকে পোষলার দল জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি-পথ দিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

পৌষ সংক্রান্তি

পৌষ মাসকে পল্লীরমণীগণ 'লক্ষ্মী মাস' বলিয়া মনে করেন। কোন রমণীই পৌষ মাসে স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বা পিতৃগৃহ হইতে স্বামিগৃহে গমন করেন না। এমন কি, কোনও দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া যদি সে সময়ে গৃহে থাকেন, তাঁহাকেও পৌষ মাসে বিদায় দিতে নাই।

এই সময়ে ধান কাটা-মাড়া আরম্ভ হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের খামারে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে, সুপক্ব ধান্য-শীর্ষ স্তূপাকারে পালা দেওয়া রহিয়াছে ; কৃষাণগণ দশ বারোটা বলদ লইয়া হুঁকা টানিতে টানিতে, রজ্জুবন্ধ বলদশ্রেণীর লেজ মলিতে মলিতে, তাহাদিগকে ধানের পালার উপর ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, পিঠে পাঁচনের বাড়ি মারিতেছে, কেহ 'কাঁদাল' দিয়া ধানের আঁটি উল্টাইয়া দিতেছে, কেহ কুলায় করিয়া ধান ছড়াইয়া তাহার 'চিটা' ও ধূলোমাটি উড়াইয়া দিতেছে ; ফকীর বৈষ্ণবেরা 'গোপীযন্ত্র' ও মন্দিরা বাজাইয়া কৃষাণদের মনোরঞ্জন করিয়া দুই এক 'পাথি' ধান ভিক্ষা লইয়া যাইতেছে ; মাখা-তামাক-বিক্রেতারা 'খোলা'য় খোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং দুই ছিলিম তামাক দিয়া আধ সের ধান উপার্জন করিতেছে। চারিদিকেই সজীবতার হিল্লোল সুপ্রকাশ। যেন দেবী কমলা তাঁহার কমলাসন পরিত্যাগপূর্বক ধান্যের 'আড়ি' কক্ষে লইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে অন্ন বিতরণ করিতেছেন!

পৌষ মাসের শেষ দিবসে এই কঠোর পরিশ্রমের দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়, সে দিন সাধারণ শ্রমজীবিগণ আমোদ আহ্লাদেই সময় অতিবাহিত করে।

৩০এ পৌষ রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই পল্লীবাসী গোয়ালা, কৈবর্ত,

জেলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের ছেলেরা তাহাদের 'আনকোরা' ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হইল। এ তাহাদের সখের ভিক্ষা। প্রত্যেক দলে একজন একটা ধামা লইয়া চলিয়াছে, আর দলস্থ অবশিষ্ট সকলের হাতে এক একগাছি কঞ্চি। এই কঞ্চি বহুসংখ্যক সুপক্ক টাট্‌কা লাল লঙ্কামরিচে পরিপূর্ণ, সুতা দিয়া সেগুলি কঞ্চির সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহারা এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশপূর্বক বলিতেছে,—

"হরিবোল হরিবোল,
সোনা রায়ের ভার এল বাড়ীর ভিতর
বল ভাই শিবো,
এক কাঠা চাল ন'টা বড়ি নিবো॥"

সুর করিয়া এই ছড়া বলিয়া তাহারা ভিক্ষা আদায় করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ছড়ার ভাষায় তাহারা সরলা গৃহস্থমহিলাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেও বিরত হইতেছে না! তাহারা কোমল শিশু-সুরে অসঙ্কোচে দৈববাণী করিয়া যাইতেছে,—

"যে দেবে ছালা ছালা,
তার হ'বে সাত গোলা।
যে দেবে কাঠা কাঠা,
তার হ'বে সাত বেটা।
যে দেবে বাটী বাটী,
তার হ'বে সাত বেটী।
যে দেবে মুঠো মুঠো,
তার হ'বে হাত ঠুঁটো!"

শুনিয়া রমণীগণ হাসিয়া তাহাদিগকে মুঠো মুঠো চাউল দিয়াই বিদায় করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "সাত বেটী হওয়ার চেয়ে হাত ঠুঁটো হওয়া ঢের ভাল! বেয়ান মাগীর মন ত কিছুতেই পাওয়া যায় না, তা ছাড়া জামাইগুলির কেহ মদ, কেহ গাঁজা, কেহ বা গুলিতে ভোর হইয়া সমস্ত জীবনটা ভাজা ভাজা করিয়া মারে। হাত ঠুঁটো হইলে এত যন্ত্রণা সহিতে হয় না।"

সকালে ছেলেরা এইরূপে ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। বেলা বেশী হইলে মুসলমান শ্রমজীবিগণ টুপি মাথায় দিয়া, গলায় রুমাল বাঁধিয়া, মাণিকপীরের গান গাহিতে গাহিতে ধামা-হস্তে দলে দলে গৃহস্থগৃহে উপস্থিত হইল, এবং গৃহস্থের সদর দরজায় আসিয়া ঢোল ও কাঁশী বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিল,—

"ওরে ও কবির ঘোষ! চিন্‌তে না পারিলে মাণিকপীর?
খড়ম পায়ে নড়ি হাতে ন্যাণ্ডড়া ফকীর,
গোয়ালার 'বাথানে' এসে প্রথম জাহির!
'দই দুগ্ধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে,

আনিয়া হাজির কর পীরের দরবারে।'
কবির ঘোষ দই দুধ নাহি আনি দিল,
নওয়া লক্ষ ধেনু তার বাথানে মরিল।"

গান শেষ হইবার পূর্বেই পল্লীবধূগণ তাহাদের ধামায় এক এক রেকাবী চাউল ঢালিয়া দিয়া গেল। কিন্তু তাহারা শুধু চাউল লইয়াই ক্ষান্ত হইল না ; চাউল, ডাল, বড়ি, বেগুন প্রভৃতি তরকারীর জন্যও আবদার আরম্ভ করিল। কোন কোন গৃহস্থ দয়াপরবশ হইয়া দুই একটা আধলা বা পয়সাও ভিক্ষা দিল। পৌষ মাসের শেষ দিন সর্বসাধারণের 'তিলুয়া'ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে ; ভিক্ষালব্ধ পয়সায় ময়রার দোকান হইতে 'তিলুয়া' কিনিয়া, অপরাহ্নে স্নান করিয়া, ইহারা পীরের দরগায় সেই তিলুয়া শিণী দিল, তাহার পর বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন মাঠে পোষলা করিতে গেল। সন্ধ্যার পূর্বে তাহাদের বনভোজন সমাপ্ত হইল।

আজ সকালে অনেকেই গুড়ের 'বাইনে' আসিয়া ধন্না দিয়াছে। পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে সকল বাড়ীতেই পিঠে পুলি আঁদোসার আয়োজন হইবে—গুড়ই তাহার প্রধান উপকরণ, সুতরাং আজ সকলেই খানিক টাট্‌কা খেজুরে গুড় সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলে খেজুর গাছের অভাব নাই। এ সময় গোয়ালা, বাগ্দী ও কৈবর্তেরা চারি পাঁচ জন একত্র হইয়া, শীতকালের কয়েক মাস শুধু খেজুরে গুড়েরই কারবার করে। খেজুর গাছ বাঁধা হইতে রস জ্বাল দিয়া গুড় করা পর্যন্ত সকল কাজই তাহারা স্বয়ং করিয়া থাকে, সুতরাং এই ব্যবসায়ে তাহাদের বেশ লাভ হয়। যেখানে রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করে, তাহাকে 'বাইন' বলে। একটা বড় তেঁতুলগাছের তলায়, কিম্বা বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে বড় বড় উনান কাটিয়া প্রকাণ্ড এক একটা মাটীর পোড়ান 'খোলা'তে রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে। 'বাইনের' চারিদিকে শুষ্ক খর্জুরপত্রের 'টাটি' ; আঙিনাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; তাহার এক পাশে কতকগুলা ভাঁট, আশ্যাওড়া, কালকাসিন্দার শুষ্ক বন 'পালা' দেওয়া রহিয়াছে। গুড় জ্বাল দিবার জন্য গাছীরা জঙ্গল হইতে সেগুলি কাটিয়া আনিয়া রাখিয়াছে ; 'গাছ বাঁধিবার' ঠিলিগুলি দড়িগলায় চারিদিকে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। মলিন মোটা মার্কিনের অপ্রশস্ত চাদর গায়ে জড়াইয়া গাছীরা এক হাতে উননে 'জঙ্গল' ঠেলিয়া দিতেছে, আর একহাতে ডাবা হুঁকা ধরিয়া গাঁজার কিঞ্চিৎ মোলায়েম সংস্করণ—দা-কাটা- ঘরে-মাখা তামাকে টান দিতেছে ; চট্‌পট্‌ করিয়া উননে আগুনের শব্দ হইতেছে, কল্‌কল্‌ করিয়া রস ফুটিয়া উঠিতেছে, আর এক একবার তাহারা 'ওড়ং' দিয়া রসের 'গাদ' কাটিয়া নিকটবর্তী একটা ঠিলির মধ্যে ফেলিতেছে, এবং নানারকম গল্প করিতেছে। গল্পের অধিকাংশই গুড়সম্বন্ধীয়,—কাহার পিতা ও পিতামহ গুড়ের কারবার করিয়া দুই শত টাকা

রাখিয়া গিয়াছিল, কে কবে খেজুর গাছে উঠিতে গিয়া পা ফস্কাইয়া পড়িয়া 'জন্মের ভাত' খাইয়াছিল, শেষরাত্রে ঠিলি খুলিতে গিয়া কে কতবার বাঘের হাতে পড়িয়াছে, এবং 'বাঁকের বাড়ি' মারিয়া কে কতদিন সন্ধ্যাবেলা রসলিপ্সু ঠিলি-চোরের রসপিপাসা নিবারণ করিয়া দিয়াছে, ওজস্বিনী চাষার ভাষায় সেই সকল গল্প চলিতেছে, আর পাড়াপ্রতিবেশী গোয়ালা, কৈবর্ত, মালো, চাঁড়াল, বাইতিদের ছেলেরা চারিদিকে বসিয়া অত্যন্ত তৃপ্তমনে সেই সকল গল্প গিলিয়া যাইতেছে, এক একবার তাহারা হাসিয়া অস্থির হইতেছে, এক একবার বা ভয়ে তাহাদের বক্ষের স্পন্দন পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছে!

বেলা প্রায় দশটার সময় গুড়জ্বাল দেওয়া শেষ হইয়া গেল। একটা খোলার গুড় 'সরাগুড়' বা 'গুড়মুচি' করিবার জন্য তাহাতে 'বীজ' মিশাইয়া ঘুটিয়া ঘুটিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত সাদা ও ঘন করিয়া তুলিল। তাহার পর বিশ পঁচিশটা ঠিলি দুই সারি করিয়া সাজাইয়া লম্বা দুখানা কাপড় দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিয়া সেই কাপড়ের উপর ঠিলির মুখে অল্পপরিমাণ গুড় ঢালিয়া 'সরাগুড়' প্রস্তুত করিল। পল্লীরমণীগণ ঘাটে যাইতে যাইতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া 'বাইনে' উপস্থিত হইল, এবং কুটুম্ববাড়ী পাঠাইবার জন্য পুরু দেখিয়া 'সরাগুড়' পছন্দ করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

'সরাগুড়' প্রস্তুত হইয়া ডালায় উঠিলে, সমবেত চাষার ছেলেরা কেহ কচুর, কেহ কলার, কেহ বা কাঁঠালের পাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া 'খোলা'র চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল ; তখন গাছীরা তাহাদের পাতায় একটু একটু গুড় উপহার দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল ;—তাহারা সেই সদ্যোজাত গুড়টুকু আস্বাদন করিতে করিতে বাইন ত্যাগ করিল। পল্লীবাসিগণও যাহার যতটুকু গুড়ের দরকার, তাহা লইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে 'বাইন' জনশূন্য হইয়া পড়িল ; শুধু ঠিলিগুলি প্রকাণ্ড উননের উপর স্তূপাকারে অধোমুখে পড়িয়া উত্তপ্ত হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন হইতেই রমণীগণের মধ্যে 'পৌষবাঁউড়ী'র আয়োজন পড়িয়া গেল। বিধবাগণ স্নান করিয়া আসিয়া কেহ গ্রাম্যবিগ্রহের মন্দিরে, কেহ কালীবাড়ীতে এক আধ পোয়া—যাঁহার যাহা সাধ্য, তিলুয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর সকলে গামলাতে আতপ চাউল ভিজাইয়া 'আতাল' পাতিলেন। চাউল অল্প ভিজিলে তাহা জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া কুটিবার জন্য ঢেঁকিঘরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে ঢেঁকির 'নোটে'র কাছে সেই চাউল সাতবার ছড়াইয়া দিয়া তবে ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করা হয় ; ইহাকেই 'আতাল' পাতা বলে। ত্রিশে পৌষ মধ্যাহ্নকালে সকল বাড়ী হইতেই ঢেঁকির শব্দ উঠিয়া গ্রামখানিকে প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে। এই দিন গ্রাম্য বাজারে অসংখ্য মাটীর 'সরা' ও 'মুচি' বিক্রয় হইতে আসে ; পিঠে ভাজিবার জন্য সকলেই আগ্রহসহকারে এক এক জোড়া 'সরা' ও 'মুচি' কিনিয়া লইয়া যায়।

দুপুরের সময় প্রায় কোনও বাড়ীতেই ভাতের আয়োজন হয় না। যাঁহাদের বাড়ীতে দু' বেলা গরম ভাত নাহিলে চলে না, ছেলেপিলে রোগা, এবং কর্তাটি গরম গরম ভাত ও 'ময়া' মাছের ঝোল ভিন্ন আর কিছুই পরিপাক করিতে পারেন না, শুধু তাঁহাদের বাড়ীতেই এবেলা ভাত রান্না হইতেছে। অনেক বাড়ীতেই আজ ছেলেমেয়েদের জন্য 'তিলজাউ' হইতেছে। তিলজাউ জিনিসটির সহিত সহরাঞ্চলের লোকের পরিচয় নাই বলিয়াই অনুমান হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে 'পরমান্ন' বা পায়সের নীচেই তিলজাউর আসন! তিলজাউ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পল্লীঅঞ্চলে গৃহস্থরমণীগণের মধ্যে তাহার একটা গল্প আছে।—

একবার এক গৃহস্থের জামাই অনেক দিন পরে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রী আনিতে গিয়াছিল। স্ত্রীটি কিছু সম্পন্ন লোকের কন্যা। শাশুড়ী বহুদিন পরে জামাতাকে পাইয়া তাহাকে 'পরম আদরে' খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি দিন পরে একদিন অতি যত্নে 'তিলজাউ' রাঁধা হইল। জামাইটির এক 'শালাজ' পরিবেশন করিতে আসিলেন। অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত যথারীতি দিবার পর শালাজ হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরজামাই, আজ তোমার জন্যে 'তিলজাউ' রাঁধা গিয়েছে, কি রকম হয়েছে, দেখ দেখি।" ঠাকুরজামাইয়ের উদর তখন ঘৃতপক্ব বহুবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মৎস্যাদিতে পূর্ণপ্রায়, অতএব জামাতৃসুলভ লজ্জার বশবর্তী না হইলেও সে উত্তর করিল, "না, পেট ভরিয়া গিয়াছে, আর 'তিলজাউ'র আবশ্যক নাই, আর উহা ত রোজই বাড়ীতে খাওয়া যায়!" জামাই বাবাজীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না ; সে প্রত্যহ বাড়ীতে 'তিলজাউ' খায় শুনিয়া, সে যে কেমন 'তিলজাউ', তাহা বুদ্ধিমতী শালাজ ঠাকুরাণী অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন ; সুতরাং তিনি বলিলেন, "তা হোক না, বাড়ীতে রোজ খাও ব'লে কি আর এখানে খেতে নাই? একটু দিই?" এই বলিয়া তিনি তাহার পাতে দিতে গেলেন, কিন্তু ঠাকুরজামাই কিছুতেই লইবেন না, এক টোপ পাতে পড়িবামাত্র তাঁহার প্রবল প্রতিবাদে শালাজ-ঠাকুরাণীকে উদ্যত হাতাখানি টানিয়া লইতে হইল। জামাই সেই তিলজাউটুকু মুখে দিয়াই বুঝিতে পারিল, বাড়ীর তিলজাউ ও শ্বশুরবাড়ীর এই তিলজাউ, উভয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ! কিন্তু সে স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিয়াছে, কি করিয়া আবার চাহিয়া লয়? অথচ তাহার মধুর আস্বাদনও ভুলিবার নয়। একালের জামাই হইলে না হয় বলিত, "তুমি কষ্ট করিয়া তিলজাউ রাঁধিয়াছ, আমার না লওয়াটা বড়ই অন্যায় হইতেছে দেখিতেছি, আচ্ছা, খানিকটে দিয়া যাও," কিন্তু সেকেলে বোকা পাড়াগেঁয়ে জামাই, বুদ্ধি তত প্রখর নহে, শুধু গুরুমহাশয়ের তামাক সাজিয়া ও তাঁহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া যা কিছু বিদ্যা হইয়াছে, কাজেই কি কর্তব্য তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বিস্তর চিন্তার পর সে ঠিক করিল, রাত্রে রান্নাঘরের হাঁড়ি হইতে খানিক তিলজাউ চুরি করিয়া খাইতে হইবে! তিলজাউ জিনিসটি এক রকম গ্রাম্য মিঠা পোলাও, শীতকালেরই একান্ত উপযোগী, কিন্তু অন্যান্য প্রভেদ ভিন্ন পোলাওয়ের সঙ্গে ইহার একটা প্রধান

পার্থক্য এই যে, পোলাও গরম গরম ভাল, কিন্তু তিলজাউ একদিন হাঁড়িতে বাসি করিয়া রাখিয়া পরদিন স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া খাইলে, তবে তাহার মাধুর্য সম্যক্ উপভোগ করিতে পারা যায়। তাই রাত্রে রান্নাঘরে হাঁড়ি বোঝাই তিলজাউ পর দিনের জন্য সঞ্চিত থাকে। জামাই বাবাজী অনেক রাত্রে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষের বাহিরে আসিল, এবং রান্নাঘরে প্রবেশপূর্বক অন্ধকারেই 'হাতড়াইয়া' তিলজাউর হাঁড়ি আবিষ্কার করিয়া 'সড়াসড়' খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার একটি সম্বন্ধী সেই সময় বাহিরে আসিয়াছিল ; সে ভাবিল, এত রাত্রে দ্বার খুলিয়া কে চুপি চুপি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল!—এ নিশ্চয়ই চোর। সম্বন্ধী মহা সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিল! বিপদ বুঝিয়া জামাইবাবাজী দু' থাবা তিলজাউ হাতে লইয়াই রান্নাঘরের খিড়কী-দ্বার খুলিয়া চম্পট দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য হইতে পারিল না। মধুর তিলজাউ ও তদপেক্ষা সুমিষ্ট 'ধনঞ্জয়ে' পরিতৃপ্ত হইয়া সেই রাত্রেই সে শ্বশুর-বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল!

স্থূলবুদ্ধি গ্রাম্যজামাই-বাবাজীর পরিণাম দেখিয়া বোধ হয় আমাদের কোনও স্থূলবুদ্ধি নগরবাসী বন্ধুই এরূপ বিপদসংকুল তিলজাউর প্রতি লোভ প্রকাশ করিবেন না! কিন্তু এখানে এ কথাও বলা অসংগত নয় যে, খাদ্যহিসাবে তিল-জাউর কোনও শ্রেষ্ঠতাই নাই, বিশেষতঃ, অল্পাহারী, ভোজনবিলাসী বাবুলোকের পক্ষে ইহা একান্ত গুরুপাক, এবং ইহা অসংকোচে তাঁহাদের পাতে দেওয়াও যায় না ; কারণ, চাউল, দুগ্ধ, ভাজা তিলের গুঁড়া ও খেজুরে গুড়ের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু শিল্প ও আস্বাদন হিসাবে ইহার প্রাধান্য না থাকিলেও, ইহার সহিত মাতৃহৃদয়ের যে অকৃত্রিম স্নেহ, যত্ন ও উৎসাহ মিশ্রিত থাকে, এবং ইহার স্বাদগ্রহণের জন্য পল্লীবালকবালিকাগণের হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আগ্রহ জাগে, এবং তাহার চরিতার্থতায় শিশুহৃদয়ের সরল আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠে, তাহার সহিত মধুর পৌষপার্বণের সুখস্মৃতির সমাবেশে তিলজাউ অত্যন্ত মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক হইয়া উঠে।

কিন্তু সকল বাড়ীতেই তিলজাউ না হইলেও, সকল গৃহস্থবধূই, আজ মধ্যাহ্নে 'মুঠে' ও 'সিদ্ধপুলি' লইয়া ব্যস্ত। ভিজে চাউলের গুঁড়াগুলি গরমজলে ভিজাইয়া তাহ গোল করিয়া দলা বাঁধিয়া জলে সিদ্ধ করিলেই 'মুঠে' প্রস্তুত হয়। অনেকে চাউল গুঁড়ার পুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে নারিকেলের ছাঁই বা ক্ষীর পুরিয়া 'মুঠে'র সংগে সিদ্ধ হয়। ইহাতে বেশী খরচ নাই। অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মুঠে ও সিদ্ধপুলি জলে সিদ্ধ না করিয়া দুধে সিদ্ধ করিয়া রসে ডুবাইয়া রাখিতেছেন। যাহারা রসের যোগাড় করিতে না পারে, তাহারা গুড় দিয়াই রসের অভাব পূর্ণ করে।

অপরাহ্নকালে প্রত্যেক বাড়ীতেই হুলাহুলি পড়িয়া গেল! চারি দিকেই আনন্দ, উৎসাহ, কলরব! সমস্ত পল্লী সজীব হইয়া উঠিল। বালিকা ও যুবতী-

গণ 'ঝিকি-মিকি' বেলা থাকিতে নদীতে গা ধুইয়া কলসী-কাঁকে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রাম্যপথ দিয়া বাড়ী আসিতেছেন, তাহার পর বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া ঘরে দ্বারে আলিপনা দিতে বসিয়া গিয়াছেন। আজ তুলসীতলা আলিপনা দিবার প্রধান স্থান। সকালে তুলসীতলাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিকানো হইয়াছিল ; এখন সেখানে আলিপনার কত রকম চিত্র বিচিত্র ছবি অঙ্কিত হইতে লাগিল ;— ঘর, বাড়ী, গোয়াল, গোলাবাড়ী, ঢেঁকিঘর, পুকুর, হাঁস, পদ্মফুল, মাছ, বুড়ো-বুড়ী ; গোলাবাড়ীতে সারি সারি গোলা, গোয়ালে সারি সারি গরু। এই সকল আঁকিয়া অঙ্কিত গোলাগুলির উপর ছোলা মটর, ধান, গম প্রভৃতি নানা রকম শস্য অল্প অল্প রাখিয়া পোয়াল দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। ছোট ছোট মেয়েরা গোবরের কতকগুলি 'নুড়ি' তৈয়ারী করিয়া তাহাদের মাথায় সিন্দুর লাগাইয়া তাহাতে দুই তিন গাছা দুর্বাঘাস বসাইয়া বারকোস সাজাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিল ; তাহার পর রান্নাঘরে পিঠে পুলি গড়ান দেখিবার জন্য মা, দিদিমা, কাকীমাদের কাছে গিয়া বসিল।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থগণের বাড়ীতে আজ পৌষপার্বণ উপলক্ষে মুগের ডালের পুলি, চিঁড়ার পুলি, আলুর পুলি প্রভৃতি নানারকমের পুলি, আঁদোশা, গোকুল পিঠে, সরুচাকলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে ; কিন্তু দিনের বেলা যেমন মুঠে ও সিদ্ধ পুলি সর্বসাধারণ গৃহস্থের অবশ্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, 'পিঠে' প্রত্যেক গৃহস্থের সেইরূপ রাত্রের খাদ্য। গৃহস্থরমণীরা উননের সম্মুখে মৃৎপ্রদীপের নিকটে বসিয়া পিঠে ভাজিতেছেন, দিনের বেলা বাজার হইতে যে 'সরা' ও 'মুচি' আনান হইয়াছে, তাঁহারা সেই সরাখানি উননের উপর রাখিয়া বোঁটাসমেত একটা বেগুনের পশ্চাতের অংশ তৈলপাত্রে ডুবাইয়া তাহা দিয়া মধ্যে মধ্যে সরায় তেলের 'পোঁচড়া' দিতেছেন, আর একটা বাটিতে করিয়া ঘন চাউলের গোলা তুলিয়া সরায় ঢালিয়া 'মুচি' দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেছেন ; 'ছ্যাঁক্‌ছুঁক্' করিয়া শব্দ হইতেছে, আর ছেলেমেয়েরা আনন্দে হাততালি দিয়া বলিতেছে,—

"উননে পিঠে ফোলে,
'কাণ্টা'য় শিয়াল ফোলে।"

পিঠে গড়ান শেষ হইলে একখানি পিঠে আস্তাকুড়ে শৃগালের জন্য ফেলিয়া রাখা হইল, আর একখানি উননের পাড়ে অগ্নিদেবের জন্য সরা সমেত রক্ষিত হইল। ছেলেমেয়েরা সানন্দে দুধগুড় দিয়া পিঠে খাইতে লাগিল। রমণীগণ ভাঁড়ারঘরের দ্রব্যপূর্ণ হাঁড়ি, কলসী, খোলা হাঁড়ি, ঝাঁঝরি প্রভৃতিতে 'বাঁউড়ি' বাঁধিতে লাগিলেন। অল্প 'পোয়াল' লইয়া হাঁড়ি কলসীগুলিকে বেষ্টন করিয়া রাখাকে 'বাঁউড়ি' বাঁধা বলে ; গৃহস্থরমণীদের পক্ষে ইহা একটা ভারি লক্ষণের কাজ। 'বাঁউড়ি' বাঁধিবার উদ্দেশ্য কি, ঠিক বলা যায় না, তবে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের মতে পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস, আজ পৌষ মাসের শেষ দিন, এইরূপে

পোয়াল বাঁধিয়া লক্ষ্মীকে ঘরে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে।

ইতিপূর্বে যে সিন্দূরচর্চিত দূর্বাদলমুকুটিত গোবরের নুড়ির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি ও কতকগুলি চাউলের গুঁড়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া আহারাদির পর সকলে শয়ন করিতে চলিলেন।

কিন্তু রাত্রি তিনটার পূর্বেই আবার পল্লীরমণীগণ জাগিয়া উঠিলেন। পৌষ-সংক্রান্তির শেষ রাত্রে সেই দুরন্ত শীতে, রমণীগণ, এমন কি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত গায়ে কাপড় জড়াইয়া পৌষ 'আগলাইতে' আরম্ভ করিলেন। প্রথমে একজন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল, দুই একটি কোমল কণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে সমগ্র পল্লীর সমস্ত পরিবার জাগিয়া উঠিল। একজন মাটীর প্রদীপ লইয়া আগে আগে চলিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে একটি বধূ বাড়ীর ভিতরের উঠানে, বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে নানা স্থানে অল্প অল্প চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছেন ; আর একজন পূর্বোক্ত গোবরের নুড়ি সেই চাউল-গুঁড়ার উপর বসাইয়া দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলিতেছেন,—

এস পৌষ, যেও না,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ, যেও না।"

অল্পক্ষণ পরেই পাশের বাড়ী হইতে শব্দ উঠিল,—

"লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না,
পোয়ালগাদায় থাক পৌষ, যেও না।"

বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে পূর্ণ, আম্রকানন ও বাঁশ-বনে পরি-বেষ্টিত, নৈশ অন্ধকারে মগ্ন পল্লীখানি দেখিতে দেখিতে বামাকণ্ঠের মধুর গুঞ্জনে মধুকর-মুখরিত মধুচক্রের ন্যায় শব্দ-সমাকুল হইয়া উঠিল। পৌষমাস তাহার সমস্ত আনন্দ, সুখ ও উপভোগের মধুর স্মৃতি বক্ষে লইয়া স্বীয় অবসানের এই পূর্ব মুহূর্তে রমণীগণের কৃতজ্ঞহৃদয়ে নিজের যে সজীব দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ধনধান্যদাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিণী সেই দেবীর উদ্বোধনের জন্য পল্লী-রমণীগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সমস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—

"এসো পৌষ, যেও না,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ, যেও না,
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না,
পোয়ালগাদায় থাক পৌষ, যেও না,
পৌষ মাস, লক্ষ্মীমাস, যেও না।"

কিন্তু তাঁহাদের মধুর কণ্ঠের সেই সাগ্রহ আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও পৌষ মাস এক দণ্ডও অপেক্ষা করিতে পারিল না ; নৈশবায়ুর অতি শীতল নিশ্বাস ফেলিয়া, বর্তমানের আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু পাথেয়স্বরূপ সঙ্গে লইয়া, অতীতের অনন্ত রহস্যান্ধকারে মিশিবার জন্য সে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল!

আকাশে নক্ষত্রের দল ক্রমে বিরল ও দীপ্তিহীন হইয়া আসিল, পূর্বগগন পান্ডুর বর্ণ ধারণ করিল, এবং আলোকান্ধকারের সেই মধুর মিলন দেখিবার জন্যই বুঝি একটি অতি উজ্জ্বল তারকা পূর্বাকাশের ঊর্ধ্বদেশ হইতে স্থির-দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন উৎসবের দীপ নির্বাণ করিয়া রমণীগণ আবার ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করিলেন ; যেন কোনও ঐন্দ্রজালিকের মায়াদন্ডস্পর্শে মর্মরধ্বনিমুখরিত উৎসবাকুল সুপ্তিহীন চঞ্চল পল্লী মুহূর্তমধ্যে নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

উত্তরায়ণ মেলা

১লা মাঘ সূর্যদেব উত্তরায়ণপথে গতিপরিবর্তন করেন। সেই দিনের স্মরণার্থ ত্রিহট্টে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ত্রিহট্ট একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, আমাদের গ্রামের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটি থানা ও একটা ছোট ডাকঘর আছে। পল্লী-গ্রামের 'ভিলেজ' পোষ্টমাষ্টারদের আর একটা ছোট রকমের চাকরী করিবার অধিকার আছে,—তাঁহারা পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরিও করিয়া থাকেন ; ডাকঘর ও পাঠশালা একই স্থলে অবস্থিত, সুতরাং গ্রাম্য ডাকমুন্সীর পক্ষে এই দুই কাজ এক সঙ্গে নির্বাহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। ডাকমুন্সী এই পল্লীগ্রামের একজন হাকিম ; আর একজন হাকিম এখানকার থানার দারোগা।

ত্রিহট্ট গ্রামখানি ছোট হইলেও সুন্দর। ইহার পশ্চিম ধারে খড়িয়া নদী প্রবাহিত ; মাঘ মাসে নদীতে অধিক জল থাকে না, উপরে উঁচু পাড়, উভয় তীরে প্রকাণ্ড বালির চর। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ, তিন দিকে প্রশস্ত ক্ষেত্র, নানাবিধ শস্য পরিপূর্ণ ; যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু শস্যশীর্ষ ধরণীর বিচিত্র বস্ত্রা-ঞ্চলের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে ; মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি। ধনীর অট্টালিকা এক-খানিও নাই, অধিকাংশই দরিদ্রের পর্ণকুটীর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 'চৌরী' ; আটচালা ঘরও দুই চারিখানি আছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটা গোলাবাড়ী. আঙ্গিনাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এক পাশে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা কাছারী, তাহারই দুই পাশে ছোট বড় সারি সারি গোলা বসান ;—গোলাকার মৃত্তিকাস্তূপের উপর মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর এই সকল গোলা সংস্থাপিত হইয়াছে। চাটাই ও 'কাবারি' দিয়া এই সকল গোলা দৃঢ়রূপে অতি সুকৌশলে নির্মিত, ভিতরের দিকটা মাটী ও গোবর দিয়া ভাল করিয়া লেপা, উপরে খড়ের চাল, চালের চূড়ায়

একটা উঁচু ঝুঁট, অনেকেই মাটীর পোড়ান গামলা উলটাইয়া সেই ঝুঁট ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গোলায় ধান, গম, মসিনা, শর্ষপ প্রভৃতি শস্য বোঝাই ; পাছে চোরে চুরি করে, এই ভয়ে মহাজনদের গোমস্তারা তাহার অতিসংকীর্ণ কাঠের দ্বারে চাবি লাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। দরকার পড়িলে চাবি খুলিয়া শস্য বাহির করে ; কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করা কঠিন, তাহারা চাল ছেঁদা করিয়া গোলার শস্য নষ্ট করে, এবং এক পাল বেজী নিঃশঙ্কচিত্তে গোলার নীচে আসিয়া কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া লয়।

অনেক গৃহস্থের বাড়ী মাটীর দেওয়ালে পরিবেষ্টিত, কিন্তু গোবরের 'চাপড়ী'তে এই সকল দেওয়াল একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে ; প্রাচীরের চালে শিম-গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের সাদা ও বেগুনে রঙের ফুল সবুজ পাতার মধ্য হইতে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বাড়ীর পাশ দিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ ; সেই রাস্তার এক পাশে বাঁশ-ঝাড়, জঙ্গলপরিবৃত গর্ত,—উননের ছাই ও বাঁশের পাতাতে গর্ত পরিপূর্ণপ্রায় ; সরু পথের অপর দিকে জামালকোটার গাছে ঘেরা বেড়, বেড়ের ধারে ধারে দুই পাঁচটা দীর্ঘ সজিনা গাছ, পাতা প্রায় দেখা যায় না, সমস্ত শাখা সাদা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, এবং ফুলভারে ডালগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছে ; এই ফুল পল্লীবাসীর অতি মনোরম তরকারী ; ইলিশ মাছের সহ-যোগে ইহার চচ্চড়ি এমন সুস্বাদ হয় যে, অরুচির পক্ষে তাহা পরম রুচিকর, কিন্তু কোন ডাক্তারই ভরসা করিয়া কোন অরুচিগ্রস্ত রোগীকে এই পথ্যের ব্যবস্থা দেন না! মটরের ডালের বড়ি দিয়া সজিনা ফুলের যে অম্বল হয়, তাহার আস্বাদন পল্লীবাসিগণ সারা বছর ভুলিতে পারে না ; সজিনা ফুলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মধু থাকে, এই মধু অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া অম্লমধুর স্বাদ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ, এই সময় গাছে গাছে তেঁতুল পাকিতে আরম্ভ হয়, সেই পরিপুষ্ট পক্বপ্রায় তেঁতুলের অম্লরস তেমন দুঃসহ তীব্র নহে, তাহার মধ্যেও একটু মিষ্টতা আছে। কিন্তু আজ কয় বৎসর এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়া এই অম্বলের রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে ; তেঁতুল পাড়াইয়া কেহ যে মনের মত করিয়া অম্বল রাঁধিয়া খাইবে, সে যো নাই ; এমন কি, টোপাকুলগুলি গাছে পাকিয়া পাকিয়া অভিমানে লাল হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুচিগ্রস্তা গুর্বিণীদের লালা-সংবরণ করা দুরূহ হইতেছে ; কিন্তু হায়, নিরু-পায় ; সরকার বাহাদুর ডাকঘরে এক পয়সায় আড়াই রতি কুইনাইন পাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। মন্দ লোকে বলে, গয়ারাম ডাকমুন্সী কুইনাইন-বিক্রয়ের কমিশনে বাড়ীতে দালান দিয়া ফেলিল! 'কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্বনাশ'।—কিন্তু লোকের জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। সেকালেও কাঁচা তেঁতুল ছিল, গাছভরা কুল ছিল, ইলিশমাছ ও কলায়ের ডাল ছিল, কিন্তু কুইনাইন ছিল না ; কেহ ম্যালেরিয়ার নামও জানিত না। সেকালে কদাচিৎ কাহারও জ্বর হইলে

'ধাউত' গরম হইয়াছে বলিয়া রোগী বেশী করিয়া সরিষার তেল মাখিয়া নদীতে গোটাকতক ডুব দিয়া আসিত, তাহর পর বাসি মাছের ঝোল ও গোঁড়া লেবু দিয়া এক পেট পান্ত ভাত খাইয়া জ্বর তাড়াইত ; কেহ বা মিছরীর সরবৎ ও ডাব খাইয়া 'শৈত্যক' করিত ; যদি নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখিত ত কবিরাজ ডাকাইত, কবিরাজ-মহাশয় নগদ আট গণ্ডা পয়সা দর্শনী লইয়া চাদরের খুঁট হইতে 'লৌহান্তক' চূর্ণ বাহির করিয়া তাহাই সেবনের ব্যবস্থা দিতেন, এবং যত দিন রোগী আরাম না হইত, তত দিন দুই বেলা আসিয়া নাড়ী টিপিয়া যাইতেন, ব্যারাম সারিলে আর কিছু দিলেই চলিত। কিন্তু একালে সকলই আশ্চর্য ! পাড়াগাঁয়ের দোকানে দোকানে সাবু ও বার্লি বিক্রয় হইতেছে। সকালে উঠিয়াই যে ব্যক্তি দু' রতি কুইনাইন না খায়, তাহার সে দিনের মত জ্বরভীতি লাগিয়া থাকে। প্লীহার আবির্ভাবে উদরটি ঢক্কাকার, তাহার উপর ব্লিষ্টারের পদাঙ্কলেখা, শরীর ক্ষীণ, রক্তশূন্য, হাত পায়ের নলা সরু, এবং মস্তক কেশবিরল ; গ্রামের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এই রকম।

কিন্তু গ্রামের এ রকম অবস্থা সত্ত্বেও উত্তরায়ণের মেলা বন্ধ থাকিবার যো নাই। এ বহুদিনের মেলা, অনেক দেশ বিদেশ হইতে দোকানী পসারী আসিয়া এ মেলায় খরিদ বিক্রয় করে। পাঁচ সাত ক্রোশ দূরের লোক সংবৎসর হইতে আশা করিয়া থাকে,—উৎরুণি'র মেলায় জুতা কিনিবে। এখানে মেলার সময় যে হাঁড়ি বিক্রয় করিতে আসে, তাহা খুব 'বয়' বলিয়া অনেক দূরবর্তী গ্রামের বৃদ্ধাগণও মেলার সুযোগের প্রতীক্ষা করে ; 'বার্ণিয়ার' হাঁড়ির প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ! এ মেলা কি কখন বন্ধ থাকিতে পারে ? বিশেষতঃ, এ মেলা বন্ধ থাকিলে কৃষ্ণরায়ের অপমান করা হয়। কৃষ্ণরায় ত্রিহট্টের গ্রাম্যদেবতা ; এমন জাগ্রত দেবতা সচরাচর দেখা যায় না। মেলার সময় ঘটা করিয়া তাঁহার পূজা হয়। কাহারও কাহারও মতে এই মেলা কৃষ্ণরায়ের জন্মোৎসব। সকলের বিশ্বাস, যত দিন কৃষ্ণরায় আছেন, তত দিন পর্যন্ত এখানে মেলা বসিবে।

কৃষ্ণরায় শুধু যে জাগ্রত দেবতা, তাহা নহে ; এ অঞ্চলের মধ্যে তিনি প্রধান দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রিহট্টের চারিদিকে আট দশ ক্রোশের মধ্যে কাহারও কিছু কামনা থাকিলে কৃষ্ণরায়কে মানিলেই অবিলম্বে সে কামনা সফল হয় ! কাহারও গরুর প্রথম 'বিয়েনে' ভাল দুধ হইল না। গৃহকর্তা মানিল, "দোহাই কৃষ্ণরায়, ফিরে বিয়েনে যেন আমার গরুর বেশী দুধ হয়, আমি সেই দুধ দিয়ে তোমার পূজো দেব।" কাহারও বাড়ীতে প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ হইয়াছে, কিন্তু ফলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, যে দুই পাঁচটা 'মুচি' পড়ে, তাহা পচিয়া যায় ; গৃহস্থ মনে মনে মানিল, "এবার কাঁঠাল হ'লে সকলের বড় কাঁঠালটি কৃষ্ণরায়ের জন্য পাঠাব ; হে ঠাকুর, এবার আমাকে গাছভরা কাঁঠাল দাও।" এইরূপে আম কাঁঠাল ডাব হইতে আরম্ভ করিয়া আতা পেয়ারা ডালিম, এমন কি, লাউ কুমড়ো পর্যন্ত কোন ফলই কৃষ্ণরায়ের 'মানত্' না হইয়া যায় না। যাহার যে জিনিস মানত্

থাকে, সাময়িক হইলে সে সেই সকল জিনিস লইয়া ১লা মাঘ কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে উপস্থিত হয়। যদিও কয়েক দিন পূর্ব হইতেই মেলার দোকানপাটের আমদানী হয়, কিন্তু ১লা মাঘই প্রকৃতপক্ষে মেলা বসে। এই মেলা দশ বার দিন পর্যন্ত থাকে ; তাহার পর ভাঙ্গা মেলা দুই এক দিনের বেশী থাকে না। কিন্তু এই সময়ই লোকের ভিড় বেশী হয় ; কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, দোকানী পসারী দোকানপাট তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় ভাঙ্গা মেলায় কিছু সস্তা দরে জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, উত্তরায়ণ মেলার সময় আমাদের পল্লী অঞ্চলে ভারি একটা আনন্দকল্লোল উত্থিত হয়।

অনেক স্কুল পাঠশালের ছেলে পড়া কামাই করিয়া দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে ছোটে, এবং গ্রাম্য যুবকেরা সারা বৎসরের ব্যবহারোপযোগী জুতা কিনিবার জন্য ধোপদস্ত কাপড়, ইস্ত্রী-করা কামিজ, কোট ও তাহার উপর দোলাই বা র‍্যাপারে সজ্জিত হইয়া, কেহ ছাতি কেহ ছড়ি লইয়া, দলে দলে পারঘাটার খেয়া নৌকায় পার হইয়া ত্রিহট্ট যাইতেছে। বৃদ্ধারা পর্যন্ত 'হাঁড়ি' কিনিতে যাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। এই সকল কারণে আমরা কয় বন্ধুতে একবার ত্রিহট্টে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম। অবশেষে একদিন গৃহত্যাগের সুবিধা পাওয়া গেল।

৩০এ পৌষ সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া 'জিরেন কাটের' সুমিষ্ট খেজুর-রস পান করিতে করিতে স্থির করা গেল, আগামী কল্য রাত্রি থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। পৌষ পার্বণের হর্ষকোলাহল তখনও প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এবং খর্জুররসের সঙ্গে পৌষের প্রবল শীত আমাদের বুকের মধ্যে কম্প উপস্থিত করিতেছিল। আমরা স্থূল শীতবস্ত্রে সর্ব শরীর আবৃত করিয়া দেশভ্রমণের এক মোহকর স্বপ্নে মুগ্ধ হইতেছিলাম। শুধু বোধ হইতেছিল, আমরা কয়টি বন্ধু যেন এই বিশ্বসংসারের রঙ্গমঞ্চে কোন বিচিত্র অভিনয়ের দর্শকমাত্র। ঠাকুরমার গল্পের নায়ক সেকালের রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্র, এই চারি বন্ধুতে যেমন একত্র মিলিয়া কোনও এক স্বপ্নদৃষ্ট আকাশসম্ভব রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, আমাদেরও মনে হইতে লাগিল, আমরাও যেন রাত্রিপ্রভাতে সেইরূপ কোনও অনুদ্দিষ্টা কল্পনাসুন্দরীর আবিষ্কারের আশায় গৃহ ছাড়িয়া এক দূরবর্তী প্রবাসে প্রস্থান করিব ;—সেখানে সকলই অজানিত, বিচিত্র, রহস্যপূর্ণ।—অথচ ত্রিহট্ট আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশের বেশী নয় !

বাল্যকালে ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে। আমরা এ পর্যন্ত কখনও গ্রামের বাহিরে পদার্পণ করি নাই, এবং বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কখনও পরিচয় হয় নাই। চারি দিকের বন্ধন যেখানে যত নিবিড়, স্বাধীনতার আলোক ও হিল্লোল সেখানে তত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং রাত্রে শুইয়া শুইয়া শুধু

মনে হইতে লাগিল, ঊষাকালে আমাদের জীবনেও একটি অভিনব ঊষালোক ফুটিয়া উঠিবে ; তাই নিদ্রাবস্থাতেও গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, নূতন নূতন শস্য-ক্ষেত্র, অগণ্য অপরিচিত লোকের মুখ,—সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড মেলার আশ্চর্য দৃশ্যের অপরূপ কল্পনা, বুকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহকম্পন জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। আধ ঘুমে আধ জাগরণে শীতের দীর্ঘ রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে রাত্রিশেষে যখন বন্ধুত্রয় জানালার কাছে আসিয়া উৎসাহভরে আমার নাম ধরিয়া ডাক দিল, তখন আমি লাফাইয়া উঠিলাম।

শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া বন্ধুত্রয়ের সঙ্গে ত্রস্তপদে যখন আমরা গ্রাম্যপথে বাহির হইলাম, তখন পূর্বদিক ঈষৎ লোহিতাভ হইয়াছে মাত্র। সেই লোহিতাভার নীচে বহু দূরে অসংখ্য বৃহৎ বৃক্ষের শ্রেণী কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া দূরবর্তী পর্বতমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। পূর্বগগনের অনেক ঊর্ধ্বে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি অতি উজ্জ্বল বৃহৎ নক্ষত্র ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ পাণ্ডুর চন্দ্রকলা পশ্চিমগগনপ্রান্ত হইতে অতি ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। রাত্রি অবসানপ্রায়, সুতরাং নক্ষত্রবিরল আকাশে সুদূর ব্যবধানে যদিও দুই চারিটি তারকা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তাহারা ম্লান, দীপ্তিহীন ; যেন তাহাদের দীর্ঘজাগরণক্লান্ত চক্ষু তন্দ্রাভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, এবং আর একটু পরেই তাহারা ঊষার আলোকলেখালাঞ্ছিত নীল-বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে !

পথের দুই ধারে খর্জুরকুঞ্জ। ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য খেজুর গাছ সোজা দাঁড়াইয়া আছে, ক্বচিৎ দুই একটা হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের গলদেশে ঠিলি বাঁধা, যাহাতে ঠিলিগুলা নড়িয়া চড়িয়া না যায়, এ জন্য গাছীরা খেজুরের 'ডেগ্ড়ো' টানিয়া তদ্দ্বারা ঠিলিগুলি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গাছগুলির আগাগোড়া রসলিপ্ত 'গাছী'দের বঙ্কিম তীক্ষ্ণাস্ত্রের ক্ষতচিহ্নে পূর্ণ, ক্ষতস্থান শুকাইয়া বহুদিনের রৌদ্রে ফাটিয়া গিয়াছে ; প্রত্যেক গাছে এই রকম কুড়ি পঁচিশটা ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে,—কুড়ি পঁচিশ বৎসরের অতীত ইতিহাস তাহাদের সহিত সন্নিবদ্ধ, সে সকল স্থান শুকাইয়া কালো কাঠে পরিণত হইয়াছে, এবং শীতকালের দীর্ঘ রাত্রিতে কখনও যে সেখান হইতে অবিরলধারায় স্নিগ্ধ মধুর রস উৎসারিত হইত, প্রভাতকালে শালিক, বুলবুল, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর দল যে তাহাদের রসসিক্ত 'নলি'র মুখে বসিয়া আকণ্ঠ রসপানপূর্বক তৃপ্তমনে গান করিতে করিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া যাইত, রাখালেরা খোলা মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া বাঁশের লম্বা লম্বা চোঙ্গা টাঙ্গাইয়া সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত ফেনময় রস সংগ্রহ করিত,—সে কথা এই সকল শুষ্ক চিহ্ন দেখিয়া কোনও মতে বিশ্বাস করা যায় না।

বৃক্ষরাজিবেষ্টিত গ্রাম্যপথ ছাড়িয়া আমরা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন বাজারের সমস্ত দোকান ঝাঁপে সর্বশরীর আবৃত করিয়া সুপ্তিমগ্ন। শুধু

অদূরবর্তী মস্‌জিদে সমাগত মুসলমান উপাসকবর্গের সমবেত কণ্ঠস্বর হইতে আজানের যে গম্ভীর গাথা উত্থিত হইতেছিল, তাহাই চারি দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও সূর্য উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। নদীতীরে বহুকালের প্রাচীন এক শিব-মন্দিরে প্রাভাতিক শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান ; এক সময়ে তাহা জনৈক বিলাসী জমীদারের বিলাসকানন ছিল, এখন তাহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু এখনও সেখানে নানারকম ফুল ফুটিয়া থাকে। দেখিলাম, সেই প্রভাতে মুণ্ডিতমস্তক দাড়ি-গোঁফ-বর্জিত নামাবলীতে আচ্ছাদিতদেহ বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় বামহস্তে একটি ফুলের সাজি ও দক্ষিণহস্তে একখানি অনতি-দীর্ঘ 'নগি' লইয়া পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। একটা বকফুলের গাছে একটু উঁচুতে থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছিল ; বাচস্পতি গম্ভীর স্বরে সুর করিয়া স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে সাজিটি জাফ্রির বেড়ার উপর রাখিয়া, বকফুলের একটা থোকায় 'নগা'খানা বাধাইয়া দিলেন ; আমাদের একটি বন্ধু কৌতুকভরে বলিল, "কি দাদাঠাকুর ! গাছে উঠে না পাড়লে পড়া ফুলে কি পূজা হয় ?" দাদাঠাকুর এত সকালে আমাদিগকে এ রকম স্থানে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তাহার পর শ্যালক সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, "তোদের এখন রক্তের জোর আছে, গাছে উঠ্‌তে পারিস, আমি বুড়ো মানুষ, সে ক্ষমতা নেই—তাই ব'লে কি মা সিদ্ধেশ্বরী আমার ফুল নেবেন না ? যা হোক্‌, তোরা এত সকালে যাচ্ছিস্‌ কোথা ?" আমরা উত্তর দিলাম, "ত্রিহট্টে মেলা দেখতে।"

আজ ১লা মাঘ। অনেকেই মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীর জন্য ভাবনা নাই। নফর মাঝি পয়সার লোভে এই দারুণ শীতে শেষরাত্রি হইতে সর্ব-শরীরে কাঁথা জড়াইয়া নৌকা ঠেলিবার 'নগা'গাছটা হাতে লইয়া বসিয়া আছে ; নিকটে একটা মোটা পোয়ালের 'বুঁদি'তে আগুন রহিয়াছে, এবং তাহার সাহায্যে মধ্যে মধ্যে তামাক খাওয়া হইতেছে। প্রত্যেক লোকের কাছে সে এক পয়সা হিসাবে পারাণী আদায় করিতেছে ! আমাদের পয়সা দিতে হইল না ; কারণ, গ্রামের লোককে পার হইবার সময় পারাণী দিতে হয় না ; মাঝি প্রত্যেক গৃহস্থের কাছে পূজার সময় বকশিস্‌ লয় ; তাহা ভিন্ন বিবাহ কিংবা অন্য কোনও উৎসব-উপলক্ষে পয়সা-কড়ি, চাল, ডাল প্রভৃতি সিধা ও জলপান পায়, এবং পূজার সময় ধুতি চাদর ও নারিকেলও অনেক বাড়ীতে বরাদ্দ আছে।

নদী পার হইয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলাম। শিবমন্দিরের উচ্চ চূড়া প্রভাতসূর্যের কনককান্তিতে উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ; কত মাঠ, কত শিশির-সিক্ত 'আইরি' বন, দীর্ঘশীর্ষ গোধূমের ক্ষেত্র, আম কাঁঠালের বাগান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিয়া বেলা আট্‌টার পর ত্রিহট্টে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ত্রিহট্টের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, বালক-বালিকা পর্যন্ত

উৎসাহের সহিত মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সকলেই মূল্যবান রঙ-বেরঙের বস্ত্রে সুসজ্জিত, অনেকে জানুর উপর কাপড় তুলিয়া কোমরে চাদর বাঁধিয়া কাঁধে লাঠি লইয়া চলিয়াছে ; পথের ধূলিতে তাহাদিগের জানু পর্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। এক দল মুসলমান রমণী চিত্র বিচিত্র কাপড় পরিয়া এক বর্ষীয়সী রমণীর অনুগমন করিতেছে ;—কাহারও পায়ে বাঁকমল, কপালে উল্‌কী, সিঁথিতে সিন্দূরের স্থূল রেখা, কেশরাশি মোটা দড়ির গোছা দিয়া মাথার উপরে উঁচু করিয়া বাঁধা ; কাহারও নাকে প্রকাণ্ড এক নথ, কানে পাশা ; কাহারও নাকে নাক-ছাবি, হাতে রূপার অতিবিস্তীর্ণ খাড়ু। চাষার ছেলেরা দল বাঁধিয়া কখন দ্রুত, কখন মন্থর গতিতে চলিয়াছে ; কেহ হুঁকা টানিতে টানিতে যাইতেছে, কেহ হুঁকার অভাবে নিকটবর্তী কলা-বাগান হইতে একটা কলার 'ডেগড়ো' কাটিয়া হুঁকার অভাব মোচন করিতেছে ; মাথায় চেরা সিঁথি, দীর্ঘ চুলগুলি কাঁকুই দিয়া আঁচড়াইয়া ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিয়াছে, দ্রুতপদসঞ্চালনে 'বাব্‌রিকাটা' কেশগুচ্ছ নাচিয়া উঠিতেছে।

মাঠের মধ্যে কৃষ্ণরায়ের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটি অনেক কালের, তাহার চারিদিকে প্রশস্ত প্রাচীর, অনেক স্থান জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দ্বার-প্রান্তে একটি অতি বৃহৎ তমালগাছ। তুলসীগাছও যথেষ্ট আছে।

কৃষ্ণরায়ের সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। প্রস্তরনির্মিত দেহ অতি মসৃণ, এবং সুকৌশলে চিত্রিত। মস্তকের শিখিপুচ্ছশোভিত মোহনচূড়া ও হাতের বাঁশী সোনা দিয়া বাঁধান, পরিধানে পীতাম্বর, করতল ও পদারবিন্দ হিঙ্গুলরাগরঞ্জিত, প্রশান্ত চক্ষে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাঁকাভাবটুকু দূর হয় নাই ; মুখের ভাব অতি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ, দেখিলে এই প্রতিমার চিত্রকরকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না ;—যে ব্যক্তি এই প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছে, সে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ, ভক্তি ও সৌন্দর্যানুভূতি একত্র সঞ্চিত করিয়া এই প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে একটা মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বৃদ্ধ পুরোহিত, তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র—কৃষ্ণরায়ের প্রণামী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত এই মেলা থাকিবে। এ কয়েক দিন পূজার কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই, যে যখন পূজা দিতে আসিতেছে, পুরোহিত তখনই পূজায় বসিতেছেন। পূজা শেষ হইলে উপাসকমণ্ডলী সাষ্টাঙ্গে দেবচরণে প্রণাম করি-তেছে, পুরোহিত তাহাদিগের গলায় কলার 'ছোত্‌ড়া'য় গাঁথা পুষ্পবিরল এক গাছি মালা পরাইয়া দিতেছেন ; তাহারা দেবতার যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে। উপহার দ্রব্যের সীমা নাই, শত শত লোক 'খাবরে', 'ভাঁড়' ও ঘটিতে করিয়া দুধ লইয়া গিয়াছে, সেই দুধে বড় বড় জালা ভরিয়া উঠিয়াছে। এক এক দিন কৃষ্ণরায় দুধ ও গঙ্গাজলে স্নান করেন। নারিকেল, ইঁচড়, পেঁপে, বেল, পেয়ারা, ডালিম, এমন কি শিম, বেগুন, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরকারীও পর্যাপ্তপরিমাণে জমা হইয়াছে—যাহার গাছের যে ফলটি ভাল ও বড়,

যে যে জিনিসটি কৃষ্ণরায়ের নামে রাখিয়াছে, এখন সেইটিই তাঁহাকে আনিয়া দিতেছে ; এত সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট ফল কখনও বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায় না। বিভিন্নজাতীয় এত রকম ফলের আমদানী দেখিয়া এই উৎসবকে কাহারও কাহারও কৃষিপ্রদর্শনী বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। এই মেলায় কয় দিন পুরোহিতেরা যে দক্ষিণা পান, এবং ঠাকুরকে যে সকল জিনিস উপহার দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদের সংবৎসরের খরচের পক্ষে যথেষ্ট।

কৃষ্ণরায় কত দিনের প্রতিমা, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সম্পত্তি ; যাহাতে সংবৎসর বিগ্রহের সেবা চলিতে পারে, সে জন্য কৃষ্ণনগরের রাজসরকার হইতে দেবত্র সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণরায় সমস্ত বৎসর এখানেই বাস করেন, কেবল বৎসর বৎসর 'বারো দোলে'র সময় অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় তাঁহাকেও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে লইয়া যাওয়া হয় ; সেখানে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া পুরোহিতরূপী বাহকদিগের স্কন্ধে তিনি আবার স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

শুনা যায়, পূর্বকালে এই অঞ্চলের এক জন লোক নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার ফলে সে নারায়ণের প্রস্তরমূর্তি মাটীর নীচে প্রোথিত আছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পায় ; অনন্তর এই মূর্তি তুলিয়া তাহা উপযুক্ত চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে।

কৃষ্ণরায় এখন ঠাকুরাণীহীন ; সাধারণ কথায় যাহাকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে, তাহাই। কিন্তু লক্ষ্মীহীন হইয়াও তিনি স্বমহিমায় নিত্যভাবে বিরাজিত ; তাঁহার ঠাকুরাণীটি অনেক দিন হইল, গত হইয়াছেন। বহুকাল পূর্বে একবার কৃষ্ণরায়ের মন্দিরদ্বার ভাঙিয়া চোরে ঠাকুরাণীর অঙ্গ হইতে অলংকারগুলি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল তস্কর হিন্দু নহে, মুসলমান, সুতরাং প্রভুর এলাকার বাহিরে ; তিনি তাহাদিগকে কোনও শাস্তি দিতে পারিলেন না !—কিন্তু পুরুষের রাগ কোথায় যাইবে ? 'চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া' শুধু হিন্দুর পক্ষে খাটে না, হিন্দুর দেবতার নিকটও এ কথাটা সংগত ! মুসলমানেরা ঠাকুরাণীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অপবিত্রজ্ঞানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরাণী মনোদুঃখে তদবধি মন্দিরের অদূরবর্তী দীঘিতে আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই ; পাত্রীর অভাবে অথবা সেবাইতের অমনোযোগে, ঠিক বলা যায় না !

মন্দিরের সন্নিকটেই মেলা বসিয়াছে। দুই ধারে সারি সারি অনেক দোকান, মধ্যে সরু রাস্তা ; এক এক রকম জিনিসের দোকান এক এক দিক অধিকার করিয়াছে। দোকানগুলি অস্থায়িভাবে নির্মিত, কিন্তু তাহা হইলেও, যাহাতে মাঘের হিমে দোকানদারগণ কোনও কষ্ট না পায়, তাহার বন্দোবস্ত আছে। মণিহারী জিনিসের দোকানই বেশী, তাহাতে নূতন পঞ্জিকা হইতে রামরাজা-মার্কা তাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতির ছবি, নানারকম

কাচের জিনিস, খেলনা, কাঠের ও টিনের হাতবাক্স, লোহার কড়াই, হাতা বেড়ি, খাঁচা, এমন কি রঙ-বেরঙের কম্ফর্টার, ছেলেদের উলের টুপি, মোজা, দেশলায়ের বাক্স,—কিছুরই অভাব নাই। যাত্রীরা দোকানের সম্মুখে অনেকে একত্র দাঁড়াইয়া নিজের পছন্দমত জিনিস দর করিতেছে ; বৃদ্ধারা ছোট ছোট নাতি-নাতিনীদিগের জন্য কাঠের ঘোড়া, মানুষ, মাটীর ছোট ছোট পুতুল কিনিতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

মণিহারী দোকানের পর নানারকমের দোকান। বাসনের দোকানে রাশি রাশি বাসন বিক্রয় হইতেছে ; বড় বড় ঘড়ার উপর 'পরাত' থালা প্রভৃতি রাখিয়া তাহাতে নানা রকম বাসন সাজান হইয়াছে ; একটা দোকানে পুরানো লণ্ঠন ও ভাঙ্গা পোর্ট-ম্যাণ্টো মেরামত হইতেছে। শুধু টিন ও কাচের কারখানা। দোকানদার কিরূপ কৌশলে কাচ কাটিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য অনেকে দোকানের চারিদিকে জমিয়া গিয়াছে।

একটা দোকানে শুধু বাঁশের বাঁশী ; ছেলেরা বাঁশী পছন্দ করিতেছে ; সেখান হইতে শুধু চোঁ বোঁ পোঁ শব্দ উঠিতেছে, দোকানদার একটা বাঁশী আড় করিয়া ধরিয়া তাহার ছয়টা ছিদ্রে দ্রুত অঙ্গুলি-বিক্ষেপ করিয়া গ্রীবাভঙ্গীপূর্বক ক্রমাগত বাজাইয়া যাইতেছে ; তাহার গলার শিরা ফুলিয়া উঠিতেছে, দম আটকাইবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু বিরাম নাই। বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া অনেক কৃষিকর্মনিরত কৃষকযুবকও বাঁশী কিনিবার উমেদারিতে রাশীকৃত বাঁশী ওলট পালট করিতেছে, কিন্তু ঠিক মনের মতটি যুটিতেছে না। এ দিকে দোকানদারও ছাড়িবার পাত্র নহে ; ক্রেতার কোনটা পছন্দ না হইলেই, সে সেই বাঁশীটা হাতে লইয়া তাহা বাজাইয়া, দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, এমন বাঁশী আর নাই, এত উৎকৃষ্ট আওয়াজ এই একটিতেই সম্ভবে। স্ত্রীলোকদের দল ঘোমটা টানিয়া তফাৎ দিয়া সরিয়া যাইতেছে ; বৃন্দাবনে একটা বাঁশের বাঁশীতে অনেক দিন আগে একটা দারুণ অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাই এতগুলি বাঁশী একত্র দেখিলে মনে বুঝি বড় আতঙ্ক হয় ! ঠিক জানি না, এই অগণ্য যাত্রীদিগের মধ্যে বাঁশের বাঁশী শুনিয়া নূতন করিয়া কাহারও মনে উদিত হইয়াছিল কি না,—

"যে দেশে বাঁশীর ঘর, সে দেশে না যাব,
ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসা'ব।"

ময়রাপটীতে সারি সারি সন্দেশের দোকানগুলাতেও ক্রেতার সংখ্যা অল্প নয়। জুতাপটী একটু তফাতে। সেখানে নানারকমের জুতা বিক্রয় হইতেছে। 'নাগরা' জুতার খদ্দেরই অধিক। দুই তিনখানা 'বটতলার বহি'র দোকানে অনেক 'খুঁট-আখুরে' ক্রেতা জড় হইয়াছে ; কেহ 'এবার পূজায় বাঁচা ভার, বৌ চেয়েছে চন্দ্রহার', কেহ 'হায় রে মজার শনিবার' প্রভৃতি চটি বহির কদর্যরসিকতাপূর্ণ ছত্রগুলি বানান করিয়া পড়িতেছে, সর্বত্র ভাবগ্রহ হইতেছে না, কিন্তু তাহাতেই যে রস পাইতেছে, তাহা তাহাদের সন্তোষের পক্ষে অনেক অতিরিক্ত ; তাহা পড়িয়াই মুখবিবরে হাস্য আবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া

উঠিতেছে, এবং পুস্তকের মলাটে ছাপার অক্ষরে ছয় আনা দাম লেখা থাকিলেও, তাহা নগদ দুই পয়সা মূল্যে কিনিতে পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাভবান্ মনে করিতেছে।

একটু তফাতে একটা জায়গায় ছোট ছোট 'টোঙ্গা' তুলিয়া কয়েক জন বেদে খেলা দেখাইবার জন্য আড্ডা গাড়িয়াছে ; তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি ছোট বড় ঝুড়িতে নানারকমের সাপ, দুইটি বৃহৎ ছাগল, দুইটি বানর ও একটা ভালুক। ভালুকটির ঘণ্টায় তিন চারি বার জ্বর আসিতেছে, আর সে উবু হইয়া পড়িয়া কাঁপিতেছে। ছাগল দুটি কাঁঠালের পাতা খাইতেছে, এবং একটা বানর আর একটা বানরের হস্তে আপনার মস্তকটি সমর্পণ পূর্বক অতি সুস্থিরভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, দ্বিতীয় বানরটি তাহার সঙ্গীর মস্তকের উকুন বাছিতে অত্যন্ত ব্যস্ত ! চারি দিকের এই জনতা ও কলরবে তাহার কিছুমাত্র খেয়াল নাই। ইহার একটু দূরে একটা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কুটীরের সম্মুখে একটা বৃহৎ নিশান উড়িতেছে ; নিশানের নীচে একটা লাল-নীল রঙের পর্দার সম্মুখে একটা সাদা কাগজের সাইনবোর্ডে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে,—"অতি আশ্চর্জ্জ ভেল্‌কি ! ভানুমতীর হরেক রকম ভোজবাজি !! দর্শনি এক এক পয়সা !!!" এক জন লোক এই কুটীরদ্বারে বসিয়া একটা খোলা হারমোনিয়াম্ বাজাইতেছে, আর একটা লোক —গায়ে একটা গেঞ্জীফ্রক, গলায় নানা রঙের বাহারে কম্ফর্টার জড়ান—ষাঁড়ের মত মোটা গলায় বিদ্যাসুন্দরের একটা টপ্পা গাহিয়া রসপিপাসু কৌতূহলাক্রান্ত পল্লীযুবকদিগের বিক্ষিপ্ত চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। দলে দলে লোক দ্বারপ্রান্তে জমা হইতেছে, এবং সেখানে একটি পয়সা দর্শনী দিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশপূর্বক ভেল্‌কী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেরূপ ভাবখানা প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতে ভাল মন্দ কিছু বুঝা যাইতেছে না।

ক্রমে বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইল। যাত্রিদল কিছুক্ষণের জন্য স্নানাহারের চেষ্টায় চলিল। মেলার কাছে যে দীঘি আছে, তাহাতে বেশী জল নাই। সেই জানুপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া অনেকে স্নান করিতেছে, এবং চিঁড়াদৈয়ের ফলার ভিজাইয়া সে দীঘির পাড়ে বসিয়াই উহা দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেছে।

অনেকে গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী মধ্যাহ্নের মত আশ্রয় গ্রহণ করিল। দলে দলে লোক ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের হোটেলে বসিয়া তেল মাখিয়া তামাক টানিতে লাগিল। চন্ চন্ করিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্র 'পাড়িতেছে'। দূরে অনেকগুলি গরুর গাড়ী ; সেই সকল গাড়ীতে যাত্রীরা বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলা দেখিতে আসিয়াছে, গাড়োয়ানেরা অশ্বত্থ গাছের নীচে তিউড়ি কাটিয়া ভাত রাঁধিতেছে ; বলদ ও মহিষগুলি ধূলার উপর শরীর ঢালিয়া দিয়া জাওর কাটিতে কাটিতে পথশ্রম দূর করিতেছে। কিন্তু এই গভীর মধ্যাহ্নেও মেলার কাছে জনতার হ্রাস হয় নাই। এখনও জোড়া জোড়া চাষার ছেলে নাগরদোলার উপর বসিয়া মহানন্দে দুলিতেছে, এবং কাঠের ঘোড়াবিশিষ্ট এক রকম দোলায় বসিয়া সাত আটটি

ছেলে ঘুরপাক খাইতেছে। তাহারা শক্ত হইয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আছে, আর একজন লোক সেই ঘোড়াগুলিকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরাইতেছে। ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা কুমোরের দোকানে পাঁচ ছয়টা 'চাকা' হাঁড়ি কিনিয়া সেগুলি লম্বা কাপড়ে সারি করিয়া বাঁধিয়া বেলা থাকিতে থাকিতেই গৃহমুখে চলিয়াছে, এবং চাষার ছেলেরা ও দূরগ্রামস্থ ভদ্রলোকের চাকরেরা চারি পাঁচ পয়সা মূল্যে এক এক আঁটি আখ কিনিয়া কাঁধে তুলিয়া ঘরে ফিরিতেছে। কেহ বা এক আধখানা আখ লুব্ধ-দন্তে ছুলিয়া তাহার রস উপভোগ করিতে করিতে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবল হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দাবাদ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তনের অভিপ্রায়ে রতনপুরের পাদরী সাহেব, টমাস্ বিশ্বাস, ডানিয়েল রাহা ও সলোমন দাস প্রভৃতি দেশীয় খৃষ্টানবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সকাল হইতে অতি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, আপাততঃ তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহারা এখন অন্নচিন্তায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু নেড়ানেড়ীর দলের গানের আর বিরাম নাই। তাহারা দলে দলে কাঁথা পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া গিয়াছে : পাশে প্রকাণ্ড ঝুলি, ময়লা কাপড়ের পুঁটুলী, গায়ে নানা রঙের কাপড়ের বহুতালি-বিশিষ্ট আলখেল্লা, সম্মুখে জীর্ণবস্ত্র প্রসারিত ; গৌরপ্রেমে মগ্ন এই বাবাজী-দিগের প্রতি কৃপা করিয়া,—যাহার যাহা ইচ্ছা,—এই বস্ত্রখণ্ডের উপর সে তাহা দান করিয়া যাইতেছে। নেড়ানেড়ীর দলের পাঁচ সাত জন স্ত্রীপুরুষ চক্রাকারে বসিয়া অত্যন্ত উৎসাহে গান গায়িতেছে, পুরুষদের হাতে ময়লা লাল 'একরঙা'-বেষ্টিত 'গাব্‌গুবাগুব্'। তাহারা মাথা নাড়িয়া সুদীর্ঘ দাড়ীর নানারকম ভঙ্গী করিয়া একটা ছোট কাঠি দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে, আর নাকে রসকলি কাটা, ভ্রূযুগলের মধ্যে বা অধরের নিম্নে উল্‌কী পরা, রৌপ্যবলয়বেষ্টিতপ্রকোষ্ঠা বৈষ্ণবীর দল খঞ্জনীতে মৃদুমন্দ আঘাত দিয়া তীক্ষ্ন বামাকণ্ঠে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া গায়িতেছে,—

"ব্রজের শ্যাম ! ব্রজে চল, দিনেক দু'দিন তরে,
বারেক দেখা দিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, এসো তুমি ফিরে,
ধ'রে রাখবো না হে !—"

শ্রীপঞ্চমী

বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলে সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে যেরূপ উৎসাহ দেখা যায়, সেরূপ বোধ হয় আর কোন উৎসবেই দৃষ্ট হয় না। শীতের প্রারম্ভ হইতেই আমাদের গোবিন্দপুরে বড়-বাজারের পান্ডারা সরস্বতীপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, গত বৎসর বড়বাজারে তেমন ধূমধামে সরস্বতীপূজা হয় নাই বলিয়া, বৌবাজারের দল জন্মাষ্টমীর প্রতিমা বাহির করিয়া নগরপ্রদক্ষিণ করিবার সময় ছোট বড় নানা রকম নিশান উড়াইয়া, পাখাওয়ালা বড় বড় ঢাক বাজাইয়া, এবং ময়ূরপঙ্খীতে চড়িয়া দলে দলে সারি গান গাহিয়া, বড়বাজারের পান্ডাদিগকে যেরূপ ধিক্কার দিয়াছিল, ও বিদ্রূপপূর্ণ ছড়া কাটিয়া তাহাদের অক্ষমতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে বড়বাজারের পান্ডারা লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল ; ইহার অনতি-বিলম্বেই তাহারা রামচরণ দফাদারের দোকানে এক বৈঠক বসাইয়া ঠিক করিয়াছিল যে, যদি এবার সরস্বতী পূজায় অসাধারণ ধূমধাম করিতে না পারে ত তাহারা আর কখনও বারোয়ারী করিবে না, দড়ি কলসীর আশ্রয় লইতে হয়, সেও বরং ভাল। উৎসাহে কয় রাত্রি তাহাদের নিদ্রা হয় নাই।

ইতিপূর্বে কৈলাস পরামাণিকের হস্তেই বড়বাজারের দোকানদারবর্গের নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল। কৈলাস বড়বাজারের বিখ্যাত আড়তদার নীলমণি নন্দীর গদিয়ান বা প্রধান কার্যকারক। নীলমণির বাড়ী ফরাসডাঙ্গা। তাহার পিতার আমল হইতেই গোবিন্দপুরে তাহাদের কারবার চলিতেছে। দেশী ও বিলাতী কাপড় ভিন্ন তাহাদের আড়তে ধান, চাউল, তুলা, লবণ, সূতা ও লোহা প্রভৃতি নানা রকম জিনিস বিক্রয় হয়, এবং এক সময়ে এই দোকানই গোবিন্দপুরের মধ্যে 'সেরা'

দোকান ছিল, কিন্তু গোবিন্দপুরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাজারে দোকানপাটের বৃদ্ধি হওয়াতে কিছু দিন হইতে নীলমণির দোকানের কাজকর্ম কিছু 'মন্দা' চলিতেছে ; এমন কি, চাকর বাকরদের বেতন দিয়া ও দোকানের খরচপত্র সরবরাহ করিয়া বেশী কিছু লাভ থাকে না। তাই নীলমণি একবার 'মোকামে' আসিয়া ব্যবসায়ের ব্যবস্থা দেখিয়া বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিল, এবং দোকান উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায় করিতে বসিয়া এখানে তাহার যে বিশ হাজার টাকা 'বিলাত' পড়িয়াছে, তাহার একটা 'কিনারা' না করিয়া কিছুতেই ব্যবসায় বন্ধ করা যায় না, তাই অগত্যা তাহারা কারবার চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

কৈলাস প্রভৃতি কর্মচারিবর্গ দেখিল, বিষম বিপদ ; 'বিলাত' বাকীগুলি আদায় হইলেই তাহাদের চাকরী যায় ; তাই তাহারা 'বিলাত' আদায়ের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইল না। এমন সুখের চাকরী কি সহজে ছাড়া যায় ? কোন চেষ্টা নাই, পরিশ্রম নাই ; বাজারের ঠিক মধ্যস্থলেই দোকান, মাছ তরকারী প্রভৃতি যে কিছু ভাল খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় হইতে আসে, তাহা তাহারাই আগে কিনিয়া লয় ; মধ্যাহ্নে দিব্য নিদ্রা দিবার আয়োজন আছে ; বৈকালে উঠিয়া কেহ কাশীদাসের মহাভারতখানি হাতে লইয়া বসে, কেহ পাঁচু কুণ্ডুর দোকানে পাশার 'কচেবারো' আরম্ভ করে ; কেহ বা গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়। প্রভুর অন্নে দেহ পুষ্ট হইতেছে ; কাহারও ভুঁড়ির পরিসর বাড়িতেছে ; সকলেই 'হাম্‌সে দিগর নাস্তি' হইয়া ক্ষুদ্র বাজারের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু মানসম্ভ্রম পসার প্রতিপত্তি কাহারও কৈলাসের মত নহে। আদালতের পেয়াদা ও গ্রাম্য জমীদারের বরকন্দাজগুলাও কৈলাসকে মাথা নোয়াইয়া সেলাম করে। গ্রামস্থ থানার জমাদার জনাবালী মিঞা পর্যন্ত পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইবার সময় বিরল শ্মশ্রুজালে হস্তার্পণ পূর্বক স্মিতমুখে বলে, "কি কৈলাস বাবু, তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় ?" শুনিয়া কৈলাস সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া উদরে হস্তার্পণ পূর্বক উত্তর করে, "হুজুরের মর্জি, যেমন রেখেছেন, তেমনই আছি।" কৈলাসের এই অসাধারণ সম্মান দেখিয়া বাজারের লোকে সবিস্ময়ে ভাবে, "বাপ রে ! সরকার বাহদুরের কাছে পরামাণিকের পোর কি খাতির !"

সুতরাং বলা বাহুল্য, গোবিন্দপুরের বাজারে কৈলাসের অসাধারণ প্রতিপত্তি। বাজারের মধ্যে কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে কৈলাসই তাহার বিচার করিত, এবং সে যে দণ্ডবিধান করিত, অপরাধীকে নতমস্তকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইত। এইরূপে কৈলাসের মারফত অনেক টাকা জরিমানা আদায় হইত। তাহার কিয়দংশ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ফরিয়াদী পাইত ; অবশিষ্টাংশ বাজারের বারোয়ারীর তহবিলে জমা হইত। কোন দোকানীর নিকট বাজারের কোন দোকানদারের দেনা থাকিলে সেজন্য আদালতে নালিশের নিয়ম ছিল না ; কৈলাস প্রবল যুক্তিতর্কের সাহায্যে সপ্রমাণ করিত যে, যে টাকাটা উকীল রসুমে, পেয়াদার রোজে,

সাক্ষীর বারবরদারীতে, আরজির ষ্টাম্পে ও আমলা বাবুদের পূজায় ব্যয় হইবে, তাহার অর্ধেক টাকা বারোয়ারীতে দান করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ ফলই লাভ হইবে। বলা বাহুল্য, কেহ কখনও সাহস করিয়া কৈলাসের এ যুক্তিখণ্ডনের চেষ্টা করে নাই। গ্রামে কাহারও কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে কৈলাস বিবাহের সাত দিন পূর্ব হইতে বিবাহ বাড়ীতে পাক পাড়িতে আরম্ভ করে, এবং নির্দিষ্ট দিনে বরকর্তার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রাপ্তির আশায় অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে। কিন্তু দৈবক্রমে যদি বহুবাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডা নবীন হালদার কিছু চাঁদা আদায়ের আশায় সেদিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে কৈলাস সদলবলে তাহাকে এমন আক্রমণ করে যে, সে বেচারী পলায়ন করিবার পথ পায় না! সত্য সত্যই গোবিন্দপুরে বড়বাজারের এলাকা অনেকদূর বিস্তৃত, এবং এই জন্যই বিবাহাদি শুভকার্যে বড়বাজারে অনেক টাকা চাঁদা আদায় হয়। বড়বাজারে দোকানদারদের ঘরে যে 'ঈশ্বরবৃত্তি' আদায় হয়, তাহাও বৌবাজার অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু তথাপি বৌবাজারের কয়েক ঘর দোকানদার যে জন্মাষ্টমীর সময় অত্যন্ত ধুমধামে বারোয়ারী করে, তাহা গোবিন্দপুরের অন্যতম জমীদার মজুমদার বাবুদের অনুগ্রহে।

কয়েক বৎসর হইতে এই মজুমদার বাবুদের সঙ্গে চাটুয্যে জমীদারদের বাহাদুরী দেখানো লইয়া দলাদলি চলিতেছে। চাটুয্যেরা যখন দেখিলেন যে, মজুমদারেরা বৌবাজারের দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তখন বড়বাজারের দলের সহিত সমবেদনায় তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, তাঁহারা বড়বাজারের বারোয়ারীর পৃষ্ঠপোষকতায় অবতরণ করিলেন।

এতদ্ভিন্ন বড়বাজারের দলের সহিত চাটুয্যে বাবুদের সহানুভূতির আরও একটু কারণ ছিল। একে ত চাটুয্যেরা বড়বাজারের প্রতিবেশী; তাহার উপর স্বর্গীয় জমীদার দেবনাথবাবুর এক পুত্র চন্দ্রনাথ কিছুদিন হইতে বড়বাজারে এক মুদীখানার দোকান খুলিয়াছেন; তৈল, লবণ, তামাক, ঘি ও ময়দা প্রভৃতি জিনিস দোকানে বসিয়া বিক্রয় করিতে প্রথম প্রথম এই জমীদারপুত্রের বড়ই বাধবাধ ঠেকিত, এবং সকালে কি বিকালে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে বলিতেন, "চুপ করে' বসে' থাকা আর পোষায় না; চাকরবাকরদের একটা দোকান করে দেওয়া গেছে, তারা কি রকম কাজকর্ম করে না করে, তদারক করতে এক একবার এদিকে আসতে হয়।" প্রথম প্রথম দোকান করিতে তিনি বড় সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু অবশেষে যখন দেখিলেন যে, সামান্য পৈতৃক আয়ে আর সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় না, এবং সখের খাতিরে দোকান করা চলে না, তখন তিনি আপনার জমীদার-গর্বটা একটু খর্ব করিয়া বাজারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় হইতে বৃদ্ধ কৈলাসের প্রভুত্ব উড়িয়া গেল, কিন্তু চন্দ্রনাথ কৈলাসের প্রতি কখনও অসম্মান প্রকাশ করেন নাই।

জমীদারের ছেলেকে দোকান করিতে দেখিয়া বৌবাজারের পাণ্ডাদের পরি-

হাসস্পৃহা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। জন্মাষ্টমীর সময় তাহারা এক সং বাহির করিল, তাহাতে চন্দ্রনাথের প্রতি আক্রমণ ছিল। বৌবাজারের দল জমীদাররূপী একটি পুত্তলিকার হস্তে তৌলদণ্ড দিয়া তাহাকে পথে বাহির করিয়াছিল ; এই পুত্তলিকার পরিধানে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে ইস্ত্রীকরা শার্ট, বুকে চেন, পায়ে মোজা ও জুতো, মাথায় সিঁথি কাটা, কিন্তু বাম হস্তে দাঁড়ি বাটখারা ! সং দেখিয়া সকলেই ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিল। তাহার উপর 'কি মজা হালের দোকানদারী',—এই গান ! ক্রোধে ক্ষোভে যুবক চন্দ্রনাথ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমে তিনি স্থির করিলেন, একটা মানহানির মোকদ্দমা তুলিয়া বৌবাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডাদের সকলকে সদলে জেলে পুরিবেন। কিন্তু কোনও প্রবীণ উকীল যখন পরামর্শ দিলেন যে, "বাপু ! ইহাতে তোমার মোকদ্দমা টিকিবে না, উপরন্তু অপমানের একশেষ হইবে। দোকান করিতে লজ্জা বোধ হয়, তাহা ছাড়িয়া দাও, ক্ষেপিলে লোকে আরও বেশী করিয়া ক্ষেপাইবে।"—তখন চন্দ্রনাথ মানহানির মোকদ্দমা ছাড়িয়া সরস্বতীপূজায় অধিক সমারোহে সং বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ;—বাজারে রটাইয়া দিলেন, "ধনপ্রাণ যায় যাক্, একবার উহাদের দেখিয়া লইব।" শুনিয়া বৌবাজারের দল হাসিয়া বলিল, "এবার পিঁপড়ের গর্ত খুঁজিতে হইল !" বৌবাজারের গানের ওস্তাদ নিমচাঁদ বিশ্বাস বলিল, "আমরাও উতোর কাট্‌তে জানি।"

চন্দ্রনাথের চেষ্টায় খুব ধুমধামে বড়বাজারে চাঁদার টাকা উঠিতে লাগিল। দোকানদারেরা লাভের উপর প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে প্রস্তুত হইল এবং কৃষ্ণনগরের কারিগর আসিয়া প্রতিমা নির্মাণ আরম্ভ করিল। অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে না পড়িতে বাজারে প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠক বসিতে লাগিল। এবার কি কি রকমের সং করিতে হইবে, কাহার যাত্রার দল আনান যাইবে, এবং কয় দিন যাত্রা হইবে, খেমটা ও কবির দল বায়না করিবার সুবিধা হইবে কি না, বৈঠকে ইত্যাদি আলোচনা চলিত। উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনার অন্ত নাই ; সকলে সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "ধন্য চন্দোর বাবু, না হবে কেন, জমীদারের ছেলে, দু'দিনেই বাজারটাকে সরগরম ক'রে তুলেছে।"

সরস্বতীপূজার তিন দিন পূর্ব হইতেই বাজারের শ্রী ফিরিয়া গেল ! বাজারের প্রবেশপথে প্রকাণ্ড তোরণ, তাহার উপর নহবৎখানা, তাহার উপরিভাগ লাল 'টুলে'র কাপড়ে ঢাকা, উপরে লাল নিশান উড়িতেছে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় শ্যামনগরের রসুনচৌকীদল এই নহবৎখানায় বসিয়া আপনাদের গুণপণায় পল্লীবালকদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শানাই মিষ্ট নহে, এবং ঢোলকের স্বর ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই বাজনা শুনিবার জন্য গ্রামের সব ছেলে বাজারে আসিয়া জুটিয়াছে ; কারণ, এমন উৎসব সচরাচর ঘটে না ! বাজারের মধ্যে চাটায়ের টাপোর তোলা হইয়াছে ; তাহার নীচে সাদা চাঁদোয়া, লাল ঝালোর, মধ্যে এক জায়গাতে লাল কাপড় কাটিয়া চাঁদোয়ার মালিকের নাম

ও সন তারিখ লেখা, চাঁদোয়ার নীচে কতকগুলি বেল ও ঝাড় ঝুলিতেছে, চারি দিকে বাঁশের খুঁটি মৃত্তিকানুলিপ্তদেহে স্তম্ভাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে লাল কাপড় ও সোনালি জগজগা জড়ানো, তাহার গায়ে একটা করিয়া দেয়ালগিরি আঁটা, এবং প্রত্যেক দেলগিরির নীচে একখানা আর্টষ্টুডিও বা বিলাতী ছবি শোভা পাইতেছে। কিন্তু ছবি টাঙ্গানোর মধ্যে রুচিগত সামঞ্জস্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, এক স্থানে মদনভস্মের ছবি, তাহার পরই হয়ত ইন্দ্রের নন্দনকাননের চিত্র—অত্যন্ত অশ্লীল ; অনন্তর বিলাতী দম্পতীর মিলনদৃশ্য ; চক্ষু ফিরাইলেই দেখা যায়, তাহার পাশের ছবিখানিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের লাল নীল পীত বর্ণের বস্ত্র ও ঘাগরা অপহরণ করিয়া যমুনাতীরে কদম্ববৃক্ষে উঠিয়াছেন, গোপ-কন্যাগণ যমুনাজলে আবক্ষ নিমগ্ন করিয়া যুক্তকরে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে হৃত বস্ত্র ফিরিয়া চাহিতেছে।—তাহার পরই একখানি বিলাতী শিকারীর ছবি,—উপরে নীল আকাশ, দূরে ধূসর পাহাড়, দুইধারে শ্যাম স্নিগ্ধ বনানী, এক পাশে বঙ্কিম গিরি নদী, তীরে দুই একটা গাছ, ঘোড়ার উপর লোহিতপরিচ্ছদধারী শিকারী, তাহার হাতে বন্দুক, সঙ্গে এক দল কুকুর। দেখিলেই একটি উৎসাহশীল, শ্রম-সহিষ্ণু, স্বাধীন জাতির স্বাভাবিক স্ফূর্তি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের কথা মনে পড়িয়া যায়, এবং তাহার পাশে ঐ ইন্দ্রের নন্দনবন, ও কৃষ্ণের বস্ত্রহরণদৃশ্য তাহাদের রসমাধুর্য ও বঙ্গীয় চিত্রকরগণের সুকুমার কলাকৌশলের সহিত একবারে মলিন হইয়া পড়ে।

এখন বাজারে মণিহারী দোকানে কেবল খাকের কলম ও কলমীর 'ছড়' বিক্রয় হইতেছে ; ক্রেতারা সকলেই দুই চারিটি কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। অনেকে শুধু এই কলম কিনিবার অভিপ্রায়েই দূরবর্তী গ্রাম হইতে আসিয়াছে। সরস্বতী-পূজার ইহা একটি অত্যন্ত আবশ্যক উপকরণ।

সরস্বতীপূজার পূর্বদিন স্কুল ও পাঠশালা দেড়টার সময় বন্ধ হইল। পূজার ফুল তুলিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে এই ছুটিটা দিয়া থাকেন। সরস্বতীপূজার ফুলের আয়োজন না করিলে কি তাহাদের বিদ্যা হইবে ? তাই আজ তিন দিন হইতে ছেলেদের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছে, কোথায় কোন দল ফুল সংগ্রহ করিতে যাইবে। এই দিন কোন কোন দল ফুলের সন্ধানে দুই তিন ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামে যাইতেও সঙ্কুচিত হয় না।

ছুটি হইবামাত্র ছেলেরা বাড়ী হইতে কেহ সাজি, কেহ ডালা, কেহ বা একটা ধামা লইয়া পুষ্পসংগ্রহে বাহির হইল ; অন্যান্য ফুলের মধ্যে পলাশ, কাঞ্চন ও গাঁদা ফুল এ সময় খুব বেশী পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই দু'চারিটা গাঁদাফুল গাছ থাকে, কিন্তু বাড়ীর ফুল তুলিবার জন্য কেহ ব্যস্ত নয়, সে ত ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যাইবে। তাই সকলে মল্লিকদের চারাবাগানে পলাশ ও কাঞ্চন ফুলের আশায় ছুটিল। যাহারা গাছে উঠিতে জানে, তাহারা কোমর বাঁধিয়া গাছে উঠিল, আর সকলে তলা হইতে কুড়াইতে

লাগিল ; ফুল পাড়া হইলে তাহা কয়েক ভাগে বিভক্ত হইল ; যাহারা গাছে উঠিয়াছিল তাহারা অবশ্য কিছু বেশী পাইল।

ফুল পাড়া হইলে ছেলেরা বক্সীদের বাগানে কুলের সন্ধানে চলিল। দেশী কুলের গাছ সকল বাড়ীতেই আছে ; কিন্তু তাহার জন্য কাহারও বড় আগ্রহ নাই। নারিকেল কুলের জন্য সকলেরই চেষ্টা। সরস্বতী পূজা হয় নাই বলিয়া অনেক নিষ্ঠাবান বালক এ পর্যন্ত কুল খায় নাই ; কারণ, অধিকাংশ পল্লীবালকেরই বিশ্বাস সরস্বতীকে ভোগ না দিয়া কুল খাইতে নাই, সরস্বতীপূজার পূর্বে কোন বালককে কুল খাইতে দেখিলে অনেক ঠাকুরমা নাতিদের 'বেসবৎ' বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকেন। তবে যাহারা নিতান্ত লোভ পরবশ হইয়া কুল খাইয়া ফেলে, তাহারা খাইবার পূর্বে সরস্বতী দেবীকে নির্দিষ্টসংখ্যক কুল দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়, কেহ পাঁচ গণ্ডা কেহ দশ গণ্ডা কেহ বা এক পণ দিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে। আজ সন্ধ্যার পূর্বে এক দল ছেলে একঝাঁক পঙ্গপালের মত বক্সীদের বাগানে গিয়া পড়িল ; কেহ ঢিল ছুড়িয়া, কেহ জামালকোটা বা চিতের ডাল ছুড়িয়া, কেহ কুল গাছের নাতিস্থূল শাখাতে নাড়া দিয়া কুল পাড়িতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেরা দেখিল, দুই একটা গাছে বুলবুলের দল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বসিতেছে, এবং সরস সুপক্ক কুলে চঞ্চুর আঘাত করিতেছে, দেখিয়া তাহাদের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল, তাহারা ক্ষুদ্র শিশুহস্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিতে লাগিল,—

"বুলবুলি মোর কাকা !
কুল ফেলে দে পাকা।"

কিন্তু বুলবুলি এই সকল লুব্ধ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিবার পূর্বেই তাহারা সভয়ে দেখিতে পাইল, বাগনের মালী দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া গালাগালি দিতে দিতে এক হাতে একটা হুঁকা ও অন্য হাতে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া তাহাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। দেখিয়াই ছেলেরা 'বেড় বাতাড়' ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। একটি ছেলে সরস্বতীকে একপণ কুল দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া ইতিপূর্বে কুল খাইয়াছে, আজ সে বারো গণ্ডার বেশী সংগ্রহ করিতে পারে নাই, এ দিকে মালীর লাঠির ভয়, অন্য দিকে মা সরস্বতীর অভিসম্পাতের আশঙ্কা, বালক কাঁদ-কাঁদ হইয়া তাহার সঙ্গিগণের নিকট দু'পাঁচটা করিয়া কুল ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না ; কারণ গোবিন্দপুর ও তাহার সন্নিকটবর্তী পল্লীসমূহে নারিকেলকুল বড়ই দুর্লভ সামগ্রী। ভগ্নমনোরথ হওয়াতে বালকের চক্ষুঃপ্রান্তে অশ্রু উছলিয়া উঠিল। তখন অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ কূটবুদ্ধি একটি বালক তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তুই কাঁদিস্ কেন ? মা সরস্বতীকে এক পণ কুল দিতে চেয়েছিস্, এক পণই নারিকেলকুল দিবি তা তো আর বলিস্নি, আট গণ্ডা দেশী কুল দিয়ে এক পণ পুজিয়ে দিস্।" বিপন্ন বালক অকূল সাগরে কূল দেখিতে পাইল ; সে চক্ষের

জল মুছিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল।

আজ রাত্রেও তাহাদের নিদ্রা নাই। চতুর্থীর চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকারে আবৃত করিয়া অস্ত গেল। ছেলেরা পাত্র সমেত ফুলগুলি কেহ ঘরের চালে, কেহ ছাদের উপর, কেহ বা সিমের 'টালের' উপর নীহারে রাখিয়া নৈশপুষ্প-চয়নে বাহির হইল।

গ্রামের মধ্যে নিমাই বৈরাগী ও বলরাম সরকার গুরুমহাশয়ের উপরই ছেলেদের অধিক আক্রোশ। নিমাইয়ের অপরাধ, তাহার আখড়ার যে সুপরিষ্কৃত তক্‌তকে আঙ্গিনাখানিতে তুলসীমন্দির আছে, তাহারই চারিদিকে অনেকগুলি গাছে অপর্যাপ্ত 'কাশির গাঁদা' (চন্দ্রমল্লিকা) ফুটিয়া চারিদিক আলো করিয়া থাকিত ; সকালে সন্ধ্যায় অনেক ছেলের দৃষ্টিই সেই ফুলগুলির উপর পড়িত. কিন্তু নিমাইয়ের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহারা কখনও এই ফুল তুলিতে পারে নাই ; নিমাই এই ফুলগাছগুলিকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক যত্ন করিত, এবং বসন্ত কালের প্রফুল্ল সন্ধ্যায় এক একদিন দক্ষিণ দিক হইতে ঈষদুষ্ণ মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া যখন তুলসীমঞ্জরীর ও পাটল-পীত-কোরকবিশিষ্ট এই সকল গাঁদার অতি মৃদু অথচ মনোহর সুগন্ধ আহরণ পূর্বক সুপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আখড়াখানিকে মিশ্র সৌরভপ্রবাহে আকুল করিয়া তুলিত, তখন সেই কৌপীনবহির্বাসধারী, মুণ্ডিত-মস্তক, 'রাধাকৃষ্ণচরণ-ভরসা' ও ছাপচর্চিত-দেহ নিমাইচাঁদ আপনার ক্ষুদ্র আখড়া-খানিকে বৃন্দাবনস্থ কোনও কুঞ্জ-কাননের অনুরূপ বলিয়াই মনে করিত, এবং অদূরবর্তী ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণী বৃন্দাবন-প্রান্তবাহিনী কল্লোলময়ী যমুনা বলিয়া তাহার ভ্রম হইত ; সে ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ প্রদীপ লইয়া তাহার উপাস্য দেবতা সেই তুলসীমঞ্চের পাদদেশে স্থাপন পূর্বক 'রাধারাণী কি জয়!' বলিয়া সর্বাঙ্গ লুটাইয়া পরম ভক্তি ভরে প্রণিপাত করিত এবং অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে সেই ধূলি মস্তক, কণ্ঠ ও ওষ্ঠে স্পৃষ্ট করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত! গ্রামের ছেলেরা নিমাইয়ের এই ভক্তিবিহ্বলভাব তেমন অনুকূল ভাবে দেখিত না, আজ সরস্বতীপূজার পূর্বাহ্ণে তাহারা তাহার সাধের পুষ্পকানন লুণ্ঠন করিতে কৃতসংকল্প হইল।

অধিক রাত্রে গ্রামস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে, তাহার আখড়ার সমস্ত ফুল অপহরণ করিয়া এক দল অপেক্ষাকৃত সাহসী, সবলকায় পল্লীবালক প্রাচীর লাফাইয়া বলরাম সরকারের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বলরাম ও তাহার পরি-বারবর্গ তখন নিদ্রামগ্ন, কিন্তু তাহার ঘরের বারান্দায় একটা কালো কুকুর শুইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ী পাহারা দিত। এই অনধিকার প্রবেশকারিগণকে দেখিয়া সে ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল। সুতরাং বালকেরা সুস্থিরচিত্তে অধিকক্ষণ সেখানে পুষ্পচয়নে সাহস করিল না। তাহারা ত্রস্তহস্তে একে একে সমস্ত গাঁদা ফুলের গাছ উৎপাটন করিয়া লইয়া সেখান হইতে নিঃসারিত হইল, তাহার পর পথে আসিয়া গাছ হইতে সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া সরকারের গৃহপ্রান্তবর্তী

একটা পচা পুকুরে সে গাছগুলি উল্টা করিয়া পুঁতিয়া চলিয়া গেল ; পরদিন সকালে গুরু মহাশয় তাহার বাগানের দুরবস্থা দেখিয়া কিরূপ সন্তপ্ত হইবেন, তাহাই কল্পনা করিয়া, তাহার সুগুরু-চপেটাঘাতপীড়িত পড়ুয়াগণের প্রতিহিংসা-বৃত্তি কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল।

রাত্রি শেষ হইয়াছে ; অল্প অল্প অন্ধকার আছে ; এমন সময় জেলেপাড়া ও গোয়ালাপাড়া হইতে সুপ্তোত্থিতা জেলেনী ও ঘোষানীগণের কলরব উঠিতে লাগিল। মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি কাঁকে লইয়া এবং ঘোষানীরা দধির ভাড় লইয়া গ্রামের বড়লোক ও গৃহস্থবাড়ীতে 'সাইত' করিতে বাহির হইল। 'সাইতে'র কথাটা আমাদের নাগরিক পাঠকবর্গের নিকট একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীপঞ্চমীর দিন অতি প্রত্যূষে আমাদের পল্লী অঞ্চলের মেছুনী ও ঘোষানীরা অনেক বাড়ীতেই মাছ ও দধি উপহার দিয়া যায় ; ইহাকেই তাহারা 'সাইত' করা বলে। সরস্বতীপূজার দিন ইলিশমাছ-ভক্ষণ পল্লীগ্রামের অনেকেই একটা সুলক্ষণের কাজ বলিয়া মনে করে ; সেই জন্য অনেক মেছুনী বহুদূরস্থ পদ্মা-তীরবর্তী স্থান হইতে ইলিশ মাছ সংগ্রহ করিয়া তাহা 'সাইতে' লাগায়, এবং যাহারা 'ইলিশ' মাছে 'সাইত' করে, তাহাদের লভ্যও কিছু বেশী হইয়া থাকে। বাজারে যে ইলিশের দাম দশ বারো পয়সার বেশী নয়, সেই মাছ দিয়া 'সাইত' করিলে ইহারা নগদ আট গণ্ডা পয়সা কি একখানা কাপড় পায়। পল্লীগ্রামের নিম্নশ্রেণীর রমণীগণ শুভ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া ও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির প্রলোভনে যে উপহার দান করিয়া যায়, তুচ্ছ হইলেও, সেকালের মহোদয় বৃদ্ধগণ তাহা পরমপরিতোষসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। সেকালে দেখা যাইত, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে কাহারও ঘরের চালে পাঁচটা মাছ গোঁজা রহিয়াছে, রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে কাতারে কাতারে দৈ ! শেষ-রাত্রে আসিয়া গৃহস্থ কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া মেছুনী ও ঘোষানীরা এই সকল জিনিস 'সাইত' করিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া সেই সকল জিনিস দেখিয়া কর্তা-গিন্নীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গিন্নী সেই ইলিশ মাছের কপালে 'তেল সিঁদুর' দিয়া, নূতন কস্তাপেড়ে কাপড় পরিয়া শুদ্ধাচারে রৌদ্রোত্তপ্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা কুটিতে আরম্ভ করিলেন ; কারণ, প্রথম দিন ইলিশ মাছের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ইহাই লৌকিক নিয়ম। কর্তা হাসিমুখে ছেলেদের আমোদ দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইলিশমাছদাত্রী মেছুনী আসিয়া কর্তাকে লক্ষ্য করিয়া একটু স্পর্দ্ধার ভাবে বলিল, "ইলিশমাছ দিয়ে আজ 'সাত' করেছি, আজাই—একখানা গরদ চাই।"—কর্তামহাশয় সহাস্যে উত্তর করিলেন, "পচামাছ দিয়ে তোর কাপড় চাহিতে লজ্জা করে না ?" আর কোথা যান !—মেছুনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ ত আর মুখের কথা নয় আজাই ! সে কি এখেনে, পনেরো ক্রোশ জমী হেঁটে আমাদের বলাই মোষকুণ্ডি হ'তে কাল রেতের বেলা মোটে পাঁচটি মাছ এনেছে—এখন কি আর ইল্‌সে জালে পড়ছে ? আগুনের মত দাম।"—কর্তা

বলিলেন, "যা আর বক্তৃতে কর্তে হবে না, ও বেলা আসিস, তোর কপালে যা আছে, পাবি।" বিকালে তাহার একখানি লালপেড়ে নূতন শাড়ী লাভ হইল। এইরূপ দানে দাতার মনের প্রসন্নতা গৃহীতার আনন্দ অপেক্ষা অল্প হইত না। কিন্তু একালে এরূপ সাইতের প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। আগে যে বাড়ীতে পাঁচ জন লোক 'সাইত' করিতে যাইত, এখন সেখানে একজনও যায় কি না সন্দেহ। গ্রামস্থ ভদ্রসম্প্রদায় ও ইতর লোকের মধ্যে পূর্বে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যভাব ছিল, পরস্পরের সুখে দুঃখে তাহারা যে পরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, তাহা একালে অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীপঞ্চমীর দিন অতিপ্রত্যূষে বড়বাজারের নহবতের সানাই-ধ্বনিতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালকগণ শয্যাত্যাগ করিয়াই পূজার আয়োজন আরম্ভ করিল। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিগণ চন্ডীমন্ডপে বসিয়া ছুরি দিয়া লম্বা লম্বা খাক ও কলমীর ছড় কাটিয়া কলম 'বাড়িতে' লাগিল। আম্রমুকুল ও যবশীর্ষ সরস্বতীপূজার অত্যাবশ্যক উপকরণ ; পুষ্পচয়নে ব্যস্ত থাকাতে পূর্বদিন যাহারা উক্ত দুই দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাহারা আম্রকানন ও নদীতীরবর্তী শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। কিন্তু যবশীর্ষ সর্বত্র পাওয়া যায় না ; সুতরাং তাহারা যবশীর্ষের পরিবর্তে এক এক গোছা গোধূমশীর্ষ সঞ্চয় করিয়া আনিয়া মধুর অভাব গুড়ে মিটাইতে বাধ্য হইল।

পূর্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই 'ঝিউনী'র কালীপূর্ণ দুই চারিটা কালো মাটীর দোয়াত থাকিত। সেগুলি দেখিতে প্রস্তরনির্মিত দোয়াতের মত, তাহাদের গঠনও বিচিত্র, কোনটা চতুষ্কোণ, তাহার উপরে তিন চারিটা ঝুঁট ; কোনটি গোলাকার ; দুই একটা দোয়াতের সংগে একটা ছোট কুঠুরী, তাহাতে বালি রাখিবার নিয়ম ছিল ; কারণ, সেকালে একালের মত ব্লটিং কাগজের চলন হয় নাই। মাটীর দোয়াত যাহাতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে না পারে, এ জন্য অনেকে দোয়াতের উপর পুরু করিয়া মাটীর প্রলেপ দিত। পূর্বকালে দুইটা হইতে চারি পাঁচটা পর্যন্ত দোয়াত এক পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু একালের কুম্ভকারেরা এই দোয়াত প্রস্তুত করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কাচের দোয়াত। শক্ত চীনামাটীর দোয়াতগুলির যুগও অতীত হইয়াছে। সরস্বতীপূজার দিন সকালে উঠিয়া এই দোয়াত ধোয়া ছেলেদের একটা প্রধান কর্তব্য কর্ম।

একটু বেলা হইলে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে স্নান করিয়া আসিল। মাঘের প্রবল শীত, তাহার উপর বাতাস বহিতেছে, কাহার সাধ্য বেশীক্ষণ জলে থাকে ? এই প্রবল শীতে ছেলেদের জলক্রীড়াটা অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

নয়টা বাজিতেই পুরোহিত মহাশয় লাল বনাতের নীচে সাদা চাদর দ্বারা

সর্বশরীর ঢাকিয়া গৃহস্থবাড়ী প্রবেশ করিলেন। বড়বাজারের বারোয়ারীপূজাতে আজ তাঁহাকেই পৌরোহিত্য করিতে হইবে, তাই তিনি সকল যজমানবাড়ীতেই কিছু বেশী রকম তাড়াতাড়ি করিতেছেন। বাড়ীর কর্তা তাঁহার সিন্দুর ও চন্দন-রাগে চর্চিত কাঁঠাল-কাঠের কালো পুরাতন পৈতৃক বাক্সটা জমা-খরচের খাতাপত্র সমেত বাহির করিয়া দিলেন। একখানা পিঁড়ির উপর তাহাই সরস্বতী দেবীর স্থান অধিকার করিল। ছেলেরা দু'দিন কাল লেখাপড়ার হাত হইতে অব্যাহতি-লাভের অভিপ্রায়ে তাহাদের শ্লেট, কথামালা, হস্তাক্ষরের খাতা ও শিশুবোধক হইতে সীতার বনবাস, কবিকংকণের চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত, এমন কি, ফার্ষ্টবুকখানা পর্যন্ত সেই বাক্সের উপর চাপাইয়া দিল। বাক্সের সম্মুখে দোয়াত-গুলি সাজানো, তাহার ভিতর দুধ গঙ্গাজল ঢালা, এবং খাকের কলম, আমের মুকুল, যবের শীষ, ও গাঁদার ফুলে এই সকল দোয়াতের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। আজ আর লেখাপড়ার কাজ নাই, দোয়াত কলমের ছুটি, পুরাতন কালি সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে ; হঠাৎ কাহারও কিছু লিখিবার আবশ্যক হইলে একটা ঝিনুকে একটু আলতা গুলিয়া নূতন কঞ্চির কলমে কার্যোদ্ধার হইতেছে।

হাতে অনেক কাজ বলিয়া পুরোহিত মহাশয় 'নমো নমো' করিয়া সংক্ষেপে পূজা সারিলেন, তাহর পর 'অঞ্জলি' দিবার জন্য সকলকে আহবান করিলেন। এত বেলা পর্যন্ত কিছু খাইতে না পাইয়া ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতার তাড়নায় ও সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিয়া খাইলে বিদ্যা হইবে না, এই ভয়ে, এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল ; পুরোহিত মহাশয় অঞ্জলি-দানের জন্য আহবান করিবামাত্র বিলম্ব না করিয়া কেহ ময়ূরকণ্ঠী, কেহ চেলী, কেহ ধূপছায়া বা গরদের ধুতি পরিয়া, দোব্জা গলায় ফেলিয়া, সরস্বতীর সম্মুখে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। এমন কি, তিন চারি বৎসরের ছোট ছেলে-গুলি পর্যন্ত তাহাদের দাদাদের দেখাদেখি অঞ্জলি দিতে আসিল। সকলে আসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া, পুরোহিতের শিক্ষামত সমবেতকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকালী কপালিনী।
বেদবেদান্তবেদাংগবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

ভক্তবৃন্দ সেই বাক্স ও পুস্তক-রূপিণী সরস্বতীর উপর এক একবার করিয়া তিনবার অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্প নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সকলে নতমস্তকে প্রণাম করিবার সময় পুরোহিতের কথার প্রতিধ্বনিপূর্বক সুর করিয়া বলিতে লাগিল,—

বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।

পুরোহিত চলিয়া গেলে ছেলেরা জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। সর-স্বতীর খাতিরে যাহারা এত দিন কুল খাইতে পায় নাই, তাহারা খুব ঘটা করিয়া

কুল খাইতে লাগিল। অনেকে শুধু কুলে সন্তুষ্ট হইল না, 'কুল-সল্‌পো' করিবার প্রলোভন তাহাদের পক্ষে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। সেকালের অনেক জিনিসের মত 'কুল-সল্‌পো' জিনিসটাও এ কালে দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু এক সময়ে ইহা পল্লীবালকদিগের বড়ই মুখরোচক ছিল। তাহারা 'সবুরে' করিবার উদ্দেশ্যে পাড়া হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া 'সল্‌পো' পাতা লইয়া আসিল, কুলগুলি ছেঁচিয়া বা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রথমে পাথরের বাটিতে রাখিল, তাহার পর তাহাতে তেল, নুন, মরিচ ও সল্‌পো পাতা মিশাইয়া গামছা বা বস্ত্রখণ্ডে ঐ পাত্র আচ্ছাদন করিয়া তাহা ক্রমাগত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে সমস্বরে বলিতে লাগিল,—

"কুল-সল্‌পো হ'লো,
ধোপা মাগী ম'লো,
ধোপা মাগীর কাঁধে ঘা,
তেল নুন দিয়ে চেটে খা।"

ছেলেরা 'কুল-সল্‌পো' লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের মা দিদিমাদের আর বিশ্রাম নাই! একে ত আজ সরস্বতীপূজা উপলক্ষে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন কিছু গুরুতর ;—তাহার উপর কাল শীতলষষ্ঠী, অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই, ভাত ব্যঞ্জন সমস্ত আজ রাঁধিয়া রাখিতে হইবে। বড় বড় গৃহস্থবাড়ীতে তিন বেলার রান্নাই একটা 'যজ্ঞি'র ব্যাপার,—তাহা রাঁধিতেই তাঁহাদের রাত্রি দুপুর অতীত হইয়া গেল।

বাজারের বারোয়ারীতলায় আজ আর উৎসাহের অন্ত নাই। গ্রামের যত ছেলে আহারাদির পর সেখানে জুটিয়াছে। এই বারোয়ারীপূজার ঘরখানি সারা বৎসর মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঈশ্বর নন্দীকে দোকান করিতে দেওয়া হয়। আজ কয় দিন হইতে ঈশ্বরকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া সরস্বতী ঠাকুরাণী অম্লানভাবে সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। দেবীর আরক্ত পদতলে এক বৃহৎ রক্তোৎপল, হস্তে মৃণ্ময়-বীণা, সর্বশরীর ডাকের সাজে সজ্জিত, গলদেশে কৃত্রিম মতিল মালা, মস্তকে বৃহৎ তারের মুকুট, দুই পাশে সখীযুগল, সম্মুখে কতকগুলি দোয়াত কলম, খাতাপত্র ও একটি বৃহৎ মঙ্গলঘট সংস্থাপিত ; তাহারই উপর অঞ্জলি-প্রদত্ত পুষ্প-রাশি বিশৃঙ্খলভাবে বিরাজ করিতেছে।

পাশে আর একটা ঘরে কতকগুলি সং। সে ঘরের দ্বার আজ রুদ্ধ। পাণ্ডারা আজ রাত্রে নাচ গানের আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত ; তাই আজ সং দেখাইবার ব্যবস্থা নাই ; কিন্তু ঝাঁপের ফাঁক দিয়া বালকবালিকাগণ কৌতূহলপূর্ণ নয়নে সেই সকল মূর্তিসন্দর্শনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর দিন 'কাচ-কাক' দেখিবার জন্য মাঠে যাইবার একটা রীতি আছে। এটা রাজপুত জাতির আহেরিয়ার মত। আহেরিয়ার দিন বরাহ শিকার করিতে পারিলে রাজপুতেরা যেমন তাহাদের সমস্ত বৎসরের শুভ কল্পনা

করে, সেইরূপ পল্লীবালকগণ, এমন কি, বৃদ্ধেরা পর্যন্ত এই দিন 'কাচ-কাক' দেখিলে সংবৎসর শুভদায়ক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

তাই বেলা পড়িতে না পড়িতে বালকেরা, যুবকেরা, বৃদ্ধেরা দলে দলে স্ব স্ব শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, মাঠের দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রান্তরস্থ প্রত্যেক বৃক্ষে, দূর আকাশের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ঘুরিতেছে,—যদি দৈবাৎ একটা 'কাচ-কাক' তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়! নববসন্ত সমাগতপ্রায়, শীতের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং অস্তমান সান্ধ্য তপনের পীত রশ্মিজাল বাসন্তী লক্ষ্মীর হেমাভ লাবণ্যের ন্যায় শোভাময়; রবিশস্যসমালঙ্কৃত প্রশস্ত প্রান্তর-বক্ষে তাহা বিচিত্র বর্ণচ্ছটার বিকাশ করিতেছে; এমন সময় সহসা নববসন্তের প্রণয়ানুরাগস্ফুরিত আবেগচঞ্চল নিশ্বাসের মত ঈষদুষ্ণ বায়ুপ্রবাহ আম্রমুকুলের সৌরভ ও তরুশাখাসীন বিহঙ্গমকুলের মধুর হর্ষকাকলি বহিয়া আনিয়া মূক ধরণীর সুপ্তবক্ষে নবাগত যৌবনের সুখস্বপ্ন ঘোষণা করিয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির। ক্রমে সূর্যের কনককান্তি পশ্চিমে বিলীন হইল। আকাশের অতি উচ্চে দুই একটি পক্ষী তখনও দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাসমান। অদূরবর্তী শাল্মলীর পত্রহীন শাখায় বিকশিত লোহিত পুষ্পস্তবকের মধ্য হইতে একটা কোকিল স্তব্ধ, উদার, ধূসর সন্ধ্যায় আপনার উন্মত্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কুহুস্বরে ব্যক্ত করিয়া চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। ক্রমে শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা ঊর্ধ্বাকাশ হইতে অনতি-উজ্জ্বল রজতরশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া ধরাতল ধৌত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইল দেখিয়া সকলে প্রান্তর-প্রান্ত হইতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্তন করিল। আজ রাত্রে বারোয়ারীতলায় মধু কানের 'ঢপ' হইবার কথা, তাই বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক লোক গোবিন্দপুরে আসিতেছে। তাহাদের একজন মেঠো সুরে গাহিয়া উঠিল,—

> "হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,
> ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী;
> বাজারে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুরে বশ করি',
> তিষ্ঠ মম হৃদি-গোষ্ঠে কৃষ্ণ, মম এই মিনতি।"

সেই পল্লীযুবকের তানলয়বর্জিত, অমার্জিত উচ্চ সুরে গীত, ভক্ত গায়ক দাশরথির এই সঙ্গীতধারা ম্লান-চন্দ্রিকা-পরিব্যাপ্ত শ্যামল শস্যশীর্ষপরিপূরিত পাণ্ডুর প্রান্তর প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

দূরে রাজনগরের কাঁচা 'শরাণে'র উপর দিয়া ধূলি উড়াইতে উড়াইতে একখানি গরুর গাড়ী ভার-ক্লিষ্ট চক্রশব্দে আপনার মন্থর গমনের কথা ঘোষণা করিয়া গোবিন্দপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; তাম্রকূট-ধূমপিপাসু গাড়োয়ান চকমকীর পাথরে ঠুকনীর ঘা দিয়াই গান ধরিল,—

"মন! তুমি কৃষিকাজ জান না!
এমন মানব জমীন রৈল পতিত,
আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা।"

রাত্রি আটটার পর মধু কানের 'ঢপ' আরম্ভ হইল। বাজারের মধ্যেই আসর। আসরের চারিদিকে স্থানের অপ্রতুল নাই; কিন্তু গীতপিপাসু পল্লীযুবকগণ ও বালক-বালিকা সন্ধ্যাকালেই নৈশ আহার শেষ করিয়া আসিয়া স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে;—তাহাদের হাসি, গল্প, কলরবের বিরাম নাই। ক্রমে শ্রোতৃবর্গের ভিড় বাড়িতে লাগিল, যাত্রাওয়ালারা একে একে আসরে আসিয়া বসিল, এবং যাত্রার সূচনাস্বরূপ ডুগি ও মন্দিরা দ্রুত তালে বাজিতে লাগিল।

রাত্রি একটু অধিক হইলে গোবিন্দপুরের অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তপরিবারস্থ রমণীগণ ময়লা কাপড়ের ছদ্মবেশে প্রতিবেশিনীবর্গের সহিত আসিয়া অতি সংকুচিতভাবে একবার সরস্বতী প্রতিমা দেখিয়া লইতেছেন;—দৈবাৎ তাঁহাদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আসরের সন্নিকটে উপবিষ্ট দর্শকগণের মস্তকের উপর দিয়া আসরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে—সেখানে তখন ঝুটা মতির মালায় বেষ্টিতকণ্ঠ, কুঞ্চিত-পরচুলাধারী, নকল কৃষ্ণ কপালে ও মুখে অলকা তিলকা কাটিয়া, পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া, বাম হস্তে বংশীধারণ করিয়া এক এক পা চলিতেছে, আর দক্ষিণ হস্ত ঘন ঘন আন্দোলন করিয়া অনুনাসিক বক্তৃতা দ্বারা নন্দ যশোদার পুত্রবিরহ-শঙ্কাকুল হৃদয়ে শোকশল্য বিদ্ধ করিতেছে, আর তাহাদের সেই অভিনয়ের ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে বিস্ময়মগ্ন নিরীহ শ্রোতৃবর্গের অশ্রুসংবরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ভাবাবেশে কোনও কোনও ভক্ত উচ্ছ্বাসভরে 'হরিবোল' বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে, আর শত কণ্ঠের যুগপৎ হরিধ্বনিতে 'সঙ্গতে'র ঐক্যতান ডুবিয়া যাইতেছে।

ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইল। সমস্ত গ্রাম সুপ্ত, অন্ধকারময়; শুধু বাজারের মধ্যে শত শত নিদ্রাবিজড়িত নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যাত্রা চলিতেছে, এবং একই রকম সুরে দৃশ্যের পর দৃশ্যের কাহিনী কীর্তিত হইতেছে। অবশেষে উৎসব-প্রাঙ্গণের আলোকরশ্মি ম্লান হইয়া আসিল, আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা বিরল হইয়া গেল, এবং ঊষাগমের পূর্বলক্ষণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু তখনও বিরাম নাই; তখনও সঙ্গীতসুধাসক্ত সহিষ্ণু শ্রোতৃবর্গের মুগ্ধ চিত্ত মথিত করিয়া সদ্যোমুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু, তুলসীমাল্যে বিভূষিতকণ্ঠ, পট্টাম্বর-পরিহিত, যাত্রার দলের প্রবীণ অধিকারী বৃন্দা দূতী সাজিয়া, পুষ্পমাল্যগ্রন্থনরতা, দীর্ঘজাগরণক্লিষ্টা, আসন্ন বিরহসম্ভাবনায় ব্যথিতা, রুদ্যমানা, গরবিনী, বৃকভানু-নন্দিনী, রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া গায়িতেছিল,—

"রাই, তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে,
মথুরায় তার মাল্য-বদল হ'বে না জানি কার সনে;
কেন গাঁথ চিকণ মালা, ছেড়ে যাবে চিকণ কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা—জপমালা হ'বে মনে।"

শীতলা-ষষ্ঠী

গোবিন্দপুরের জনসাধারণ শ্রীপঞ্চমীর উৎসবের রাত্রি স্বপ্নকুহকের মত কাটাইয়া দিল। বারোয়ারীতলার আসর রাত্রিশেষে জনহীন হইয়া পড়িল। ঝাড় ও দেয়াল-গিরির বাতিগুলি নির্বাপিত হইল ; ঢুলী বাজন্দারেরা একবার যাত্রাভঙ্গসূচক ঢোল ঢাক বাজাইয়া হিমযামিনীর সুপ্তি-কুহক ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার পর নহবতের উপর হইতে রসুনচৌকীর দল মধুর ভৈঁরো রাগিণীতে সানাই বাজাইয়া ঊষাদেবীর আবাহন-সঙ্গীতের সূচনা করিল। সমস্ত রাত্রির উৎসবে প্রমত্ত গ্রামখানি প্রভাতে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। উৎসব-নিশার অবসানে এই মঙ্গল-বাদ্য যেন সুপ্ত গ্রামবাসিগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রভাতেও গ্রামে উৎসবের বিরাম নাই। আজ শীতলা-ষষ্ঠী। উৎসব-মুখর গ্রামে আজ কাহারও কোনও কাজ নাই। গ্রামবাসিগণের আজ সমস্ত দিনই অবসর। স্কুল পাঠশালার ছুটি, স্ত্রীলোকের রন্ধনশালায় কাজ বন্ধ, কৃষকেরা ক্ষেতে যায় নাই, বাজারে মাছ, তরকারীর আমদানী নাই ; অরন্ধনের দিন কে মাছ তরকারী কিনিবে ? বাজারের দোকানদার ব্যবসায়িগণ, পাঠশালার ছেলেরা ও অধিকাংশ গৃহস্থ সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে ; কারণ, বারোয়ারীর আসরে বেলা একপ্রহরের মধ্যে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হইবে।

বৈকুণ্ঠ জাতিতে কৈবর্ত্ত দাস। যাত্রার দলের অধিকারীগিরি করিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলে অধিকারী নামে পরিচিত। সমস্ত রাত্রি মধুকানের পালা শুনিয়াও বারোয়ারীর পান্ডাদের আশা মেটে নাই। আসর ফাঁক দেওয়া হইবে না স্থির করিয়া তাহারা অতি কম টাকায় বৈকুণ্ঠের দলের বায়না করিয়াছে। গোবিন্দপুরের সন্নিকটস্থ কোনও গ্রামে বৈকুণ্ঠের বাড়ী। গান ও বক্তৃতায় বৈকুণ্ঠ বাল্যকাল হইতেই

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বৈকুণ্ঠ সর্বপ্রথমে কানাইখালীর মাধব গাঙ্গুলীর যাত্রার দলে প্রবেশ করে ; অবশেষে স্বয়ং ওস্তাদ হইয়া আপনি এক যাত্রার দল খুলিয়া বসিয়াছে। সে সময়ে মতি রায়ের যাত্রার নামে ভারি একটা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল ; মতি রায়ের পালায়, মতি রায়ের সুরে, মতি রায়ের বক্তৃতায় কেমন একটা মাদকতা ছিল, তাহা কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের কর্ণেই মধুবর্ষণ করিত। অনেক টাকা বায়না দিয়া পল্লীগ্রামের কোনও লোক মতি রায়ের দল আনিতে পারিত না ; তথাপি তাঁহার গান এ অঞ্চলের অপরিচিত ছিল না। নদীর ধারে আমবাগানের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখালের দল গাহিত,—

“ওরে রামশশী, যদি হ'বি বনবাসী,
কে আমারে ডাক্‌বে মা ব'লে ?”

সন্ধ্যাকালে কর্মশ্রান্ত শ্রমজীবী, জনবিরল ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম্য পথ ধ্বনিত করিয়া সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপাইয়া গাহিত,—

“এ ত সুধা নয়, সুধা নয়,
কুরুকুলক্ষয়কারী গরলরাশি,
খেলার সাগরে সে রূপসী।”

শুনিয়া পল্লীরমণীগণও বুঝিতে পারিত, এ মতি রায়ের গান। মতি রায়ের দলের একজন প্রসিদ্ধ ‘জুড়ি’ এক দিন অধিক পরিমাণ ধান্যসুধাপানে প্রমত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করায় দলের অধিকারী তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার আশায় তাহার পৃষ্ঠে বেহালার ‘ছড়ে'র আঘাত করেন। ইহাতে জুড়িপ্রবর অপমান বোধ করিয়া মতি রায়ের দল পরিত্যাগ করে ; সঙ্গে সঙ্গে সে অন্নদাতা মতি রায়ের ‘ভীষ্মের শরশয্যা গীতাভিনয়’ নামক গ্রন্থখানির নকল চুরি করিয়া লইয়া যায়। অতঃপর সে বৈকুণ্ঠের দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। বৈকুণ্ঠ দেখিল, একটি ভাল দলের একজন খ্যাতনামা জুড়ি ও একখানি ভাল পুস্তক একত্র হস্তগত হইতেছে, ইহাতে ব্যবসায়ের বেশ সুবিধা হইতে পারিবে। সুতরাং সে মাসিক পনর টাকা বেতন ও খোরাক পোষাক অঙ্গীকার করিয়া লোকটিকে নিজের দলে ভর্তি করিয়া লইল। তাহাকে তিন মাসের বেতনও অগ্রিম দিতে হইল।

বৈকুণ্ঠ “ভীষ্মের শরশয্যা”র নামপরিবর্তন পূর্বক এই নবার্জিত গ্রন্থখানির নাম রাখিল,—“ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু গীতাভিনয়”। সে খুব ধুমধামে এই গ্রন্থের তালিম দিতে লাগিল, এবং নিজের বাহাদুরী প্রকাশের জন্য পুস্তকের মধ্যে দুই একটা দৃশ্যের সামান্য সামান্য পরিবর্তন করিল ; গান, সুর, ভাষা, সমস্তই অবিকল রহিল!

পূজার পর বৈকুণ্ঠের দল আর কোথাও গাহনা করিতে যায় নাই। গোবিন্দপুরের বারোয়ারীতলায় একপালা গান গাহিয়া তাহারা বিদেশে যাত্রা করিবে, এইরূপ কথা ছিল। এই প্রথম দিনের কৃতকার্যতার উপর বৈকুণ্ঠের সংবৎসরের সাফল্য নির্ভর করিতেছে,—তাই সে আপনার গুণপণা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিবার

অভিপ্রায়ে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট সাজসরঞ্জাম লইয়া বারোয়ারীতলায় উপস্থিত হইল।

আসর হইতে ঢোলকের শব্দ উঠিবামাত্র গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে মধুলোলুপ মধুকরের গুঞ্জন আরম্ভ হইল। গৃহস্থ পুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ তাড়াতাড়ি নদী হইতে স্নান করিয়া আসিল ; কেহ কেহ বা দুই ঘটি জল কূপ হইতে তুলিয়া হড় হড় করিয়া মাথায় ঢালিল, তাহার পর রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া অরন্ধনের পান্তভাত খাইতে আরম্ভ করিল। আজ পান্তভাতের উপকরণও অদ্ভুত ;—পান্তভাতের সঙ্গে তৈল, লবণ ও কাঁচালঙ্কা বিরাজিত ; আস্ত কলাই-সিদ্ধ, লম্বা লম্বা আলুতাপাতি শিম-সিদ্ধ, 'সলে' বেগুণ-সিদ্ধ, 'বেথোর' পাতা ও কুল-সিদ্ধ আজ পান্তভাতের সঙ্গে খাইবার ব্যবস্থা। কেহ কেহ ইহাই যথেষ্ট নহে মনে করিয়া ডাল ও মাছের অম্বল রাঁধিয়া রাখে,—কিন্তু সকলে নহে।

এ দিকে গিন্নীঠাকুরাণী মাঘ মাসের এই প্রবল শীতে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া সরস্বতীর প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্স, ঘট, পুঁথির বোঝা ও দোয়াত-কলম-গুলি সরাইয়া ফেলিলেন ; তাহার পর তুলসীতলায় ষষ্ঠীপূজার আয়োজন করিয়া রাখিলেন।

পুরোহিত ঠাকুরের পঞ্চাশ ঘর যজমান। তিনি তাহাই রক্ষা করেন, না, বাজারে বারোয়ারীতলায় যাত্রা শুনেন, এই চিন্তাতেই অস্থির ! যাত্রা শুনিতে গেলে যজমানের বাড়ী ষষ্ঠীপূজা হয় না, আবার ষষ্ঠীপূজা করিতে গেলে যাত্রা-শ্রবণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয় ! আহা ! 'ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু গীতাভিনয়' ! এ যাত্রা না শুনিলে আর জীবনে সুখ কি ? অগত্যা তিনি ষষ্ঠীদেবীকে ফুল-জল-দানে তৃপ্ত করিয়াই এক যজমানের বাড়ী হইতে অন্য যজমানের বাড়ী প্রবেশ করিতেছেন। কোনও প্রকারে ষষ্ঠীর সম্মান রাখিয়া নাকে-মুখে দুই চারি মুঠ পান্তভাত পুরিয়া তিনি যাত্রার আসরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ষষ্ঠীপূজা শেষ হইবার পূর্বেই আহারাদি শেষ করিয়া অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছে। কিন্তু পল্লীরমণীগণের এখনও আহার হয় নাই ; ষষ্ঠীর কথা না শুনিয়া কাহারও জলগ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা সাহস নাই, ষষ্ঠীদেবীর শাপে পড়িয়া সেকালের মণ্ডল গিন্নীর মত অবস্থা হইতে কতক্ষণ ! বিশেষতঃ, শীতলা ষষ্ঠীর মিষ্ট কথা ও-পাড়ার মুক্তা মাসী যেমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারেন, এমন সকলের মুখে শুনায় না। তাই রমণীগণ মুক্তা মাসীর আগমন-প্রত্যাশায় তৃষিত চাতকীর ন্যায় বসিয়া আছেন। কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত পুত্রবতী রমণীগণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলে লইয়া অভুক্ত আছেন,—এ জন্য গিন্নীরা মুক্তা মাসীর উপর ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ; বিশেষতঃ, যে সকল গিন্নীর নিকট মুক্তা মাসী কোনও প্রকারে ঋণী, তাঁহাদের তর্জন-গর্জনের সীমা রহিল না।

ইতিমধ্যে মাসীমা হাস্যোজ্জ্বলমুখে সমাগত হইলেন।—তাঁহাকে দেখিয়া কর্ত্রী মুখ ভারি করিয়া বলিলেন, "হাঁ মা মুক্তো, তোমার আক্কেলখানা কেমন বাছা একটু সকালে ক'রে কি কথা শুনুতে আসা হয় না ? দেখ দেখি, কাঁচা

পোয়াতীরা সব উপোষ পাড়ছে, আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!" মুক্তা মাসী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে একটা 'ফাল্‌তো' কারণ দেখাইয়া রৌদ্রোতপ্ত সানের উপর বসিয়াই ষষ্ঠীর কথা শুনিবার জন্য পরিবারস্থ সকলকে আহ্বান করিলেন। কর্ত্রী, প্রৌঢ়া রমণীগণ, বধূগণ, এমন কি, ছোট ছোট বালকবালিকাগণ পর্যন্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মুক্তা মাসী তাঁহার মাতামহীর নিকট হইতে শীতলা-ষষ্ঠীর দুর্লভ কথা কিরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং এই পুণ্যকথা বিবৃত করিয়া পাড়ায় তাঁহার কিরূপ সম্মান, তাহার বর্ণনা শেষ করিয়া, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"এক গাঁয়ে ছিল এক ঘর গেরস্ত। বুড়ো গেরস্তর বুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুড়োবুড়ী বড় লক্ষ্মীমন্ত ছিল। কিন্তু তাদের মনে একটা বড় দুঃখ ছিল, মা ষষ্ঠীর কৃপায় তারা বঞ্চিত ; তাদের ছেলেমেয়ে ছিল না। কত ষষ্ঠী সুবচনীর পুজো, পীরের দরগায় কত সিন্নি মানত্, কিছুতেই তাদের ছেলে হলো না। বুড়ো নিশ্বাস ফেলে মুখ ভার করে বল্‌তো, 'হায়, হায়, আমার এতটা বিষয় খাবে কে ? বাপ 'বড় বাপে'র জলগণ্ডুষের পিত্যেশ রইল না।' বুড়ী বল্‌তো, 'এমনই কি ভগবানের বিচের, এয়োস্ত্রীরা আমাকে দেখে মুখ বাঁকা ক'রে যায়, ব'লে,—'আঁটকুড়ীর মুখ দেখ্‌লে অমঙ্গল হ'বে!' ওমা ! আমি যাব কোথা ?'

"শেষে ষষ্ঠী ঠাকরুণের দয়ায় বুড়ী 'পোয়াতী' হলো। বুড়োবুড়ীর মনে কত আহ্লাদ ! আহা, যদি এই বুড়ো বয়সে তাদের একটি সোনার চাঁদ খোকা হয়, তা হ'লে সোনার 'টাট' বজায় থাকে। এক মাস যায়, দু' মাস যায়, এমনই ক'রে দশ মাস গেল। একদিন বুড়ো হাট করতে গিয়েছে, এমন সময় বুড়ীর ব্যথা উঠ্‌লো। তাই শুনে পাড়ার বৌ ঝিরা ঝেঁটিয়ে বুড়োর বাড়ী এসে জুট্‌লো,—তার কি ছেলে হয় দেখ্‌তে ; এসে দেখে,—ওমা ! বল্লে না তোমরা বিশ্বাস করবে,—বুড়ীর বুড়ো আঙ্গুলের মত ষাটটি ছেলে হয়েছে ! ছেলেগুলো পিট্-পিট্ করে তাকাচ্চে ! দেখে সবাই বুড়ীকে 'ধিক্' দিতে লাগলো। বুড়ী তখন মনের ঘেন্নায় ছেলেগুলোকে কুলোর উপর সাজিয়ে বাড়ীর পাশে বাঁশতলার ছাই-গাদায় ফেলে দিয়ে এলো।

"হাট ক'রে বুড়ো বাড়ী ফিরে এসে শুন্‌লে, লোকের কথায় বুড়ী ছেলে-গুলোকে ফেলে দিয়ে এসেছে ! একটা ছেলের জন্যে বুড়ো এত কাল 'লালিয়ে' মরেছে, আর ষাট-ষাটটে ছেলে কি না ফেলে দিয়ে এলো ! শুনেই বুড়ো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো। দুঃখে সে গালে মুখে চড়াতে লাগলো ; বুড়ীকে বল্লে, 'ভাল চাস্ ত এখনই ছেলেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে আয় ; তুই কি রাক্ষসী যে, লোকের গঞ্জনা শুনে এমন সোনার চাঁদ ছেলেদের ফেলে দিয়ে এলি ?' কি করবে, সোয়ামীর তাড়ায় বুড়ী ছেলেগুলিকে আবার কুড়িয়ে নিয়ে এলো।

"কত যত্ন, কত 'তাওতে' ছেলেগুলি বড় হতে লাগলো। একা মানুষ বুড়ী, এত ছেলে কি ক'রে মানুষ করে ? তাই সে ছেলেদের জন্যে ষাট জন দাসী রাখ্‌লে।

ছেলেগুলির ছ' মাস বয়স হ'লে বুড়ো ধুমধাম ক'রে তাদের মুখে ভাত দিলে। আগে যারা বুড়ীকে এতটুকু-টুকু ছেলে প্রসব করেছে ব'লে মুখ বাঁকা করেছিল, তারাই আবার বুড়োবুড়ীকে ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর বলে সুখ্যাতি কর্তে লাগলো।

"ছেলেরা বড় হলে বুড়ো তার ষাট ছেলেকে ষাটখানা ঘর বেঁধে দিলে। তার পর ষাটটি ছেলের জন্য ষাটটি টুক্‌টুকে বৌ আনলে। ষাট ছেলে আর ষাট বৌ নিয়ে বুড়োবুড়ী সুখে ঘরকন্না কর্তে লাগলো।

"শীতকালে একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ছেলের বৌরা এক সঙ্গে ব'সে দুঃখ কর্তে লাগলো,—

'আজ যদি মা-বাপের বাড়ী হ'তো,
চাল ছোলা ভাজা হ'তো,
কৈ মাগুরের ঝোল হ'তো,
গরম গরম খিচুড়ী হ'তো,
তা হ'লে মনের খেদ যেতো।'

"বেটার বৌদের এই রকম দুঃখ কর্‌তে শুনে বুড়ী বল্লে, 'আমার বৌ-মাদের যা যা খেতে সাধ গিয়েছে, তাই খাওয়াব ; বাছারা লজ্জায় আমার কাছে কোনও কথা বলে না।' বুড়ী তখন বুড়োকে ব'লে বৌদের জন্যে চাল ছোলা ভাজ্‌লে, কৈ মাগুরের ঝোল রাঁধ্‌লে, গরম গরম খিচুড়ী রেঁধে তাতে এক এক বাটী ঘি ঢেলে তাদের খেতে দিলে। সেদিন যে শীতলা-ষষ্ঠী, তা বুড়ী ভুলে গিয়েছিল। বৌরা মনের সাধে আশ মিটিয়ে খেয়ে সন্ধ্যের পর শুতে গেল।

"তার পরদিন সকাল বেলা চারদিক ফরসা হয়ে গেল। গেরস্তরা উঠে উঠানে ছড়া-ঝাঁট দিলে ; তুলসীতলা নিকোলে ; আস্তে আস্তে রোদ্দুরে আঙিনে ভরে গেল। বুড়োর বেটা, বেটার বৌরা—কেউ জাগলো না ; বুড়ী তাদের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে এক এক বেটার নাম ধ'রে কত ডাকাডাকি কল্লে, কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই ! কে সাড়া শব্দ দেবে ? বেঁচে থাক্‌লে ত দেবে ? শেষে দরজা ভেঙে ঘরে গিয়ে বুড়ী দেখে,—ষাট বেটা, বেটার বৌ, বিছানার উপর মরে পড়ে রয়েছে, এক এক ঘরে ঢোকে, আর বুড়ী আছাড় খেয়ে প'ড়ে চোখের জলে মাটী ভিজিয়ে ফেলে। ষাট ষাটটে বেটা,—বেটার বৌ, তার একটা বেঁচে নেই !

"বুড়ী বেটা, বেটার বৌদের শোকে পাগলের মত হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে শেষে গহন বনে এক বুড়ীকে দেখতে পেলে। বনের বুড়ী তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'কিগো বাছা ! কাঁদ কেন ?' বুড়ী বল্লে, 'আমার কপালের দুঃখুর কথা আর কারে ক'ব বোন ! ষাটটি বেটা ষাটটি বেটার বৌকে জলে দিয়ে আমি পাগল হয়েছি, আমাতে আর আমি নেই।' বনের বুড়ী বল্লে, 'এই জল নিয়ে যাও ; যেতে যেতে একটা বড় ষষ্ঠীগাছ-তলায় এক বুড়ীকে দেখ্‌তে পাবে, তার সর্বাঙ্গ কুড়ীকুষ্ঠতে খ'সে পড়্‌চে—তাকে যদি ভাল ক'রে ধরতে পার, আর তার কৃপা হয়, তা হ'লে তোমার দুঃখু

ঘুচতে পারে। কিন্তু সে যা বলবে, তাই তোমাকে করতে হ'বে, তাকে দেখে যেন 'হেনস্তা' করো না।'—কথা শুনে বুড়ী ছুটে চল্‌লো।

"অনেক ঘুরে ঘুরে বুড়ী দেখ্‌তে পেলে, ষষ্ঠীতলায় সত্যি সত্যি এক বুড়ী বসে রয়েচে,—থুড়থুড়ে বুড়ী, তার সর্বাঙ্গে কুড়ীকুষ্ঠ, ঘা দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে 'রসানি' ঝরছে, গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা পোকা কিল্‌বিল্‌ কচ্ছে ; দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠান ভার।

"বুড়ী তার পায়ের গোড়ায় আছাড় খেয়ে পড়লো, তার পা ধ'রে বল্লে, 'মা ! আমাকে দয়া কর, বড় বিপদে প'ড়ে আমি তোমার চরণতলে এসে পড়েছি ; আমার বেটা,—বেটার বৌদের প্রাণ দাও, শোকে আমি জ্বলে মলাম। অনেক ষষ্ঠী সুবচনীর পুজো ক'রে রাজপুত্তুরের মত ষাটটি ছেলে—রাজকন্যের মত ষাটটি বৌ পেয়েছিলাম—কি পাপ করেছি জানিনে—একদিনে তাদের সকলকে হারিয়েছি, আমার প্রাণ নিয়ে তাদের প্রাণ দাও মা !'

"মণ্ডল গিন্নীর কথা শুনে ষষ্ঠীতলার বুড়ী পা দু'খানা টেনে নিয়ে বল্লে, 'তা আমার কাছে মর্‌তে এসেছিস্‌ কেন ? আমি কি করবো ? তোর বেটা—বেটার বৌরা মলো কি না মলো, তাতে আমার কি গেল এল ? যা, তাদের চাল ভাজা, ছোলা ভাজা, মাগুর মাছের ঝোল, গরম গরম খিচুড়ী খেতে দিগে না ! সব শোক ভাল হয়ে যাবে। পেটের জ্বালায় দেবতা ব্রাহ্মণ পুজো আর্চা কিছু মান্‌তে চাস্‌নে, ভারি তোদের আস্পর্ধা হয়েছে। দেখ্‌ এখন কেমন মজা ! চলে যা এখান থেকে, আমি এখন কি করবো ? আমাকে দিয়ে কিছু হ'বে-টবে না।'

"মণ্ডল গিন্নী কিন্তু কোনও মতে বুড়ীর পা ছাড়লে না, তার পায়ের গোড়ায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলো, কেঁদে বল্লে, 'হেঁই মা, আমি তোমার দুটি পায়ে ধরেছি, আমাকে একটু দয়া কর, আমার বাছাদের বাঁচিয়ে দাও, গেরস্তর ঝি বৌ হয়ে বড় দায়ে পড়েই আমি পথে বার হয়েছি, মা ! আমার লজ্জানিবারণ কর।'

"মণ্ডল গিন্নীর কাকুতি মিনতিতে বুড়ীর দয়া হলো। বুড়ী মণ্ডল গিন্নীকে বল্লে, 'তবে যা, এক হাঁড়ি দই আর হলুদ নিয়ে আয়, যা কর্তে হবে, তা আমি করব।' শুনে মণ্ডলগিন্নী তখনই সেখান থেকে উঠে গিয়ে নূতন হাঁড়িতে ক'রে এক হাঁড়ি সাঁজো দৈ আর গোবর-নেপা কুলোতে এক কুলো হলুদ-গুঁড়ো নিয়ে এলো। বুড়ী বল্লে, 'দুয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে ঢাল্‌ আমার গায়ে !' বুড়ী তাই কল্লে ; তার গায়ের উপর দিয়ে সেই হলুদ মেশান দৈয়ের 'ছেরোত' চল্‌তে লাগলো। তখন বুড়ীর কথামত মণ্ডলগিন্নী সেই ঘা-ধোয়া দৈ আবার হাঁড়িতে ক'রে তুলে নিলে। বুড়ী বল্লে, 'যা, এই দৈ তোর বেটা, বেটার বৌদের গায়ে ঢেলে দিগে, তা হলেই তারা বেঁচে উঠবে। আর দেখিস্‌, কখন যেন শীতলাষষ্ঠীর দিন গরম ভাত তরকারী কিছু খাস্‌নে, কি কাউকে খেতে দিস্‌নে।' মণ্ডলগিন্নী বুড়ীর পায়ে দণ্ডবত ক'রে হাঁড়ি নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

"পথে যেতে যেতে মণ্ডলগিন্নী ভাবলে, বুড়ী যে দৈ দিলে, তাতে মরা প্রাণী

জ্যান্ত হয় কি না, একবার দেখ্‌তে হচ্ছে। এমন সময় সে দেখ্‌তে পেলে, এক মেছুনী এক ঝুড়ি পচা মাছ নিয়ে সেই পথ দিয়ে বাজারে যাচ্ছে ; মণ্ডলগিন্নী মেছুনীকে দাঁড়াতে বল্লে। মেছুনী তার কথায় মাছের ঝুড়ি যেমন নামিয়েছে, অমনি মণ্ডলগিন্নী হাঁড়ি কাত ক'রে তার মাছের ঝুড়িতে খানিক দৈ ঢেলে দিলে,—আর বলব কি মা, বল্‌তে গা শিউরে উঠচে,—পচা মাছগুলো জ্যান্ত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়্‌তে লাগলো!

"মণ্ডলগিন্নী তখন মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে এসে মরা বেটা, বেটার বৌ-গুলির গায়ে সেই হলুদমাখা দৈ ঢেলে ঢেলে দিলে। তখন তারা 'এত বেলা হয়েছে! কি ঘুমই চোখে এসেছিল!' ব'লে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো। 'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলাম, মা না জানি কি মনে কচ্ছেন', ভেবে বৌরা লজ্জায় আর শাশুড়ীর সাম্‌নে আস্‌তে পারে না! মণ্ডলগিন্নী সকলকে ডেকে সব কথা বল্লে। শুনে সকলে ষষ্ঠীর উদ্দেশে প্রণাম কল্লে, বল্লে, 'মা ষষ্ঠী! কলিতে তুমি বড় জাগ্রত দেবতা, তুমি আমাদের মঙ্গল কর মা, আমরা ভাল ক'রে তোমার পুজো দেব।'

"মণ্ডলের ছেলেরা তার পরে খুব ধুমধামে শীতলা-ষষ্ঠীর পুজো কর্তে লাগলো। ষষ্ঠীর দয়ায় তাদের সংসার উথলে উঠ্‌লো। ধুলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হ'তে লাগলো। মণ্ডলের ষাট ছেলে, তাদের আবার কত নাতি পুতি হ'লো। শেষকালে বেটা, বেটার বৌ, নাতি নাতনী সকলকে রেখে, সোয়ামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, মণ্ডলগিন্নী স্বর্গে চলে গেল। তার পরনে কস্তাপেড়ে নূতন শাড়ী, তার সিঁথেয় সিঁদুরের শোভাই বা কত! সতী লক্ষ্মীর সিঁথির সিঁদুর এমনই ডগ্‌ডগ্‌ করে!"

রমণীগণ, এমন কি, বালকবালিকাগণ পর্যন্ত এক স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে এই কাহিনী শ্রবণ করিল। বারোয়ারীতলায় তখন কত ধুমধামে নাচ গান চলিতেছে—সে দিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই ; তাহারা এই সহজ, সরল, অসম্ভব গল্পটিকে প্রাণের মধ্যে সত্যের আসনে স্থান দিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সন্তোষের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিল না।

কিন্তু গৃহস্থরমণীগণ এই কাহিনীশ্রবণে যত আনন্দলাভই করুন, বারোয়ারী-তলায় যাত্রার আসরে আজ যে উদ্দীপনা ও আনন্দের তুফান চলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। দর্শকগণ চারি দিকে কাতার দিয়া বসিয়া গিয়াছে। গোবিন্দপুরের দুই একজন মাত্র লোক পূর্বে মতি রায়ের দলে "ভীষ্মের শরশয্যা"র অভিনয় দেখিয়াছিল ; তাহারা আসরে বসিয়া যাত্রার সমালোচনাতেই সময় কাটাইতে লাগিল, এবং অনেকে গান ফেলিয়া তাহাদের বক্তৃতাতেই মনঃসংযোগ করিল। যাত্রার দলের অভিনেতাদের অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত, দীর্ঘসমাসবহুল, 'নাকি' সুরের বাক্যরসেই অনেকের শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল, এবং ভাবগ্রাহী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শ্রোতারা গানের মাধুর্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আসরের পাশে কাঠরার চারি দিকে কতকগুলি বেঞ্চ, তাহাতে স্থানীয় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের মাস্টার, গ্রাম্য ভদ্রলোক ও তাঁহাদের ছেলেরা নিবিষ্টমনে যাত্রা শুনিতেছেন। মুরুব্বি দলের মধ্যে ঘন ঘন তামাক চলিতেছে,—তিন পয়সা দামের খর্বাকৃতি নূতন থেলো হুঁকোই অধিক ; মাতব্বর লোকেরা দুই একটা বাঁধানো হুঁকো পাইতেছেন ; আসরের মধ্যে বসিয়া গায়কেরা কেহ কেহ মাথা নীচু করিয়া জলহীন হুঁকোয় এক একটা দম্ দিয়া লইতেছে, তাহার পর দণ্ডায়মান হইয়া মুখব্যাদান পূর্বক বিকট চিৎকারে রাগিণী ধরিতেছে,—কাহারও কাহারও দক্ষিণ হস্তে একখানি ময়লা রুমাল—তাহারা হস্ত, মস্তক ও ওষ্ঠের বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া তাল লইয়া লোফালুফি করিতেছে, এবং একজন থামিতে না থামিতে আর একজন কর্ণমূলে প্রসারিত বামহস্ত বিন্যস্ত করিয়া মুখগহ্বর উন্মুক্ত করিয়া অর্ধনিমীলিতনেত্রে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাগিণী ভাঁজিতেছে। অধিকারীর সম্মুখে একখানি বড় পিতলের রেকাব। অন্য দিকে একখানি বিরাট কেতাব—খেরুয়া বাঁধা, এই কেতাবখানিই "ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু গীতাভিনয়"। কাহারও বক্তৃতা মধ্যপথে বাধিয়া গেলে এক জন লোক পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিম্নস্বরে বলিয়া দিতেছে, এবং বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই ছয় জন 'জুড়ি' শামলাবিহীন ছয় জন মোক্তারের মত চোগা-চাপকানে মণ্ডিত হইয়া প্রণপণে চীৎকার করিতেছে, এবং তাহাদের চীৎকারের নিবৃত্তি হইলেই আর এক দল লোক আসরের মধ্যে বসিয়াই সমোচ্চ স্বরে তাহাদের গানের অনুবৃত্তি করিতেছে। গান জমিয়া গেলে শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে ঘন ঘন হরিধ্বনি উঠিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে কেহ রুমালে একটা টাকা বা আধুলি বাঁধিয়া তাহা অধিকারীর রেকাবের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে, রুমালখানি কোন গায়কের গাত্রে বা বাদকের পদমূলে আসিয়া পড়িলে তাহারা তাহা যথাস্থানে সরাইয়া দিতেছে ; তাহার পর টাকা বা আধুলিটি খুলিয়া লইয়া, রুমালখানি যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে নিক্ষেপ করিতেছে। জুড়ির গানের পর বক্তৃতা। বক্তৃতার পর এক প্রকার সাজে সজ্জিত দশ বার জন 'ছোকরা' গান মুখে করিয়া উঠিয়া দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মাথায় জরির তাজ, পরিধানে জরির কারুকার্যখচিত কোট ও হাফ্-প্যাণ্ট, কালো, সবুজ ও লাল রঙের স্টকিং হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়াছে, নানাবর্ণের গার্টার দিয়া তাহা জানুমূলে আবদ্ধ, কটিদেশে রবারনির্মিত কোমরবন্ধ, ইহারা হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া গান ধরিল,—

"বড় আশা ছিল মনে ওহে বংশীধারী !
দাদারে করিয়া রাজা হ'ব ছত্রধারী।
তা তো হ'লো না, হ'লো না ;
এ দুরাত্মা হ'তে তা তো হ'লো না, হ'লো না,
অন্তে পদপ্রান্তে স্থান দয়া ক'রে দিও মুরারি !"

হঠাৎ চাষার দলের সঙ্গে কি একটা কথা লইয়া ভদ্রলোকদের বচসা আরম্ভ

হইল ; দর্শকগণ ভাবিয়াছিল, কলহ সহজেই মিটিয়া যাইবে, কিন্তু কলরব ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল। ভীমসেন তখন সবেমাত্র আসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গোঁফে চাড়া দিয়া, হস্তস্থিত কৃত্রিম গদা স্কন্ধে তুলিয়া, মস্তকের দীর্ঘকেশরাশি আন্দোলিত করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দুর্যোধনের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া, বীরদর্পের সূত্রপাত করিতেছেন, কিন্তু তাহার অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত সেই নকল বীরদর্প আসল বীরদর্পের ভৈরব হুঙ্কারে ডুবিয়া গেল! অগত্যা ভীমসেনকে কিছু কালের জন্য নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত হইল। ইতিমধ্যে আসরে এক কলিকা তামাকুর আবির্ভাব হওয়ায় কালো গর্ণেটের পেণ্টুলন পরা দুর্যোধন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উভয় হস্তে কলিকাটির পুচ্ছদেশ চাপিয়া ধরিয়া তামাকে একটা দম দিয়া লইল!

গোলমাল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া বৈকুণ্ঠ তাহার বেহালাদারকে দুই একটা ভাল গৎ বাজাইয়া গোলমাল থামাইবার জন্য ইসারা করিল।

বৈকুণ্ঠের দলের প্রধান বেহালাদার গণেশ নন্দীর হাত বড় মিষ্ট ; অধিকারীর ইঙ্গিতমাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বুকের কাছে বেহালাখানি চাপিয়া ধরিয়া, মুখের নানারকম ভঙ্গী করিয়া, কখনও ঘাড় বাঁকাইয়া, কখনও মাথা দোলাইয়া, একটি মিষ্ট গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল। বেহালার মিষ্টসুরে অনেকে মুগ্ধ হইল বটে, কিন্তু কলরবের তখনও নিবৃত্তি নাই। কাজেই অধিকারীর আদেশে দুটি ছেলে নাকে ঝুটা নোলক ও মাথায় রুক্ষ পরচুল পরিয়া, পায়ে পিতলের বিবর্ণ ঘুঙুর আঁটিয়া, পুরাতন ঘাঘ্‌রাতে সর্বশরীর আবৃত করিয়া, এবং মাথায় এক একটি মোমের ফুল, লতা, পাতা ও পাখীর পালকে বিজড়িত টুপি পরিয়া আসরে প্রবেশ করিল, এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া, দুই হাত শূন্যে তুলিয়া, কখনও বা এক হাতে চিবুক ও অন্য হাতে কেশের বা ওড়নার অগ্রভাগ ধরিয়া, কটিদেশ মুহুঃ বিকম্পিত করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল, তাহার পর বেহালার সুরে সুর মিলাইয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া গাহিতে লাগিল,—

"বারণ কর লো সই!
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না, বাজে না!
আমরা গোপের বালা
না জানি বিরহ-জ্বালা,
যমুনার জল আন্‌তে যাওয়া সাজে না, সাজে না।"

এই নৃত্য গীতের প্রভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই হট্টগোল থামিয়া গেল! তখন পূর্ববৎ বক্তৃতা ও গান চলিতে লাগিল।

এইদিন বৈকুণ্ঠের দলে যে যতই উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করুক, এবং গানগুলি যতই শ্রবণতৃপ্তিকর হউক, একটি বালকের করুণ কণ্ঠ এই গীতাভিনয়ের উপসংহারকালে দর্শকগণের নয়নে অশ্রুতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের ঘোর যুদ্ধের অবসানে, দশম দিনে, ভীষ্ম শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ; শত্রু মিত্র

সকলে, কুরুকুল ও পাণ্ডবগণ দুই পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বিহ্বলনেত্রে পিতামহ ভীষ্মের এই অচিন্তনীয় পরিণাম নিরীক্ষণ করিতেছেন,—যুধিষ্ঠির তাঁহার রাঙতার রাজমুকুট ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার ললাটস্থিত রক্ত ত্রিবীরেরেখা ঘর্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারারূপে গোঁফের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে ; ভীমের হাতের লৌহগদারূপী কাঠের দামাট-বিশিষ্ট তুলা-ভরা মুগুরটা ভূপতিত ; অর্জুন বাখারী-নির্মিত গাণ্ডীবের উপর ভর দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার নকল সাঁচ্চার পোষাকের ভিতর দিয়া গলদেশবিজড়িত মোটা এক কণ্ঠী কাঠের মালা ও ময়লা শার্টের ঘর্মসিক্ত কলারের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ;—আর অভিমানী রাজা দুর্যোধন একটা পিতলের গাড়ু হাতে লইয়া পিতামহের পিপাসা-নিবারণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন ; এমন সময় দশ বারো বৎসর বয়সের একটি সুশ্রী বালক একখানি লোহিত পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, পুত্রশোকাকুলা আলুলায়িতকুন্তলা ভীষ্মমাতার বেশে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল, এবং রণশ্রান্ত শরাঘাতজর্জরিত, ইহলোকের প্রান্তোপনীত, শর-শয্যায় পতিত বীরের শীর্ণদেহ ও বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকম্পিত করুণকণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

"মরি রে মরি, প্রাণকুমার আমার !
এ দশা তোর কে করিল ?
এই বিশ্ব-মাঝে কোন পাষণ্ড
আমার ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচা'ল ?
জানি রে তোর ইচ্ছা-মরণ,
তবে এ দশা তোর কিসের কারণ ?
ওরে জীবন-ধন !
অভাগিনীর অঞ্চলের নিধি
কোন দস্যুতে হ'রে নিল ?"

এই গানে শ্রোতৃগণের হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল ; তাহারা সকলে আপনার কথা ভুলিয়া এই তুচ্ছ যাত্রা ও তাহার নগণ্য গায়কবর্গের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া সেই সুরনরবন্দনীয়া পতিতপাবনী ভগবতী জাহ্নবী ও তাঁহার দেবব্রত মহাবীর পুত্রের এই অন্তিম মিলনের মর্মান্তিক বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিল। পুত্রের বিপদে মাতার এই আকুলতা, এই নিদারুণ মর্মোচ্ছ্বাস, এই বিলাপ ও পরিতাপ কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার বিচার করিবার কাহারও তখন অবসর ছিল না,—কেবল বিষাদাপ্লুত সঙ্গীতের সেই সুকোমল সুরে, পুত্র-শোকে মুহ্যমান মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত গভীর বেদনা পরিস্ফুট হইয়া চরাচরের সুপ্ত পুত্রস্নেহকে যেন সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল ; দর্শকগণের কঠোর সমালোচনা, বিরাগপূর্ণ ভ্রূকুটী ও অশ্রদ্ধার হাস্য—এইরূপে সমবেদনার অশ্রুপ্লাবনে ধৌত করিয়া, যাত্রার দলের অধিকারী দর্শকগণের হৃদয়ে পৌরাণিক যুগের গৌরবময়

আসন সংস্থাপিত করিয়া, "ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু" পালার উপসংহার করিল।

যাত্রাশেষে অধিকারী গোবিন্দপুরের বড়বাজারের পান্ডাদের স্তুতিসূচক সদ্যোরচিত দুই-একটা 'বোটকেরী' গান গাহিয়া সকলকে তৃপ্ত করিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবে, এমন সময় সং-এর ফরমাইস হইল। "সং আস্‌চে, সং আস্‌চে!" শব্দে একটা মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। সকলে উঠিবার আয়োজন করিতেছিল—সং দেখিবার আশায় আবার জাঁকিয়া বসিল। আবার নবোৎসাহে বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল।

মজুমদারদের মেজবাবু গ্রামের অন্যতম জমীদার চাটুয্যেদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। চাটুয্যেরা খুব বড় কুলীন বলিয়া সমাজে সুপরিচিত। তাই তাঁহাদের প্রতি অভদ্র ইঙ্গিতের অভিপ্রায়ে মেজবাবুর পরামর্শে "কুলীনের চক্ষুদান" নামক সং-এর অবতারণা করা হইল। যাত্রার দলের সং—তাহার রসিকতা ও সুরুচিপূর্ণ বাক্যকৌশল উভয়ই অনুপম, কিন্তু সেই সং-এর বাঁদরামী দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরের ভদ্রাভদ্র সকল লোক,—এমন কি, পিতাপুত্র একত্র উপবিষ্ট! অনেকেই দুই-চারিটি স্থূলরসিকতা শুনিয়া মুখবিবরে আর হাসি আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, দংষ্ট্রাপংক্তি উদ্‌ঘাটিত করিয়া হাসিতে হাসিতে আসরে প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে। বড়বাজারের অন্যতম পান্ডা সং-এর রসিকতায় আত্মহারা হইয়া মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"সার্থক মেজবাবুর অর্থব্যয়, এই এক সং-এই তাঁর মান বজায় রেখেছে!" শুনিয়া চাটুয্যেদের দলস্থ দুই চারি জন চাটুকার শ্রোতার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরেই বংশমঞ্চের উপর সমুপবিষ্ট নহবতের দল একবার বাঁশী, কাঁশি ও ঢোলক বাজাইয়া যাত্রাভঙ্গের সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচার করিয়া দিল। তাহার পরই, নহবৎ থামিতে না থামিতে, ঢোল বাজাইয়া মহা উৎসাহে সং-এর নাচ আরম্ভ হইল। এ যাত্রার সং নয়, মাটীর সং। যাত্রার আসরের কয়েক শত হস্ত দূরে একটি স্থান চাটাইয়ের বেড়া দিয়া উঁচু করিয়া ঘেরা হইয়াছে। এই ঘেরের মধ্যে অদৃশ্য-হস্ত-পরিচালিত সং-এর নাচ আরম্ভ হইল: ঘেরের বাহিরে দর্শকদল ঊর্ধ্বমুখে অবস্থান করিতেছে, সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি যেন মূর্তিমতী হইয়া তাহাদের আগ্রহতৃষাতুর নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে।

প্রথমেই বিদ্যাসুন্দরের হীরামালিনীর সং, বকুলতলায় গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দরের সহিত হীরার রহস্যালাপ, ক্রমে সন্ন্যাসিবেশে সুন্দরের রাজসভায় আগমন ও মাথা নাড়িয়া আত্মপরিচয়-প্রদান। পাঞ্চাল-রাজসভায় নীলবর্ণ অর্জুনের মৎস্য-চক্রভেদ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজগণের তুমুল বচসা, কীচকের সহিত ভীমের মল্লযুদ্ধ; উত্তরগোগৃহে বৃহন্নলারূপী অর্জুনের যুদ্ধ-যাত্রা ও প্রাণভয়ে কম্পমান উত্তরের পলায়নাভিনয়—প্রভৃতি নানা বিচিত্র দৃশ্য দর্শকগণের সম্মুখে দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইল। উল্লেখযোগ্য সংগুলির মধ্যে একটি সং-এ বৌবাজারের বারোয়ারীর পান্ডাদের প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ ছিল; বৌ-

বাজারের দলপতি হরিশ হালদার ও তাহাদের গানের ওস্তাদ নিমচাঁদ বিশ্বাস রূপী দুটি মৃণ্ময়মূর্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছে ; খেলার উৎসাহে খেলোয়াড়-দ্বয়ের কাছা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একজনের হাতে একটি ডাবা হুঁকো, একটি দুষ্ট ছেলে অতিসন্তর্পণে তাহার পশ্চাতে আসিয়া হুঁকো হইতে কলিকাটি অপসারিত করিতেছে, কিন্তু ক্রীড়ামগ্ন বৃদ্ধের সে দিকে লক্ষ্য নাই, সে ললাটের চর্ম কুঞ্চিত করিয়া বিকটমুখভঙ্গীসহকারে 'বড়ে' টিপিতেছে, আর তাহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীটি এত মনোযোগের সহিত চাল লক্ষ্য করিতেছে যে, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একটি ছেলে তাহার দীর্ঘ স্থূলাকার টিকিটি বামহস্তে আয়ত্ত করিয়া একখানি কাঁচির সহায়তায় তাহার মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত !

সুদীর্ঘবংশদণ্ডবিশিষ্ট মোটা মোটা টিনের ল্যাম্প হইতে ধূমবহুল কেরো-সিনের আলোক ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন গোধূলির আলোক সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিল ; তখনও বারোয়ারীতলায় জনসমাগমের বিরাম নাই ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একই ভাবে ঢোলক বাজিতেছে, আর পুতুল-নাচের দল ক্রমাগত তাহাদের কর-ধৃত সংগুলিকে অদৃশ্যসূত্র-পরিচালনে সুকৌশলে নাচাই-তেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে গান গাহিয়া সং-এর ইতিহাস বর্ণনা করিতেছে। তাহাদের গীতধ্বনি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মিশিয়া যাই-তেছে,—উৎসবের চঞ্চল আলোকশিখাগুলি দূর হইতে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত মানবমণ্ডলীর আনন্দোচ্ছ্বাসের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে, তাহারাও নাচের তালে তালে হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে।

কিন্তু গ্রামের বাহিরে দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাসন্তী ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা পশ্চিম গগন হইতে ম্লানরশ্মিজাল বিকীর্ণ করিতেছে, নৈশ কুয়াসার শুভ্র যবনিকা ভেদ করিয়া এই হিমযামিনীর কম্পমান বক্ষে তাহার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট হইতেছে না। চৈতালী ফসলের ছোট ছোট শ্যামল পল্লবদলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পরিপূর্ণ, এবং এই ক্ষীণচন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশায় তাহা প্রকৃতি রাজ্ঞীর হরিৎ বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রামপ্রান্তস্থ মেঠো রাস্তার ধারে খর্জুরবৃক্ষশ্রেণীর অস্ত্রাহত উচ্চ স্কন্ধ হইতে বিন্দু বিন্দু রস ক্ষরিত হইয়া তাহাদের কণ্ঠলগ্ন কলসীতে সঞ্চিত হইতেছে। গোপপল্লীর গোয়াল-ঘর হইতে 'সাঁজালে'র প্রচুর ধূম উদ্গত হইতেছে ; শ্রমজীবিগণ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বসিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। গোপবধূগণ কেহ 'সাঁজা' দিয়া দৈ পাতিবার আয়োজন করিতেছে, কেহ বা ময়লা ছেঁড়া কাঁথার উপর আপনার শিশুপুত্রটিকে শয়ন করাইয়া অর্ধশায়িত হইয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে মৃদুস্বরে সুর করিয়া বলিতেছে,—

"খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো,
বর্গী এলো দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে ?”

এবং পথিপ্রান্তস্থ পল্লীবিলাসিনীর পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর হইতে কোন হতভাগিনী তানলয়হীন তীব্র কণ্ঠধ্বনিতে সেই সুপ্তপ্রায় শান্তিময় নৈশপ্রকৃতির সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গায়িতেছে,—

“তামাক খেয়ে গেলে না বঁধু হে !
কত দুঃখ মনে যে বল,
ঐ যে চাঁদের পাশে তারা হাসে,
তেঁতুল-পাতা শুকালো।
মরা গাঙে কুমীর ভাসে, শুকায় সুঁদীর ফুল,
এই ভরা বয়সে হলেম রাঁড়ী,
বঁধু ! যৌবনে ফুট্‌লো ফুল,
ও পরাণবঁধু—বঁধু হে !”

দোলযাত্রা

ফাল্গুন মাস। নববসন্তে পল্লীপ্রকৃতি অতি অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। মাঠে রবিশস্য পক্কপ্রায়। কোথাও বিস্তীর্ণ অড়হরের ক্ষেত্র, গাছগুলি ফলভারে ঈষৎ অনবত। কোথাও সৌরকরদীপ্ত হেমাভ ছোলার ক্ষেত্রে ছোলাগুলি পক্কপ্রায় হইয়াছে, রাখালেরা দূর মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া আলের ধারে খড়ের আগুন জ্বালিয়াছে, সেই আগুনে কতকগুলি পরিপুষ্ট-ফলপূর্ণ ছোলার গাছ অর্ধদগ্ধ করিয়া ছোলার 'হোরা' করিতেছে। কাঁচা অর্ধদগ্ধ ছোলার নাম ছোলার 'হোরা',—হোরা রাখাল ও পল্লীবালকগণের অতি মুখরোচক খাদ্য। মাঠের মধ্যে কোথাও লংকা-মরিচের ক্ষেত, কৃষকেরা সুপক্ক লংকা তুলিয়া প্রান্তরমধ্যে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে, বহু দূর হইতে সেই সকল লংকাস্তূপ সুলোহিত পুষ্পরাশির ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে,—এই সকল স্তূপের অদূরে বসিয়া পূর্ববঙ্গের ব্যাপারীরা লংকার দর লইয়া কৃষকগণের সহিত বাদানুবাদ করিতেছে। মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটা কুলগাছ ; কুল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, তথাপি কুলতলায় পল্লীবালকের অভাব নাই ; যে দুই পাঁচটি সুপক্ক কুল পত্ররাশির মধ্যে ঝুলিতেছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তাহারা মহা উৎসাহে 'এড়ো' চালাইতেছে ; দৈবাৎ দুই একটা কুল বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িলে সকলে তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য বৃক্ষমূলে জটলা করিতেছে ; কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া ফেলিয়া হাত বাড়াইয়া কুলটি তুলিয়া লইতেছে, ইতিমধ্যে আর একজন তাহার পশ্চাতে আসিয়া অতর্কিতভাবে হাতে থাবা দিয়া কুলটি কাড়িয়া লইয়া মুখে পুরিতেছে, চতুর্থ বালক তাহার উভয় গাল সজোরে টিপিয়া ধরিয়া তাহার মুখবিবর হইতে কুলটি বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে ! এইরূপ দ্বন্দ্বকোলাহলে কুলতলা সজীব হইয়া

উঠিয়াছে।

অদূরে একটা দীঘি। দীঘিতে অল্প জল আছে, তাহা অতি স্বচ্ছ; হেলঞ্চা কল্‌মীতে তাহাও আচ্ছন্নপ্রায়, দুই একটি শুভ্রপক্ষ 'পরম ধার্মিক' বক দীঘির ধারে ধীর পদবিক্ষেপে মৎস্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত। অপরাহ্ণকাল সমাগত। অস্তগামী তপনের লোহিত রশ্মিজাল দীঘির পাড়ের খর্জুরবৃক্ষগুলির শিরোদেশে রক্তিম আভা বিকীর্ণ করিতেছে। চাষার ছেলেরা প্রভাতে খেজুর গাছের গলদেশে যে বাঁশের চোঙগা বাঁধিয়া গিয়াছিল, তাহা খুলিয়া লইবার জন্য গাছে গাছে ঘুরিতেছে; এই রস জ্বাল দিয়া তাহারা গুড় প্রস্তুত করিবে।

গোবিন্দপুরের পাকা রাস্তা এই দীঘির পাশ দিয়া, দুই পাশের আম্রকাননের ছায়ার ভিতর দিয়া, গ্রামপ্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর তীরে আসিয়া মিশিয়াছে। নব বসন্তের ঈষৎ-উত্তপ্ত সমীরণহিল্লোল নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের গন্ধ বহিয়া চতুর্দিক সৌরভাকুল করিতেছে; বৃক্ষশাখায় বসিয়া কোকিল কুহুস্বরে গান করিতেছে; শ্যামা শিস্ দিতেছে; পাপিয়া তাহার সুমিষ্ট স্বরলহরীতে নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া মুক্তপক্ষে উড়িয়া যাইতেছে। নির্মল নদীবক্ষে লোহিত মেঘের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তীরে শ্যামল তৃণদলের উপর খঞ্জন পক্ষী পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া বিচরণ করিতেছে। জীর্ণ খেয়া নৌকায় কত স্ত্রী-পুরুষ নদী পার হইতেছে,—কাহারও ক্রোড়ে একটি এক বৎসরের শিশু—গলায় রূপার হাঁসুলি, কোমরে রূপার কোমরপাটা, এবং পায়ে চারিগাছি 'ক্ষয়া' মল; কাহারও স্কন্ধে গুড়ের হাঁড়ি, কেহ একটি অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া দণ্ডায়মান, কোন ব্যক্তি তাহার প্রভুর নব জামাতার জন্য প্রেরিত দোলের 'তত্ত্ব' লইয়া নৌকার মাচানের উপর উপবিষ্ট, মাঝি নৌকার মাথায় বসিয়া নির্বিকারচিত্তে 'লগি' দিয়া নৌকা ঠেলিতেছে, নৌকা মন্থরগমনে পরপারে চলিয়াছে। নির্মল জলের মধ্যে শ্যামল শৈবালরাশি দেখা যাইতেছে, দুই একটা 'বেলে' 'পুটী' 'কাঁক্‌লে' মাছ জলমগ্ন শৈবালদলের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পল্লীযুবতীগণ গা ধুইয়া জলপূর্ণ পিতল কলস কক্ষে লইয়া, সিক্তবস্ত্রে বক্ষ আবৃত করিয়া রঙীন গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া চঞ্চলপদবিক্ষেপে গৃহমুখে চলিয়াছে। গোধূলির ছায়ায় প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে তাহারা মুক্তকণ্ঠে হাসিতেছে, মলের রুণুরুণু শব্দের সহিত সেই হাসির ধ্বনি মিশিয়া বসন্তের সৌন্দর্য আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। গ্রামের ছেলেরা নদীতীরে দাণ্ডাগুলি খেলিতেছে, ছোট ছোট তরীগুলি যাত্রী লইয়া নদীজল আলোড়িত করিয়া গ্রামান্তরে চলিয়াছে, একখানি নৌকার ছৈয়ের ভিতর হইতে একটি নববধূ অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া সতৃষ্ণনয়নে তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে চাহিতেছে, নববিবাহিত জীবনের উদ্বেলিত লজ্জা তাহার লাবণ্যমণ্ডিত সুকোমল গণ্ডে রক্তিম আভা বিকাশ করিতেছে, এবং প্রিয়জনবিরহবেদনা সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের ন্যায় তাহার মুখখানির উপর পাণ্ডুর শ্রী ঢালিয়া দিয়াছে।

ক্রমে নদীর জলে অন্ধকার নামিয়া আসিল। বৃক্ষপত্রে, লতাগুল্মে, প্রান্তর-

প্রান্তে দুই চারিটি খদ্যোতের মৃদু দ্যুতি প্রকাশিত হইল। আকাশ হইতে একটি তারকা ম্লান নেত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্বচ্ছ সলিলদর্পণে আপনার প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দিরে তুমুলশব্দে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। আজ শুক্লা চতুর্দশী, গোবিন্দদেবের দোলের অধিবাস ; কাল বাসন্তী পূর্ণিমা, দোলযাত্রা।

মধ্যাহ্নকালেই গোবিন্দপুরের সান্নিহিত বিভিন্ন গ্রামের বিগ্রহগুলিকে তাঁহাদের পীঠস্থান হইতে গোবিন্দদেবের পূজার দালানে আনা হইয়াছে। চারি জন বাহক এক এক বিগ্রহের সিংহাসন বহন করিয়া আনিয়াছে। কোন কোন ঠাকুর আট দশ ক্রোশ দূর হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাহক-সংখ্যা অধিক, সঙ্গে দুটি ঢাক, একখানি কাঁশি, কোন কোন ধনবানের দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিগ্রহ অধিকতর আড়ম্বরের সহিত আসিয়াছেন, তাঁহাদের বাদ্য—ঢোল, ঢাক, কাঁশি, ডগর ও সানাই।

অপরাহ্নে গোবিন্দদেবের বিস্তীর্ণ অঙ্গন উৎসবপূর্ণ হইল। বিভিন্ন গ্রামের 'চোদ্দ ঠাকুর' চতুর্দশখানি সিংহাসনে 'বার' দিয়া বসিয়াছেন, ঠাকুরদের নানাবিধ নাম, কেহ মদনমোহন, কেহ গোপাল, কেহ গোপীনাথ, কেহ রাধাবল্লভ, কেহ বা নারায়ণ নামে পরিচিত ; কেহ প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটি লাড়ু লইয়া উভয় জানু ও বামহস্তে ভর দিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ স্বর্ণাভরণে মণ্ডিত ; কেহ ত্রিভঙ্গভাবে দণ্ডায়মান, পদতলে অলক্ত, অধরে মুরলী, বঙ্কিম চূড়ায় শিখি-পুচ্ছ, পীতধড়ায় কটিতট বেষ্টিত—বিভিন্ন ভঙ্গীর ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্তি। সিংহাসনগুলির কোনখানি বৃহৎ, কোনখানি সোনালি বা রূপালি রাঙতা দ্বারা সুসজ্জিত, কোনখানি বা পীত বা লোহিত বস্ত্রে আবৃত, কোনখানি শুভ্র কাঠ-মল্লিকা, জুঁই, বেল বা পীতাভ চম্পকপুষ্পে ভূষিত। সভার মধ্যস্থলে সিংহাসনে গোবিন্দদেব লাড়ুগোপালের ন্যায় উপবিষ্ট ; তাঁহার ললাটে ও কপোলে অলকা তিলকা অঙ্কিত, তিনটি শিখিপুচ্ছ অলকগুচ্ছের সহিত সুবর্ণফলকে আবদ্ধ। আজ তাঁহার পরিধানে পীতধড়া, সর্বাঙ্গে স্বর্ণভূষণ, মস্তকের উপর রৌপ্য-নির্মিত রাজছত্র, রৌপ্যসিংহাসনস্থ শয্যার চতুর্দিকে পীত মখমলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগোল উপাধান। অন্যান্য বিগ্রহের অধিক পরিচ্ছদপারিপাট্য নাই, তাঁহারা গণ্ড-গ্রামের দেবতা, রাজ-পারিষদবর্গের ন্যায় তাঁহারা গোবিন্দদেবের পার্শ্বদেশে শোভা পাইতেছেন।

গোবিন্দদেবের আঙিনাখানি আজ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। প্রতি দ্বারে কুশনির্মিত রজ্জুতে আম্রপত্র ও সোলার কদম্ব ফুল দুলিতেছে, আঙিনার প্রবেশ-দ্বারে একটি সুদৃশ্য তোরণ, দেবদারু ও কামিনীপত্রে ভূষিত, তাহার উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষের শ্রেণী, আঙিনাখানি আচ্ছাদিত করিয়া শুভ্র চন্দ্রাতপ ঊর্ধ্বে প্রসারিত, তাহার চারি কোণে ও মধ্যস্থলে লোহিতবস্ত্র পদ্মাকারে কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে, মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট পদ্মটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, চন্দ্রাতপের

একধারে তাহার অধিকারীর নাম, ধাম ও চন্দ্রাতপ-নির্মাণের সন তারিখ বর্ণা-শুদ্ধির দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে! বাঁড়ুয্যেদের বড় সরীক সূর্যকুমার বাবু এই চন্দ্রাতপ নির্মাণ করাইছিলেন, চন্দ্রাতপের এক প্রান্তে তাঁহার নাম লেখা —"শ্রীজুৎ শুর্জ্জ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।" একালের লোকে এই বানানের মধ্যে অনেকখানি 'ওরিজিনালিটী' দেখিতে পায়!

সমস্ত আঙিনাখানি গোময়ানুলিপ্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেলা যত শেষ হইয়া আসিল, ততই সেখানে গ্রামের বালক যুবক বৃদ্ধগণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; পল্লীরমণীগণ অন্দরের পথ দিয়া চিকের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ীর পাশে একটি ছোট অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে বসিয়া বাজন্দারেরা অধিবাসের বাজনা বাজাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা গাঢ় না হইতেই বাঁড়ুয্যে-বংশধরগণ—পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, ভাগিনেয়েরা পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক স্থূল তুলসীমাল্যে কণ্ঠের শোভাবৃদ্ধি করিয়া মুক্তপদে আঙিনায় সমবেত হইলেন। তাঁহাদের কাহারও অঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম ও চরণাঙ্কিত রেশমী নামাবলী, কাহারও দেহে রেশমী দোবজা বা সুচিকণ রাম-পুরে চাদর, কাহারও মাথায় টিকি, কাহারও দাড়িগোঁফ কামান, প্রায় সকলেই সর্বাঙ্গে তিলকচন্দনের ছাপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পাছে এই মোহরাঙ্কিত অঙ্গ-শোভা সাধারণের দৃষ্টিপথে না পড়িয়া ব্যর্থ হয়, এই আশঙ্কায় অনেকে সাবধানে সর্বাঙ্গ অনাবৃত রাখিয়াছেন! নামাবলী বা দোবজাখানি হয় মস্তকে, না হয় কটি-দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছে! কাহারও স্কন্ধে খোল ঝুলিতেছে, কেহ করতাল, কেহ কাঁশর, কেহ বা রামশিঙা লইয়া সংকীর্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; প্রাচীন মহাশয়েরা গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন ভক্তিবিহ্বলদৃষ্টিতে দেবদর্শন করিতেছেন।

বাবুরা আজ সংকীর্তনে বাহির হইবেন। আজ নগর-সংকীর্তন,—অসাধারণ দৃশ্য, তাহার উপর বাবুদের দল। গ্রাম্য পথের দুই পাশে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাঙ্গণতলেও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছে; সংকীর্তনের আভাস পাইবামাত্র ঢক্কাধ্বনি থামিয়া গেল। চারিখানি মৃদঙ্গের 'ভুজ্‌তাভুজাং' শব্দ তাহার স্থান অধিকার করিল। সূর্যকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন বাবু সংগীত-রচনায় সুনিপুণ, অদ্যকার এই নগর-সংকীর্তনের জন্য তিনি নূতন গান রচনা করিয়াছেন, নবীন বাবুর হস্তে একখানি কাগজ, তাহাতে গানটি লেখা আছে। নবীন বাবু গান ধরিলেন,—

"আনন্দবদনে সবে হরি হরি বলো।
হরি ব'লে বাহু তুলে রাধার কুঞ্জে চলো॥
(শ্রীরাধার কুঞ্জে হে)
(মাখি' হরিপদ-রজো হে)"

সঙ্গে সঙ্গে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ,—প্রায় বিশ জন গায়ক দক্ষিণ বাহু উৎক্ষিপ্ত

করিয়া মুখব্যাদান পূর্বক সমস্বরে গাহিতে লাগিল, "মাখি' হরিপদ-রজো হে!" চারি দিকে দর্শকগণ উন্নমিত দক্ষিণহস্তের তর্জনী ঘুরাইয়া প্রেমভরে যুগপৎ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, "কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ ক'রে একবার হরি হরি বলো।" মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবর্ধন দাস ভাবাবেশে বিভোর হইয়া চিন্তামণি অধিকারীকে আলিঙ্গন করিতে গেল; চিন্তামণির বোধ করি তখনও তেমন ভাব লাগে নাই, সে দুই হাতে গোবর্ধনকে সরাইয়া দিয়া গান করিতে লাগিল। সংকীর্তনকারিগণ নাম গাহিতে গাহিতে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া দেউড়ীর বাহিরে আসিল। চারি চারি জন বাহক গঙ্গোদকে দেহ পবিত্র করিয়া এক এক ঠাকুরের সিংহাসন স্কন্ধে লইয়া সংকীর্তন-দলের অনুবর্তী হইল; ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশী, ডগর, কাড়া উচ্চনাদে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল।

বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ফটকের বাহিরে বিস্তীর্ণ ফাঁকা ময়দান। রথ ও দোল উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। এই মাঠের এক প্রান্তে একটি ইষ্টকনির্মিত দোলমঞ্চ। মঞ্চটি খুব প্রাচীন, কিন্তু উৎসব-উপলক্ষে তাহা চুনকাম ও সুসজ্জিত করা হইয়াছে। আজ রাত্রে আলোকদামে ইহা অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। নিকটে কতকগুলি 'মৈ-মশাল', সোলার ফুলবাগান, অভ্রের ঝাড় শ্রেণীবদ্ধ বাহকস্কন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছিল—একজন চাষা কতকগুলি খাস ও নিশান স্কন্ধে লইয়া গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান ছিল,—সংকীর্তনকারিগণ বাহিরে আসিবামাত্র ছোটবাবুর হুকুম অনুসারে সকলে সমতালে পা ফেলিয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইল। প্রত্যেক ঠাকুরের সিংহাসনের দুই পাশে বড় বড় মশাল জ্বলিতে লাগিল, দীপক ও রঙমশালের লাল, সবুজ ও শুভ্র আলোকে রাজপথ রঞ্জিত বোধ হইল,— শুক্লাচতুর্দশীর চন্দ্রের সুধাধবল নির্মল কিরণ ম্লান হইয়া গেল।

বোসপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, আচার্যপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়ার ছেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিংহাসনে মাটীর গোপাল বসাইয়া সেই সকল সিংহাসন লইয়া এই উৎসবদলের সহিত সম্মিলিত হইল। গ্রামের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া যে পথ আছে, সেই পথে উৎসবের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তেমাথা বা চৌমাথা পথে, রমণীগণ কেহ ছেলে কোলে লইয়া, কেহ পার্শ্ববর্তিনী ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া, কেহ বা কোনও বর্ষীয়সী রমণীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া, ঊর্ধ্বমুখে সিংহাসনারূঢ় ঠাকুরদের শ্রীমুখ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; যেমন একখানি সিংহাসন তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, আর অমনই তাহারা দক্ষিণহস্তে ললাটস্পর্শ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। সংকীর্তনের দল চলিয়া গেলে বৃদ্ধারা পথের উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সংকীর্তনকারিগণের পদস্পর্শপূত পথের রজ ভক্তিভরে কণ্ঠে, ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পৃষ্ট করিতেছে।

গ্রামের অর্ধাংশ প্রদক্ষিণ করিয়া ঠাকুরের বাহকগণ ও সংকীর্তনের দল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; আচার্যপাড়ার হরিশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে গোবিন্দদেব ও তাঁহার সহচরবৃন্দের ভোগ ও বিশ্রামের আয়োজন ছিল। হরিশ চক্রবর্তী বাঁড়ুয্যে

বাবুদের কুলপুরোহিত, বাঁড়ুয্যেরা তাঁহার পূর্বপুরুষগণকে অনেক ব্রহ্মোত্তর জমী দান করিয়াছিলেন, সেই অধিকারে বহু পূর্ব হইতে দোলের অধিবাসের দিন গ্রামপ্রদক্ষিণকালে গোবিন্দদেব ও তাঁহার সহচরবৃন্দ চক্রবর্তী-বাড়ীতে পদার্পণ-পূর্বক কিছুকাল বিশ্রাম করেন। হরিশ চক্রবর্তীর ব্রাহ্মণী সর্বমঙ্গলা দেবী প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণের সহায়তায় আজ সমস্ত দিন ধরিয়া দেবাভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। সর্বমঙ্গলা দেবী আজ উপবাসিনী আছেন, দেবতাদের 'বৈকালী'র পর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

উৎসবের দল চক্রবর্তী বাড়ীর সন্নিকটবর্তী হইল। বাহকগণ লম্বা 'খড়ো' আটচালার মধ্যে দেবসিংহাসনগুলি রাখিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ললাটের ঘর্মমোচন করিতে লাগিল। সংকীর্তনকারিগণ সমস্ত পথ নাম গাহিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, শেষবার তাঁহারা খুব দ্রুততালে উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত গানটা গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গাহিয়া ফেলিলেন। 'খুলী' মাথা নাড়িয়া টিকি দুলাইয়া কুঞ্চিত ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া তাহার কণ্ঠবিলম্বিত মৃদঙ্গে বহু ভঙ্গিতে অঙ্গুলি তাড়না করিতে লাগিল, কটিপরিবেষ্টিত উত্তরীয়প্রান্ত মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, উভয় পদের ব্যবধান ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ঘর্মধারায় ললাটের চন্দন, নাসিকার তিলক, বাহুমূল ও বক্ষঃস্থলের 'পদাঙ্কচিহ্নে'র স্রোত চলিতে লাগিল। গায়কগণ উভয় বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে লম্ফঝম্ফে উৎসবপ্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। তখন গান চলিতেছিল,—

"হরি ব'লে আমার গৌর নাচে!
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে!"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গীতবাদ্য থামিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক হইতে শতকণ্ঠে হরিধ্বনি হইল।

এইবার 'বৈকালী'র আয়োজন। দশ বারো জন ব্রাহ্মণতনয় বড় বড় রেকাবে কমলা লেবু, আক, ক্ষিরে, পেয়ারা, শাঁক-আলু, আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি ফলমূল ও নানাপ্রকার 'ভিজে' সাজাইয়া আনিল ; ছানা, ক্ষীর, সর, দুধ, কাঁচাগোল্লাও থরে থরে সজ্জিত হইয়া আসিল ; কয়েক জন পুরোহিত দুই একটি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র আওড়াইয়া ও কয়েকটা করিয়া ফুল ফেলিয়া এই সকল ফলমূল মিষ্টান্ন ঠাকুরদের নিবেদন করিয়া দিল।

ঠাকুরের ভোগ শেষ হইলে সংকীর্তনকারিগণ সারি বাঁধিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন। বড় বড় পাথরের খোরায় চিনির সরবৎ ছিল ; মাটীর গেলাসের এক এক গেলাস সরবৎ, বাতাসা, মোণ্ডা ও ফলমূলাদি উদরসাৎ করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সিংহাসন আবার বাহকগণের স্কন্ধে উঠিল, জোরে জোরে ঢাক, ঢোল, ডগর, কাড়া বাজিতে লাগিল ; আবার নূতন সংকীর্তন আরম্ভ হইল,—

"হরিনাম কি মধুর নাম!
নাম শুনে প্রাণ শীতল হলো রে!
কি মধুর নাম!
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে,
কি মধুর নাম!
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল,
কি মধুর নাম!
এ নাম জীব তরাতে এসেছে রে!
কি মধুর নাম!"

এই সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইল। অবশেষে উৎসবের দল দোলমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া থামিল ; বহুলোকসমাগমে দোলমঞ্চ ও তাহার চতুর্দিক সরগরম হইয়া উঠিল।

অনন্তর বাহকগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সেই চতুর্দশ বিগ্রহের সিংহাসনগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে স্কন্ধে লইয়া গোবিন্দদেবের দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। গোবিন্দদেব স্বয়ং সকলের পশ্চাতে থাকিয়া বাহকস্কন্ধে দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিলেন। গ্রামস্থ রমণীগণের সমাগমে মঞ্চটি পরিপূর্ণ। তাহারা দোলমঞ্চের উপর হইতে ও পুরুষ দর্শকগণ মঞ্চের নীচে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে উৎসব দেখিতে লাগিল। সাতবার মঞ্চ প্রদক্ষিণ করা হইলে ভিন্ন গ্রামের বিগ্রহগুলিকে গোবিন্দ-দেবের সুবিস্তীর্ণ দালানে বিশ্রামার্থ লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু গোবিন্দ-দেবকে বাহিরেই থাকিতে হইল, তাঁহার অধিবাসের সকল অনুষ্ঠান তখনও শেষ হয় নাই।

দোলমঞ্চের অদূরে একটি 'নেড়া' প্রস্তুত ছিল। এই নেড়াটি একটি অদ্ভুত পদার্থ, অনতিদীর্ঘ কঞ্চি-সমন্বিত একটি শুষ্ক বংশখন্ড আগাগোড়া কতকগুলি খড় দড়ি দ্বারা বিজড়িত হইয়া 'নেড়া' নামে আখ্যাত হয়। গোবিন্দদেব যতক্ষণ দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, ততক্ষণ কয়েকটি দীপক ও রঙমশাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল ; তাঁহার মঞ্চ প্রদক্ষিণ শেষ হইবামাত্র এক জন মশাল-ধারী সেই 'নেড়া'র খড়ে মশালের আগুন ধরাইয়া দিল। অগ্নিস্পর্শমাত্র শুষ্ক খড় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাহকগণ গোবিন্দদেবের সিংহাসনখানি সেই প্রজ্বলিত নেড়ার চতুর্দিকে সাতবার ঘুরাইল। 'নেড়াপোড়া' শেষ হইলে গোবিন্দ-দেবকে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার দালানে লইয়া যাওয়া হইল।

এইবার অগ্নিক্রীড়া। একজন মালাকর একটি জ্বলন্ত পলিতা লইয়া চক্রা-কারে রক্ষিত ভুঁইচাঁপা ও তুবড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিল ; মহাবেগে অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ হইল। সেগুলির অগ্নিস্রোত রুদ্ধ না হইতেই চরকী, সীতাহার প্রভৃতি নানা প্রকার বাজীতে ক্রমে অগ্নিসংযুক্ত হইল ; দক্ষিণে, বামে, উর্ধ্বে, মধ্যদেশে, চতুর্দিকে মহাবেগে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইল। দশ পনেরটা হাউই এক সঙ্গে

সন্‌সন্‌ শব্দে আকাশে উঠিল, এবং রঙিন তারা কাটিয়া নীচে পড়িতে পড়িতে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ সাতটা বোম অগ্নিস্পর্শে যুগপৎ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গভীর শব্দ করিল, সে শব্দ বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইল। বালকবালিকাগণের কৌতুকস্পন্দিত বক্ষ দুরুদুরু করিতে লাগিল, যুবকগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বাজী পোড়ান দেখিতেছিল, তাহারা আনন্দে ও উৎসাহে করতালি দিয়া বলিল, "সাবাস বনমালী! বাহবা বাজী তৈয়েরী করেছ! না হ'বে কেন? চিনিবাস মালীর জোড়া কারিগর এ তল্লাটে কি আর ছিল? তার ছেলে কি না! বাপকা বেটা শিপাইকা ঘোড়া, কুছ্‌ না হোয় তব্‌বি থোড়া!" পল্লীযুবতীগণ বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বাতয়ন-অন্তরালে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত এই দৃশ্য দেখিতেছিল। বাজী পোড়ান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বাঁড়ুয্যেদের মেজবাবু বলিলেন,—"বনমালী! এবার তোমার বাজী খুব উৎরে গিয়েছে; এই ধর বকশিশ!" মেজ-বাবুর গরদের জামাটি বিদ্যাধর-হস্তমুক্ত পুষ্পমালার ন্যায় তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। বনমালী মাথা নোয়াইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ঝোড়া হইতে ডজন খানেক 'ছুঁচো বাজী' বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া ছাড়িয়া দিল। বহ্নিমুখ কৃত্রিম ছুঁচোর দল অকৃত্রিম ছুছুন্দরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া দর্শকগণের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কাপড়ে আগুন লাগিবার ভয়ে দর্শকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এ দিকে বাজী পোড়ান শেষ হইয়াছে দেখিয়া সকলে গৃহমুখে প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে দোলতলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে—চতুর্দশীর চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি যেন হাসিতেছে। গ্রামের মধ্যে আর কোনও শব্দ নাই, কেবল গ্রামপ্রান্তস্থ আমবাগানের মধ্যে আম্রমুকুলের সৌরভাকুল একটা কোকিল আকুলস্বরে ডাকিতেছে—কু-কু-কু! সে স্বর মৌন প্রকৃতির বক্ষে ধ্বনিত হইয়া দিগন্তে মিলাইয়া যাইতেছে।

প্রভাতে দোলতলায় আবার নব উৎসাহে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। আজ পূর্ণিমা, গোবিন্দদেবের দোলযাত্রা। রাত্রিশেষে ভিন্ন গ্রামের বিগ্রহেরা বাহকস্কন্ধে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল পুরোহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঁড়ুয্যে-বাড়ী যথারীতি দক্ষিণা লাভ করিয়া, কেহ ঠাকুরের সঙ্গে গৃহে ফিরিয়াছিলেন, কেহ কেহ দোল দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে কোনও বন্ধগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চতুর্দশী ছাড়িয়া পূর্ণিমা লাগিলে, গোবিন্দদেব বাহক-স্কন্ধে দোলমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। একটি উচ্চ আড়ায় দুইগাছি মোটা দড়িতে তাঁহার সিংহাসন ঝুলিতে লাগিল: এই রজ্জুদ্বয় লোহিতবস্ত্রমণ্ডিত, সিংহাসনের উভয় পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ লোহিত মখমলে আচ্ছাদিত, কেবল সম্মুখভাগ উন্মুক্ত, দোলমঞ্চের উপর সর্বত্র লাল 'টুলে'র কাপড় প্রসারিত। গোবিন্দদেব সর্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন; দুইজন দ্বারবান দোলমঞ্চের সোপানসন্নিধানে বসিয়া ঠাকুরের অলঙ্কার-রক্ষায়

নিযুক্ত। অনেক দিন পূর্বে দোলমঞ্চ হইতে গোবিন্দদেবের অনেকগুলি অলংকার অপহৃত হইয়াছিল ; লুব্ধ তস্করেরা দেবমহিমাকেও গ্রাহ্য করে না বলিয়াই রক্ষি-নিয়োগের ব্যবস্থা।

বেলা বারোটার পর হইতেই গোবিন্দপুরের নিকটবর্তী বহু গ্রাম হইতে দলে দলে লোক দোলতলায় সমবেত হইতে লাগিল। দোকানী পশারীরা গ্রাম্য-বাজার হইতে আরম্ভ করিয়া দোলতলা পর্যন্ত পথের দুই পাশে দোকান খুলিয়া বসিল। এই সকল দোকানের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মণিহারীর দোকানই অধিক। মিষ্টান্নের দোকানদারগণ এক একখানি চৌকী পাতিয়া তাহার উপর ধামায় চিঁড়া মুড়কী, পিতলের থালে ছানা-বর্জিত মোণ্ডা, গোল্লা, রসকরা, চিনির ও গুড়ের ছাঁচ, তেলেভাজা, জিলিপি, বিবর্ণ মেঠাই, বাতাসা প্রভৃতি সাজাইতে লাগিল। মণিহারী জিনিসের দোকানদারেরা চটের উপর তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিছাইয়া বসিল। ইহাদের দোকানে কাঠের পুতুল, তাস, বোতাম, ছুরি, কাঁচি, তালাচাবি, দেশলাই, বাক্স, কাঠের কৌটা, টিনের বাঁশী, ঝুঁটো মতির মালা, পিতলের বালা, গুলিসুতা, পট্‌কা, কালীঘাটের এক পয়সা দামের পট প্রভৃতি অল্প মূল্যের সামগ্রীই অধিক। এই সকল দোকান ভিন্ন আবীরের দোকান, বাঁশের বাঁশীর দোকান, তালপাতার ছাতার দোকান, কুমারের হাঁড়ি, ছোবা, মাটীর পুতুলের দোকান—চারি দিকে কত জিনিসের দোকান বসিল, তাহার সংখ্যা নাই। পান, সিগারেট ও বার্ডসাই বিক্রেতা ছোট ছোট জলচৌকী সাজাইয়া তেমাথা চৌমাথা রাস্তায় বসিয়া হাঁকিয়া হাঁকিয়া "পান চুরোট বিড়ি বার্ডসাই" বিক্রয় করিতেছে।

বেলা তিনটার সময় দোলতলা জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের মা বাপের কাছে দোল দেখিবার জন্য দুই চারি পয়সা আদায় করিয়া, কেহ চাকরের সঙ্গে, কেহ ঝির সঙ্গে, কেহ কেহ বা বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গে, ভাল কাপড়জামা পরিয়া দোল দেখিতে চলিয়াছে। কোন ছেলে বাঁশের একটা বাঁশী কিনিয়া গলা ফুলাইয়া তাহা বাজাইতেছে। কেহ দুই পয়সার পট্‌কা কিনিয়া এক একটা পট্‌কায় আগুন ধরাইয়া তাহা বন্ধুদের দলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, পটাস্ পটাস্ পট্‌কার আওয়াজ হইতেছে, আর বালকের দল সভয়চিত্তে পলাইয়া অন্য লোকের গায়ের উপর গিয়া পড়িতেছে ;—কেহ গালি দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাহাকেও মারিতে যাইতেছে ; চারি দিকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, কোলাহল।

দত্তদের মতি গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের সর্দার। সে দুষ্টুমীর নব নব ফন্দী আবিষ্কার করিয়া তাহার সমবয়স্ক বালকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত। একটা আবিরের দোকানে আসিয়া সে চারি পয়সার আবির কিনিল, এবং তাহা কোঁচড়ে পুরিয়া শিকারের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না ; সে দেখিল, দোলতলায় তাহার পাঁচ সাতটি 'এয়ার' দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মতি কোঁচড় হইতে এক মুষ্টি আবির বাহির করিয়া ধীরে ধীরে

সেই দলের নিকটবর্তী হইল, এবং চক্রবর্তীদের বিষ্ণুর চোখে মুখে ও কপালে তাহা মাখাইয়া দিয়াই সেখান হইতে চম্পট দিল! বিষ্ণু বেচারা সহসা আক্রান্ত হইয়া আর চক্ষু তুলিতে পারিল না, নতমুখে উভয় হস্তে চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে কুটুম্ব-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। এ দিকে বিষ্ণুর সঙ্গিগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে মতির উপর আসিয়া পড়িল, এবং তাহার কোঁচড় হইতে আবিরগুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া প্রথমে তাহা সজোরে তাহার মাথায় মাখাইয়া দিল; শেষে তাহার চোখ, মুখ, পিঠ—দেহের কোন অংশই বাদ পড়িল না। মতি বিষ্ণুর বন্ধুচক্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। সেও নিতান্ত নির্বান্ধব হইয়া এই বিপদ-সমুদ্রে প্রবেশ করে নাই; বিপিন, মোহিনী, চারু, রজনী প্রভৃতি অনেকগুলি বন্ধু দূর হইতে তাহার আক্রমণকারীদিগের পৃষ্ঠে কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল; রঞ্জিত জলধারা তাহাদের কামিজ ও চাদর ভিজাইয়া পৃষ্ঠ ভাসাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল, সকলে লাল হইয়া গেল। গ্রামের অনেক দুষ্ট ছেলে বাঁশের চোঙ্গার পিচকারীতে ম্যাজেণ্টা, আবির ও খুনখারাপি রঙের 'গোলা' পুরিয়া বটগাছ, জামালকোটার বেড়, বা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়াইয়া, পথের লোকের সর্বাঙ্গে পিচকারি ছুঁড়িতে লাগিল; শুভ্রবস্ত্রে কাহারও গৃহে ফিরিবার সম্ভাবনা রহিল না। চারি দিক লালে লাল!

সূর্য অস্তে গেল। বাঁড়ুয্যেদের দেউড়ীতে চাটাইয়ের উপর বসিয়া স্বরূপ-পুরের মুচীর দল জোরে জোরে ঢাক ঢোল কাঁশি বাজাইতে লাগিল; পুরোহিত ঠাকুর গোবিন্দদেবের সিংহাসনের এক পার্শ্বে বসিয়া রজ্জুবদ্ধ সিংহাসনখানি দোলাইতে লাগিলেন। গ্রাম্য কামারেরা, মালীরা জনতার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের স্বহস্তনির্মিত লোহার ও শোলার শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে। জেলে ও বাগ্দীর মেয়েরা বটগাছের নীচে বসিয়া মাছ, তরকারী, ঢ্যাঁপা, ভুট্টার খৈ, পদ্মের 'চাকি' প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। চাষার ছেলেরা নাগরদোলায় উঠিয়া মহানন্দে পাক খাইতেছে, রমণীগণ কুমারের দোকানের সম্মুখে জটলা করিতেছে—সেখানে রাশীকৃত মাটীর ভাঁড়, ছোবা, কৃষ্ণঠাকুর, সিপাই, কুকুর, বিড়াল, ব্যাং! চাষার দল নীলাম্বরী-পরিহিত, সুরঞ্জিত রুমালে বেষ্টিতমস্তক ছোট ছোট ছেলেগুলিকে কাঁধে লইয়া জনতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং দৈবাৎ কোনও পরিচিত খাঁ, মণ্ডল, বা মাল্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাম্বুলরাগরঞ্জিত দশন-পংক্তি উদ্ঘাটিত করিয়া বলিতেছে, "কি গো মামু! দোল দ্যাখ্তি আয়েচো? এবার ত্যামোন জাঁক দেক্চিনে। মুই ত আস্বো না ঠাউরেই বসে ছ্যালাম, তা ছাবালটা র মান্তি দ্যালে না, তামান বেলাডা ঘ্যান ঘ্যান করতি নাগ্লো! কুলে দামড়াটা যে মোর কনে পালালো, তা সম্জাতি পার্চিনে, একা মানুষ, বড্ডা ঝক-মারিতে পুড়েচি। তাগাদীগির শালা আবার দোলের পরবীর জন্যে মোর উটোনের মাটি চষে ফ্যাল্চে, দু গণ্ডা পয়সা পরবী না দিতি পাল্যি সুম্মুন্দি আবার দু টাকা গুণাগার নাগাবে, গোট্টো বাছুর্টো নিয়ে ঘর!" ভাগিনেয়ের দুঃখকাহিনী

শুনিবার মামুর তখন অবসর ছিল না ; তাহার বংশধর ন্যাপ্‌লা তখন আধ পয়সার গুড়ে ছাঁচের জন্য 'বাপ্‌জী'র কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, সুতরাং "চাষার নশিবে আল্লা দুস্‌কু নিকেচে, তার চারা কি?" এই বিজ্ঞোচিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মামু এক জোড়া চর্মনির্মিত 'বাদা'র দর করিতে লাগিল। বাদা-বিক্রেতা দর হাঁকিল চারি আনা ; মামু বলিল, চারি পয়সা, সুতরাং এবার দোলে আর তাহার বাদা ক্রয় করা হইল না।

অতঃপর চাপরাসধারী জমাদার সরিওতুল্লা মিঞা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। মাছের দোকানগুলির কাছে আসিয়া মিঞা বলিল, "এই বেটী! বড় যে পচা মাছ বেচ্‌ছিস, চল্‌ থানায়!" মেছুনী প্রমাদ গণিল! 'দারোগা ছাহেবে'র নাগোরা জুতামণ্ডিত চরণযুগল ধরিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর, আমার এ জলজ্যান্ত মাছ, পচা মাছ কি আন্‌তি পারি?" 'দারোগা ছাহেবে'র হৃদয় কিছু কোমল হইল ; সে বলিল, "তা যদি জ্যান্ত মাছ হয় ত আমাকে কিছু দে, আর পচা হয় ত বিক্রী কর্তে পাবিনে, মাটীতে পোঁতা হবে।"—সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, স্বার্থচিন্তায় ধীবরবধূও কম পণ্ডিত নয় ; সব যায়, সুতরাং 'দারোগা ছাহেব'কে কিছু দিয়া সে অব্যাহতি লাভ করিল।

গোবিন্দপুরের নিকটে এক পীরের দরগা আছে ; ভারি জাগ্রত পীর, তিনি দেওয়ালে চড়িয়া দেশভ্রমণ করিতেন! দরগার ফকীরগণ ময়রার দোকান হইতে সিন্নি সংগ্রহ করিতে লাগিল ; কোনও দোকানদার একমুঠা মুড়ি বা মুড়কী, কেহ খানদুই গুড়ে বাতাসা, কেহ বা একটি গুড়ে লাড়ু দান করিল। নানা লোকে নানা বাবদে তোলা তুলিতে লাগিল ; দোকানদারদের কেনও আপত্তি টিকিল না ; এ-ও যেন মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স ; আপীল নিষ্ফল, এবং তোলা দিব না বলিবার সাহস কাহারও নাই ; কেন না, জমীদারের জমী। একজন সাহসী 'পুঁড়ো' (তরকারী-বিক্রেতা) জমীদারদের এক সরীকের পাইককে বলিল, "আরে তুমি যে মশাই বড্ডা ঝকমারিতে ফেল্লে! তোলা নিবা একটা বাগুন, তা তুমি কুমড়োর মত একটা বাগুন ধরে টানাটানি কর কেন?" জমীদারের পাইক খুব সপ্রতিভ ; সে বলিল, "আমি ত কেবল ছোট সরীকের তোলাই তুলচি, বড় আর মেজ সরীকের পাইক আস্‌চে! ক'টা বেগুন তাদের দিতে হয় দেখিস্‌।" দোকানদার বেগতিক দেখিয়া বার্তাকুর দর শস্তা করিয়া ফেলিল ;—"শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্‌।"

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। যাত্রিগণ গৃহে ফিরিতে লাগিল। বালক, যুবক, বৃদ্ধেরা দলে দলে গোধূলির ধূলি বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। দোকানদারেরা তাহাদের অস্থায়ী দোকান তুলিবার জন্য ছোট ছোট কেরোসিনের টিমি জ্বালিতেছে। ছেলেরা গল্প করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে ; একটা চাষার ছেলে তাহার 'ফুপুতো' ভাইকে বলিতেছে, "বাপজী মোরে এক পয়সা দোলের পরবী দিয়েলো, মুই আদ পয়সার নাড়ু কিনে খায়েচি, আর আদ পয়সার মুড়কী কিনে নিয়ে যাচ্চি, কাল সক্কালে উটে খাতি হ'বে।" অনেক দিন পরে তাহার লাড়ু ও মুড়কী খাইবার

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, সে তাহর মনের আনন্দ আর লুকাইতে পারিতেছে না। বালকবালিকাগণের অনেকেরই হাতে আজ সোলার পাল্কী, 'বাজিকন্যা', টীয়েপাখী, কাকাতুয়া, লোহার বঁটি, ছুরি ও মাটীর পুতুল।

বড়লোকের ছেলেরা কেহ চাকরের স্কন্ধে, কেহ ঝির ক্রোড়ে গৃহে ফিরিতেছে; তাহাদের অঙ্গে শাটিনের পরিচ্ছদ, পায়ে রঙিন মোজার উপর বিলাতী বার্ণিশ জুতা, মাথায় সাঁচ্চার কারুকার্য-শোভিত মখমলের টুপি, এবং গলে হিরণ্ময় স্থূল গার্ডচেন।

পূর্ণিমার শশধর পূর্বগগনের ঊর্ধ্বে উঠিল; তখনও গোবিন্দদেব দোলমঞ্চ ত্যাগ করেন নাই। একজন বৃদ্ধ পুরোহিত-ঠাকুরের অদূরে টুলের উপর উপবিষ্ট, তাঁহার দৃষ্টি পথের দিকে। দোলমঞ্চের প্রত্যেক কার্ণিশে ও চূড়ায় বিলম্বিত লাল নীল পীত হরিৎ নানাবর্ণের লণ্ঠনে দীপালোক প্রজ্বলিত, বিবিধ বর্ণের আলোক-মালায় মঞ্চ আলোকিত।

চন্দ্রালোক আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমস্ত প্রকৃতি বাসন্তী পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল স্নিগ্ধ কিরণে ভাসিতে লাগিল। দেশোয়ালীরা মাথার পাগড়ী হইতে পদনখ পর্যন্ত আবিরে আচ্ছন্ন করিয়া মাদলের শব্দে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া গান গাহিতে গাহিতে দলবদ্ধভাবে ধনাঢ্যের গৃহে হোলির পার্বণী আদায়ের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল;—তাহাদের কাহারও কাহারও হস্তে আবিরে পূর্ণ পিতলের থালা। অদূরবর্তী একটি দ্বিতল গৃহের ছাদে বসিয়া একজন বাঁশী বাজাইতেছে; বাঁশীর সুর আনন্দপূর্ণ, তাহা এই নৈশ বসন্তা-নিলের ন্যায় তৃপ্তিকর, মদির-বিহ্বল।

দোলতলায় আর একটিও পুরুষমানুষের সমাগম নাই। বনপথ দিয়া গৃহস্থ-রমণীগণ দলে দলে দোল দেখিতে যাইতেছেন; তাঁহাদের মস্তকে বনের ঘনচ্ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের মুখে শুভ্র চন্দ্রকিরণ খেলা করিতেছে, তাঁহাদের কেশদামের উপর শুভ্র বস্ত্রপ্রান্ত সমীরভরে আন্দোলিত হইতেছে; কাহারও নাসিকার নোলকের মুক্তা, কাহারও নথের মতি চন্দ্রালোকে এক একবার টলটল করিতেছে; কোনও রমণীর কোলে শিশুসন্তান; সে মাকে দুই হস্তে ঠেলিয়া বলিতেছে "তিগ্‌গিল বালি তল্‌, গুম এতেতে, মা, তোব!"—পুত্রের অনুযোগে মায়ের লক্ষ্য নাই, তিনি সঙ্গিনীগণের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দোল-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

জঙ্গলবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ বক্রপথ ঘুরিয়া রমণীগণ দোলমঞ্চে উঠিয়া গল-লগ্নীকৃতবাসে নতজানু হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন; কেহ বা দুই একটি পয়সা গোবিন্দদেবকে প্রণামী দিতেছেন; যাঁহার কোলে ছেলে কিংবা মেয়ে আছে, তিনি তাঁহার শিশুসন্তানের মস্তক দেবচরণে সবলে অনবরত করিতেছেন।

রাত্রি আরও অধিক হইল। গ্রামখানি সুপ্তিমগ্ন। মধ্যে মধ্যে পল্লীপ্রান্তের বাগ্দীপাড়ায় দুই একটা কুকুর গৃহস্থের ঘরের পাশে মানগাছের গোড়ায় ছাই

গাদায় শুইয়া অদূরবর্তী ধাবমান শৃগালকে দেখিয়া এক একবার বীরদর্প প্রকাশ করিতেছে, এবং মিঞাজান হালসানার পিতা মামুদ শেখ একটা মাটীর প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া পাট কাটিতে কাটিতে গায়িতেছে,—

"ও ! এক দিনও না দেখিলাম তারে।
আমার ঘরের কাছে আরসি নগর—
তাতে এক পড়শী বস্ত করে।
পড়শী যদি আমার হ'ত,
তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে !
মরি হায় রে—
আবার, সে আর লালন এক স্থানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন দূর রে॥"

চড়ক

চৈত্রমাস বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিস্থল। এ সময়ে পল্লীজীবনে নব আনন্দের হিল্লোল বহে। গম, ছোলা, যব, অড়হর প্রভৃতি রবিশস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকালের অনাহারে শীর্ণদেহ, ক্ষুধাতুর কৃষক পরিবারে যে হর্ষের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুদীর্ঘ হিমযামিনীর অবসানে বসন্তের মলয়ানিলের মতই সুখাবহ।

পল্লীগ্রামে এ সময়ে তরিতরকারীরও অভাব হয় না ; বাগানে বাগানে কাঁচ আম, গৃহপ্রাঙ্গণস্থ সজিনা গাছে লম্বমান অসংখ্য সজিনার ডাঁটা, পুকুরের পাড়ে বেড়ার ধারে নিবিড়পত্র ডুমুর গাছে থোকা থোকা যগডুমুর ও সংকীর্ণকায়া মৃদুগামিনী তটিনীর উভয় তীরে যেখানে বালুকারাশি ভেদ করিয়া ছোট ছোট ঝরণা উঠিয়াছে, সেই সকল সুশীতল জলপূর্ণ ঝরণার্ চতুর্দিকে উৎপন্ন সবুজ শুশুনির শাক—এই সকলে এ সময়ে গ্রাম্য গৃহস্থগণের তরকারীর অভাব দূর হয়। প্রায় সকলের ঘরেই ময়দা, খেজুরে গুড়, যবের ছাতু ও ছোলার ডাল সঞ্চিত থাকে। যে সকল কৃষকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তাহাদের দুগ্ধবতী গাভীরও অভাব নাই ; অনেকেই গোদুগ্ধ হইতে সঞ্চিত ননী জ্বাল দিয়া ঘৃতের সংস্থানও করিয়া রাখে ; অনেকে সর বাটিয়া তাহাই জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করে, সুতরাং যখন কোন গোপপত্নী বা কৃষকরমণী তাহার ক্ষুদ্র শিশুর কালো কুচকুচে শরীর প্রচুর তৈল ও অল্প জলে অভিষিক্ত করিয়া এবং তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলে,

“খোকা যাবে মোষ চরাতে, খেয়ে যাবে কি ?
আমার, শিকের উপর গমের রুটী, তবলা ভরা ঘি !”

তখন এই সুন্দর ছেলেভুলান ছড়াটির সুরে ও তাহার প্রত্যেক কম্পনে যে সুকোমল মাতৃহৃদয়ের স্নেহমধুর উচ্ছ্বাসেরই পরিচয় পাই, এমন নহে, তাহাদের পারিবারিক জীবনের অমল সুন্দর, শান্তিপূর্ণ বৈচিত্র্যও নয়ন-সমক্ষে সুস্পষ্ট-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আনন্দের এই পূর্ণ উচ্ছ্বাসকালে পল্লীগ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ কয়েক দিনের জন্য একটি মহোৎসব-উপলক্ষে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার আমোদে লিপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ শিবোপাসনার অধিকারী, আবার হিন্দুসমাজের সকল উৎসবের সহিত ধর্মানুষ্ঠান অল্পাধিকপরিমাণে বিজড়িত থাকে, সুতরাং চৈত্রমাসের শেষভাগে গাজনের ঢাক সজোরে বাজিয়া উঠে। চড়ক বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সর্বপ্রধান পর্ব।

কিছু দিন পূর্বে চৈত্রমাসের মধ্যভাগেই চড়কের ঢক্কাধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত, এবং সেই সময় হইতেই পল্লীবাসী কৃষক ও রাখালের দল, ঘরামী, মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবিবর্গ কাজ ছাড়িয়া গাজনের আমোদে মত্ত হইত। আজকাল জীবন-যাত্রা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই চড়ক-সংক্রান্তির এত বেশী আগে আর তাহাদের উৎসব-লিপ্ত হইবার আবশ্যক নাই। এখন সংক্রান্তির নয় দশ দিন পূর্ব হইতেই চড়কের আয়োজন চলে।

প্রত্যেক গ্রামে গাজনের তিন চারিটি দল থাকে। কোন কোন গ্রামে দলের সংখ্যা আরও অধিক হয়। বিভিন্ন পাড়ায় সাধারণতঃ এক একটা দল গঠিত হয় ; প্রত্যেক দলে একজন দলপতি থাকে, তাহাকে "মূল সন্ন্যাসী" বলে। মূল সন্ন্যাসী হইতে হইলে জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ হওয়া যে একান্তই আবশ্যক, তাহা নহে। কৈবর্ত, গোপ, বণিক, গন্ডক প্রভৃতি সকল জাতির লোককেই মূল সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায় ; কিন্তু তাহার পরিণতবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। শিবের সিংহাসন-বহন, উৎসবে কয় দিন নিয়মিতরূপে শিবপূজা, দলস্থ সন্ন্যাসিগণকে পরিচালিত করা মূল সন্ন্যাসীর প্রধান কার্য ; এতদ্ভিন্ন তাহার আরও দুই একটি কঠিন কাজ আছে ;— আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব।

চড়ক-সংক্রান্তির দশ দিন পূর্বে মূল সন্ন্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পবিত্র হইয়া ক্ষুদ্র কাষ্ঠসিংহাসনে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ গাজন-তলায় আখড়া জমাইয়া বসে। মহাদেবের এই সকল নৈমিত্তিক সেবক এ সময় স্ব স্ব বাড়ীতে থাকে না ; কোনও বৃক্ষতলে বা বনান্তরালে ইহাদের এক একটি আড্ডা আছে ; সেই আড্ডাই 'গাজনতলা' নামে প্রসিদ্ধ। এক এক পাড়ায় এক একটি গাজনতলা নির্দিষ্ট আছে ; যে বৎসর যে লোকই মূল সন্ন্যাসী হউক,—নির্দিষ্ট গাজনতলায় তাহাকে আড্ডা ফেলিতেই হইবে।

গাজনতলার দৃশ্য বড়ই রমণীয়। নিকটে কোথাও কাহারও ঘরবাড়ী নাই। চারি দিকে আশ্যাওড়া ও ভাঁট-বন, ভাঁট ফুলের সৌরভে জঙ্গলটি পূর্ণ, নিকটে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল গাছের সারি, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি সুপারি গাছ, দুই

একটি তমাল, বা বেলগাছ ও বাঁশের ঝাড়। বৎসরের অন্য সময় এখানে জনসমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না ; কেবল এই সময়টিতেই যথানির্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীর দল খর্জুরপত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীরে শিবস্থাপনা করে, এবং সন্নিকবর্তী বট, পাকুড় বা তেঁতুল গাছের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় আড্ডা পাতিয়া থাকে।

ক্ষৌরকর্মের পর মূল সন্ন্যাসী পৈতা গলায় দেয় ; এ পৈতা ব্রাহ্মণের উপবীতের মত নহে, ইহা শুধু তাহাদের গলায় ঝুলিতে থাকে। পৈতাগুলি হরিদ্রা-রঞ্জিত, তাহাতে এক একটি পিত্তলনির্মিত অঙ্গুরীয় ঝুলিতে দেখা যায়।

মূল সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই দাড়ি গোঁপ কামাইয়া সন্ন্যাসী হয় ; চৈত্রসংক্রান্তির দশ দিন পূর্বে যাহারা কামায়, তাহাদের ক্ষৌরকর্মের নাম দশের কামান। এই ভাবে ক্ষৌরকর্মের দিনগণনা করিয়া পাঁচের কামান, তিনের কামান নাম হইয়াছে। ক্ষৌরকর্মের পর ও উৎসব শেষ হইবার পূর্বে এই সন্ন্যাসীদের গৃহকর্মে যোগদানের অধিকার নাই, দলের সঙ্গে ঘুরিয়া ভিক্ষাসংগ্রহ ও গাজনতলায় রাত্রিযাপনই ব্যবস্থা। সুতরাং যাহারা খুব কাজের লোক, অথচ একটু সখও আছে, তাহারা আগে না কামাইয়া শেষ দিন অর্থাৎ তিনের কামানের দিন কামায়। অনেকে আবার মোটেই কামায় না, সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া খানিক আমোদ করিয়া আসে।

মূল সন্ন্যাসী ও তাহার অনুচরবর্গের হাতে বেতের এক রকম ছড়ি দেখা যায় ; পাঁচ ছয় গাছি সরু বেত একত্র ঝাঁটার মত করিয়া বাঁধিয়া এই ছড়ি প্রস্তুত হয় ; এই ছড়ি হাতে লইয়া সন্ন্যাসীর দল ঘুরিয়া বেড়ায়।

ক্রমে সংক্রান্তি যতই নিকটবর্তী হইয়া আসে, ঢাকের বাদ্য ততই উচ্চ হইয়া উঠে। সন্ন্যাসিগণ ঘন ঘন "বলো শিবো মহাদেব, দেব!" বলিয়া হুঙ্কার করিতে থাকে। চড়কের ঢাকের বাদ্য শুনিয়া ছোট ছোট ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া চীৎকার করে,—

"চড়ক চড়ক ড্যাড্যাং ড্যাং,
পাবদা মাছের দুটো ঠ্যাং।"

সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব হইতেই গাজনতলায় আমোদের ধুম পড়িয়া যায়। অপরাহ্ণে গাজনতলায় ঢাকের বিকট শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সন্ন্যাসিদলের অবিশ্রান্ত নৃত্যে মাটী কাঁপিতে থাকে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত গাজনতলার চারি দিকে সমবেত হইয়া ইহাদের উদ্দাম নৃত্য নিরীক্ষণ করে ; অনেক কুলবধূ জল আনিবার ছলে কলসী কাঁকে লইয়া গাজনতলার পথে নদীতে যায়, এবং বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কৌতুকপ্রদীপ্ত চক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া লয় ; কিন্তু বড় যা, শাশুড়ী, ননদের ভয়ে তাহারা সেখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে না।

নাচিতে নাচিতে যে সকল সন্ন্যাসীর অতিরিক্ত ভাবাবেশ হয়, তাহারা মাটীর উপর উবু হইয়া পড়িয়া যায়, এবং অবনতমস্তকে ঢাকের তালে তালে মাথা নাড়িতে

থাকে ;—এই মুদ্রাটির নাম "বয়াল খাটা"। ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসিগণ শুধু বয়াল খাটিয়াই ছাড়ে না, এই রকম করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে 'হামা টানিয়া' তাহারা অনেক দূরে চলিয়া যায় ; কখনও বনে প্রবেশ করে, কখনও বা গর্তে গিয়া পড়ে। শুনা যায়, যখনই তাহাদের উপর মহাদেবের 'ভর' হয়, তখনই উহাদের সংজ্ঞালোপ হয় ; তখন ঢাক আরও জোরে জোরে বাজিয়া উঠে, এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীর "বলো শিবো মহাদেব দেব!" ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়। অনন্তর তাহারা সেই 'ভর'-প্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে 'হাতসাঁই' করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করে।

সংক্রান্তির আর এক দিন বিলম্ব আছে। সন্ন্যাসীরা কাঠের সিংহাসনে শিব বসাইয়া বিভিন্ন দলে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। চাষার ছোট ছোট ছেলেরা বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করিতেছে। লোকে ইহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুকের মত দেখে না, সুতরাং সকলেই ইহাদের ধামায় অধিক-পরিমাণে চাল ডাল দান করে। ভিক্ষা করিয়া যাহা পায়, সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া আসিয়া তাহা রাঁধিয়া মহানন্দে একত্র আহার করিতে বসে।

সংক্রান্তির পূর্ব দিন অপরাহ্নে গ্রামের সমস্ত সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়া নদীকূলে চলিল। তাহার পর তাহারা বেত্রদণ্ড হাতে লইয়া নদীর জলে নামিয়া চড়কগাছের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পূর্বে পিঠ বা হাত ফুঁড়াইয়া চড়কে পাক খাইবার নিয়ম ছিল, কিন্তু একালে পিনাল কোডের ভয়ে ভক্তের দল সেই সনাতন বিধি পরিত্যাগ করিয়াছে। চড়কগাছ মহাশয়ও সেই সময় হইতে নদীর জলে গা ঢাকা দিয়া ঠাণ্ডা হইতেছেন! সংবৎসর পরে আজ সন্ন্যাসীরা সুদীর্ঘ চড়কগাছটি নদীর ভিতর হইতে তীরে টানিয়া আনিল, এবং যথারীতি পূজা সাঙ্গ করিয়া আবার জলের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। সন্ন্যাসীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, এই চড়কগাছ বড় জাগ্রত দেবতা, ইনি সারা বৎসর নদীতে নদীতে ঘুরিয়া ঠিক সময়টিতে পূজা খাইবার লোভে পীঠস্থানে আসিয়া উপনীত হন!

চড়ক গাছের পূজা শেষ করিয়া সন্ন্যাসীরা ঢাকের শব্দে নাচিতে নাচিতে স্ব স্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসিল। এ দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ ; রাত্রিকালে ফল খাইয়া থাকিতে হয়। ফলাহারের ব্যাপারটি গুরুতর আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। দিবসে ভিক্ষা করিবার সময় আজ তাহারা নানাপ্রকার ফলমূলাদি ভিক্ষা পাইয়াছে ; কারণ, এই দিন সন্ন্যাসীদের ফলদান করিলে গৃহস্থরমণীগণ পুণ্যের অধিকারী হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বাগানে বাগানে এখন সুপক্ক নোনা, বেল, পেঁপে, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের অভাব নাই ; পল্লী অঞ্চলে নারিকেল গাছও অনেক, সুতরাং ফলের অভাব হয় না। ফলভক্ষণের সময় অনেক বাহিরের

লোকও ইহাদের সঙ্গে জুটিয়া গেল ; কিন্তু তাহাতে ইহাদের আপত্তি নাই, সন্ন্যাসী হইয়া ইহারা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' মনে করে।

সমস্ত রাত্রি ঢাকের বাজনার শব্দে পল্লীবাসীদের কানে তালা লাগিয়া গেল। ঘন ঘন "বলো শিবো মহাদেব দেব!" শব্দে সমস্ত গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি অধিক হইলে ইহারা একত্র সমবেত হইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল, এবং কণ্টকময় কুলের ডাল কুড়াইয়া আনিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কারণ নাই ; যখন ইহারা অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করে, তখন ভস্ম ভিন্ন তাহাতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, এবং কুলের ডালগুলিকে যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক করিয়া ফেলা হয়।

রাত্রিশেষে 'কাকবলি' দেওয়া হইল। 'কাকবলি' জিনিসটি অতি অপূর্ব। সন্ন্যাসীরা চড়ক-পূজার সময় শিবেরই উপাসনা করিয়া থাকে, সুতরাং শিবের কিঙ্কর ভূতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচর্যা না করিলে পাছে তাহারা রাগ করে, এই ভয়ে সন্ন্যাসীরা এই দিন রাত্রে ভূতের প্রীতিকামনায় কিঞ্চিৎ আহারের যোগাড় করে, এবং ভাত, শোল মাছের ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া একটা মালসাতে লইয়া শেষরাত্রে ভূত মহাশয়ের সন্ধানে যায়।

রাত্রি তিন চারিটার সময় সর্বাপেক্ষা সাহসী ও শুদ্ধাচারী মূলসন্ন্যাসী সেই মালসাটি লইয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইল ; পাঁচ সাত জন বলবান সন্ন্যাসী প্রসারিত বাহুতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে গাজনের ঢাক নৈশাকাশ প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে লাগিল।

এক-বুক জলে নামিয়া মূলসন্ন্যাসী মালসাটি জলে ভাসাইয়া দিল, এবং ভূতগণকে আহ্বান করিয়া সেই ভোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। শুনিয়াছি, ভূতগণকে কখন কখন এ ভাবে অনুরোধ করিতেও হয় না, মূলসন্ন্যাসী জলে নামিতে না নামিতেই ভূত মহাশয়েরা তাহার হাত হইতে মালসাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়! এমন কি, অন্য সন্ন্যাসীরা মূলসন্ন্যাসীকে সবলে ধরিয়া না রাখিলে ভূতেরা তাহাকে পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়! বাল্যকালে প্রায়ই শুনিতাম, অমুক মূলসন্ন্যাসী কাকবলি দিতে গিয়েছিল, ভূতেরা ঝড়ের মত বেগে আসিয়া খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই ; পরদিন খুঁজিতে খুঁজিতে মূল-সন্ন্যাসীকে দুই তিন ক্রোশ দূরে নদীতীরস্থ কোনও শ্মশানে, বা অরণ্যে, কোনও বৃক্ষমূলে, কিংবা কোনও উচ্চ বৃক্ষশাখায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে, ডুব দিয়া জল পান করিলে শিবের সাধ্য নাই—তাহা তিনি টের পান, কিন্তু শিবের অনুচরদের সম্বন্ধে এ কথাটি খাটে না। মূলসন্ন্যাসী সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারসম্পন্ন না হইলে ভূতেরা তাহা টের পাইয়া তাহাকে এইরূপে বিপন্ন করিয়া থাকে ; কিন্তু এ সকল কথা আমরা বাল্যকালেই শুনিতে পাইতাম, সভ্যতার প্রতাপে আজকাল বোধ হয় ভূতেরা ভালমানুষ হইয়াছে, তাহাদের এ রকম

দৌরাত্ম্যের কথা এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

চড়ক-সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীদের সাজসজ্জার আরও বাহার হইল। অপরাহ্নে 'ধূপবাণ' খেলিতে হইবে, তাহারই আয়োজনে প্রভাত হইতেই ইহারা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সকল সন্ন্যাসীই স্ব স্ব পরিচিত অবস্থাপন্ন ভদ্র প্রতিবেশীর গৃহ হইতে রমণীগণের পট্টবস্ত্র, শান্তিপুরে ডুরে, গুলবাহার শাড়ী ও গোট, চন্দ্রহার, চিক, পাঁচনর, বাজু, বালা, তাবিজ প্রভৃতি গহনা চাহিয়া আনিয়া অপরাহ্নের সজ্জার আয়োজন করিয়া রাখিল ; তাহার পর বাজার হইতে ধুনো কিনিয়া আনিয়া তাহা উত্তমরূপে পিষিয়া মালসা পূর্ণ করিল, তেলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রাখিল। এই ধুনো ও তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ধূপবাণের প্রধান উপকরণ।

এই দিন অপরাহ্নে কোন্ পাড়া হইতে কিরূপ সঙ্ বাহির হইবে, তাহা নির্ধারিত করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় কমিটি বসিয়া গেল।

বেলা শেষ হইতে না হইতে চারি দিকে তুমুলরোলে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীরা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া এক একটি 'বাণ' লইয়া নদীতীরে সমাগত হইল। এই বাণগুলি দেখিতে অনেকটা স্বর্ণকারের সাঁড়াশীর মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর, দণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগ সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ, মাথার দিকে ঠোঁট বাহির করা ; তাহারই নিকট এক একটা লৌহনির্মিত ঝিঞ্জিরি লাগান থাকে।—কিন্তু মূল-সন্ন্যাসিগণকে বাণ ফুঁড়িয়া কখন খেলা করিতে দেখা যায় না।

মূলসন্ন্যাসী দলস্থ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লইয়া নদীতীরে শিবের সিংহাসন বহিয়া আনিল।

এই সিংহাসন নদীকূলে নামাইয়া শিবপূজা করা হইল ; কোন কোন সন্ন্যাসী ধোপাদের কাপড় কাচিবার পাটের মত এক একখানি কাঠের পাট মাথায় বহিয়া নদীতীরে উপস্থিত করিল, তাহা সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া পূজা করা হইল। তাহার পর মূলসন্ন্যাসী অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চক্ষু পানের পাতা দিয়া ঢাকিয়া বাণের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তাহাদের দুই পাঁজরের মাংসে বিঁধাইয়া দিল। সন্ন্যাসীরা বাণ ফুঁড়িয়া পূর্বকথিত ঝিঞ্জিরি দ্বারা বাণগাছটি গলদেশের সঙ্গে আটকাইয়া রাখিল।—ইহাতে এই সুবিধা হয় যে, যখন ইহারা দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নানা ভঙ্গিতে সবেগে নৃত্য করিতে থাকে, তখন বাণ গাছটি পাঁজরের মাংস হইতে খুলিয়া পড়িতে পারে না। ছোট ছোট ছেলেরাও আজ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সখ করিয়া বাণ ফুঁড়িতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা মাংসভেদের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়া সন্ন্যাসীরা তাহাদের বুকে পিঠে গামছা জড়াইয়া তাহারই মধ্যে বাণ বিদ্ধ করিতেছে।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা বেশী সৌখীন, তাহারা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়াই সন্তুষ্ট নহে, কাঠমল্লিকা ও আকন্দের ফুলের মালা গাঁথিয়া কেহ গলায় পরিয়াছে, কেহ বা বাবরীকাটা চুলের উপর মণ্ডলাকারে স্থূল মালা পরাইয়া দিয়াছে। শিবের কাষ্ঠসিংহাসন বহুসংখ্যক মাল্যে সুশোভিত।

বাণফোঁড়া শেষ হইলে বাণের মাথায় তৈলসিক্ত ধুনা-মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। বাণের মাথার সেই নেকড়া মশালের মত সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। তখন এক এক দল সন্ন্যাসী চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে নদীতীর হইতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। অনেক আমোদলিপ্সু নিম্নশ্রেণীর লোক বাণ না ফুঁড়িয়াই এই দলের সঙ্গে মিশিয়া হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কোনও কোনও সন্ন্যাসীর বাণের অগ্নিশিখা হঠাৎ তাহাদের পৃষ্ঠস্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সে দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য দেখিয়া, দর্শকগণ হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যার পূর্বে গোবিন্দপুরের ক্ষুদ্র বাজার ও সংকীর্ণ রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বাজারে শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে ও কালীবাড়ীতে বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হইল। হাসি, গল্প, গান ও উচ্চ কোলাহলে উৎসবক্ষেত্র গম্‌গম্ করিতে লাগিল। অনেক পুত্রবৎসল পিতা তাহাদের দুই তিন বা ততোধিক বৎসর বয়সের ছেলেদের নীলাম্বরী বা লালা কাপড় পরাইয়া, কোমরে লাল চাদর কিংবা রাণী মার্কা ও নোট মার্কা চিত্র-বিচিত্র রুমাল বাঁধিয়া তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া সেই জনতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সন্ধ্যার অনেক পূর্ব হইতেই নানারকম সঙ্ বাজারে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। স্থূল রসিকতা দ্বারা সাধারণ দর্শকগণের হাস্য রসের উদ্রেক করাই তাহাদের সঙ্ সাজিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের আমাদের এই আদর্শটি লক্ষ্য করাও অল্প আনন্দের বিষয় নহে। কেহ একটা মুখোশ পরিয়া গায়ে খানিক চিটা-গুড় ও কতকগুলি শিমুলের তুলার কৃত্রিম লোম লাগাইয়া এবং চাদর পাকাইয়া লেজ করিয়া বাঘ সাজিয়া বাহির হইয়াছে, একটি লোক তাহার গলার দড়ি গাছটি ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে, আর সেই কৃত্রিম ব্যাঘ্র হস্তে ও পদে ভর দিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। তাহার চারি দিকে প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শক ; কোন কোন সাহসী চাষার ছেলে রহস্যচ্ছলে সেই কৃত্রিম শার্দূলের লাঙ্গুলে হাত দিতেছে, আর ব্যাঘ্রপ্রবর 'আঁক্' করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত-ভাবে সকলে চারি দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে, এবং তাহাদের উদ্‌ঘাটিত মুখবিবর হইতে হাস্যরস উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

বাজারের আর এক অংশে একজন বাবাজী অন্য একটি বাবাজীর সেবাদাসী-টিকে সঙ্গে লইয়া চলিতেছে ; তাহাদের হস্তে খঞ্জনী ; সমবেতকণ্ঠে তাহারা সরু মোটা সুরে গাহিতেছে,—

"বেলা গেল ও ললিতে ! কৃষ্ণ এল না ;
আমার, মনের আশা রৈল মনে প্রেকাশ হ'লো না।"

এই গান গাহিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে এক প্রচণ্ড বাধা উপস্থিত ;

বৈষ্ণবী-হীন বৈরাগী ব্যাকুলভাবে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সঙ্গীতমত্ত বৈষ্ণবী-চোর বাবজীকে আক্রমণ করিল, বাবাজীর স্কন্ধাবলম্বিত ঝোলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষে বিপুল বচসা, তাহার পর কিলোকিলি আরম্ভ হইল। কিলের চোটে বাবাজীদের লম্বা কৃত্রিম টিকি ও কাঠের মোটা মোটা মালা ছিঁড়িয়া পথে পড়িয়া ধূলিধূসরিত হইতে লাগিল! ইত্যবসরে আর একটি লুব্ধ বৈষ্ণব কোথা হইতে আচম্বিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবীকে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে

"মনের আশা রৈল মনে প্রেকাশ হ'লো না।"

গানের এই চরণটি গাহিতে গাহিতে নবাগত বাবাজীর সঙ্গে সরিয়া পড়িল!

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। বাজারের দোকানে দোকানে, গৃহস্থের গৃহে গৃহে সান্ধ্য-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর দল রাস্তা ঘুরিয়া গ্রাম্য জমীদারের বাড়ীর সম্মুখে কিয়ৎকাল 'ধূপবাণ' খেলিয়া বাজারে প্রবেশ করিল। বাজারের আমোদ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে জমাট্ বাঁধিয়া উঠিল।

খেলা দেখাইয়া ক্রমে এক দল যাইতেছে, আর এক দল আসিতেছে; ঢাক বাজিতেছে, এক সঙ্গে সন্ন্যাসীদের পা উঠিতেছে, পড়িতেছে, বাণের ডগায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, এবং মিনিটে মিনিটে সেই অগ্নিতে এক এক মুঠা ধূপের গুঁড়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সকল সন্ন্যাসীর বাণের আলো, এক সঙ্গে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! আলোকদীপ্ত কুণ্ডলীকৃত ধূম অন্ধকারপূর্ণ আকাশতল অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিতেছে। বস্ত্রালঙ্কারপরিহিত পুষ্পদাম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া শূন্যে বাহুদ্বয় তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া আরও অধিক উৎসাহের সহিত নাচিতেছে; এবং হুঙ্কার দিয়া বলিতেছে "বলো শিবো মহাদেব দেব!" তাহাদের পরিধেয় ঘর্মে সিক্ত, পুষ্পমাল্য স্বস্থানচ্যুত, কণ্ঠের চিক, হাতের তাবিজ, বাজু ও বালায় বাণের অগ্নি প্রতিফলিত, পদপ্রান্তের নূপুরধ্বনি ঢাকের বিকট শব্দে সমাচ্ছন্ন।

এইরূপে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে গ্রামের সকল দল বাজার অতিক্রম করিয়া প্রথমে শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে, তাহার পর কালীতলায় সমবেত হইল। সেখানে অনেক-ক্ষণ নৃত্য প্রদর্শনের পর ভিন্ন ভিন্ন দল স্ব স্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসিয়া নবোৎসাহে নৃত্য আরম্ভ করিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে গাজনতলায় ঢক্কাধ্বনি ও কলরব থামিয়া গেল। ক্ষুদ্র গ্রামখানি উন্মত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের পর শ্রান্তিভরে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল আকাশের অগণ্য নক্ষত্র মিটমিট করিয়া স্তব্ধ গ্রামখানির দিকে চাহিতে লাগিল, এবং চৈত্রের উচ্ছৃঙ্খল উদাস বায়ুপ্রবাহে আম্রমুকুলের ও নিম্বমঞ্জরীর সৌরভ অন্ধকার প্রকৃতির বক্ষে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল, যেন একটি

পরমায়ুহীন বৎসর তাহার আনন্দ ও বেদনাপূর্ণ বিচিত্র স্মৃতিভার বক্ষে লইয়া সেই গাঢ় অন্ধকারসমাচ্ছন্ন নিদ্রাহীন স্তব্ধ নিশীথিনীর সুকোমল ক্রোড়ে মস্তক-স্থাপন করিয়া অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অন্তিম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

গ্রাম্যশব্দ

অ

অলকা তিলকা—মুখে ব্যবহৃত চিত্র বিচিত্র চন্দনচর্চা।
অধিবাস—উৎসবের পূর্বদিবসীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

আ

আড়—ভারা।
আড়ানি—বড় হাত-পাখা।
আড়ং—উৎসবমত্ত জনসমারোহ।
আড়—প্রস্থভাবে, এড়ো করিয়া।
আঁচা—শুঁয়োপোকা।
আরজ—আর্জি, দরখাস্ত।
আলতাপাতি—পাশরাঙ্গা শিম।
আগডাল—সর্বোচ্চ শাখা।
আটপিটে—সর্বকার্যে দক্ষ।
আঁদোসা—পিষ্টকবিশেষ।
আটি—গোছা।
আড়ি—ধান্য মাপিবার বেত্রনির্মিত পাত্র।
আনকোরা—নূতন কোরা বস্ত্র।
আগলাইতে—অভ্যর্থনা করিতে।
আইরি—অড়হর।
আলখেল্লা—গলা হইতে পা পর্যন্ত ঢাকা জামা।
আর্জি—দরখাস্ত।
আজাই—মাতামহ, আজা ম'শায়।
আসর—যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির বৈঠক।
আর্চা—অর্চনা।
আখড়া—আশ্রম।
আড়া—কড়ি।
আঁক—ব্যাঘ্রাদির গর্জনের অনুকৃতিমূলক হুঙ্কার।

ঈ

ঈশ্বরবৃত্তি—ব্যবসায়ী কর্তৃক দেবোদ্দেশে রক্ষিত লভ্যাংশ।

উ

উক্‌নে—ভাঁটুই, চোরকাঁটা।
উৎরুণি—উত্তরায়ণ।
উবু—মাটিতে বুক দিয়ে পড়া।
উপোস পাড়ছে—উপবাস করিয়া আছে।

এ

এঁটুলি—যে চট্‌চটে মাটিতে বালির ভাগ নাই।
এক টোপ—এক ফোঁটা।
একরঙ্গা—লাল কাপড়।
এড়ো—গাছের এত হাত বা আধ হাত লম্বা ডাল, কোন দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িবার জন্য।
এয়ার—বয়স্য।

ও

ওঠবন্দী—অনিশ্চিত, যাহাতে স্থায়ী অধিকার নাই।
ওড়ং—বংশদণ্ড-বিশিষ্ট নারিকেলমালার হাতা।
ওস্তাদ—শিক্ষক।

ক

কঃচেবার—পাশার দানবিশেষ।
কপাটী—খেলা বিশেষ, দম বন্ধ করিয়া 'কপাটী কপাটী' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বিপক্ষের দলে খেলা দিয়া আসিতে হয়, এই জন্য এ নাম।
কৃষণী—চাষী মজুরের কাজ।
কুনো—পুরুষ বিড়াল।
কণ্ঠি—কণ্ঠ সংলগ্ন কাঠের মালা।
কাটাই মাড়াই——ধান্যকর্তন ও শস্যনিষ্কাশন।
কানাচ—খড়ো ঘরের চালের জল যে কোণে পড়ে।
কাঁধাভাঙ্গা—কানাভাঙ্গা।
কোঁচড়—আধার-রূপে পরিণত কোঁচার খুঁট।
কাঁদাল—ধান মাড়িবার সময় খড় উল্টাইবার জন্য লোহার হুকবিশিষ্ট অনতিদীর্ঘ বংশদণ্ড।
কাঠা—ধান্যাদি শস্য মাপিবার বেত্রনির্মিত বৃহৎ পাত্র।
কাণ্টা—গৃহপ্রাঙ্গণস্থ জঞ্জাল ফেলিবার স্থান, আঁস্তাকুড়।
কাবারি—বাখারি।
কাঁকুই—চিরুনি।

কড়াই—কড়া, কটাহ।
কিনারা—উপায়।
কাতার—ভাঁড়।
কাচকাক—নীলকণ্ঠ পাখী।
কাঁচা—মেটে।
কুড়িকুষ্ঠ—কুষ্ঠব্যাধি।
কাঠরা—কাঠের বা বাঁশের বেড়া।
কোমরপাটা—বালক-বালিকার কোমরে পরিবার অলঙ্কার বিশেষ।
কাড়া—চর্মাবৃত অর্ধবর্তুলাকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
খড়ো—খড়ের চাল বিশিষ্ট।
কুলে দামড়া—কাল বলদ।

খ

খাস—উৎসবে ব্যবহৃত রঙিন-বস্ত্রাবৃত দণ্ড।
খোলা—কলাগাছের বাক্‌লা, পেটো।
খোরা—পাথরের বাটী।
খালুই—বাঁশের চটা বা কঞ্চিনির্মিত সঙ্কীর্ণমুখ মৎস্যপাত্র।
খোলা—ধান মাড়িবার স্থান।
খুঁট—বস্ত্রের কোণ।
খাড়ু—হাতের অলঙ্কার বিশেষ।
খাব্‌রে—দুধ দুহিবার মৃন্ময় বা কাষ্ঠনির্মিত পাত্র।
খুঁটআখুরে—যাহারা অক্ষর খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়ে, স্বল্পশিক্ষিত।
খাক্—খাগড়া।
খুলী—খোল-বাদক।

গ

গুছি—গুচ্ছ।
গেন্দা—লম্বা তাকিয়া।
গোয়ালকাড়ুণী—যে স্ত্রীলোক গোয়াল কাড়ে, অর্থাৎ পরিষ্কার করে।
গুবা—দাঁড়াগুলি খেলিবার গর্ত, গাবু।
গাছী—যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করে।
গোপীযন্ত্র—বৈষ্ণবদিগের একতারা বিশেষ।
গাদ—রসের ময়লা।
গুড়মুচি—সরাগুড়।
গোলা—তরল চালবাটা।
গাবগুবাগুব—বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের তন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, আনন্দলহরী।
গদীয়ান—আড়তের প্রধান কর্মচারী।

গাহনা—যাত্রা-গান।

ঘ

ঘোষাণী—গয়লানী।

চ

চন্দনপাটা—চন্দন ঘষিবার প্রস্তর, চন্দনপিঁড়ি।
চুরাইতে—চূর্ণ করিতে।
চামচু-চু—দম্ বন্ধ করিয়া এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া চাম্‌চু খেলায় বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিতে হয়।
চুলঝাড়—কেশদাম।
চিটা—শস্যহীন খোসাসর্বস্ব ধান।
চৌরি—চারি-চাল-বিশিষ্ট ঘর।
চাপড়ি—কাঁচা ঘুঁটে।
চড়াতে—চড় মারিতে।
চৈতালী—চৈত্রমাসে উৎপন্ন শস্য, রবিশস্য।
চাকি—পদ্মের ফল।
চারা—উপায়।

ছ

ছাপা—ছাবে প্রস্তুত সন্দেশ বিশেষ।
ছালা—বস্তা।
ছাঁই—নারিকেল ও গুড়ে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ।
ছোতড়া—সোটা, কদলীতন্তুর সমষ্টি।
ছুলিয়া—ছাড়াইয়া।
ছড়—দীর্ঘ কাণ্ড, ডাঁটা।
ছড়—বেহালা বাজাইবার ছড়ি।
ছড়া ঝাঁট—সকাল সন্ধ্যায় বাড়ীতে জল গোময় ছড়াইয়া ঝাঁট দেওয়া।
ছেরোত—স্রোত।
ছোকরা—যাত্রা বা পাঁচালীর দলের বালক গায়ক।
ছোবা—ছোট ভাঁড়।
ছাবালটা—ছেলেটা।

জ

জাফ্রি—বাঁশের, কঞ্চির, বা বাখারী নির্মিত বেড়া।
জিঞ্জির—শৃঙ্খল।
জাবনা, জাব—খড় ও খলি মিশ্রিত গবাদির খাদ্য।
জলটানা—জলাশয় যেখান হইতে অনেক দূরে আছে ; অনেক দূর হইতে যেখানে জল টানিয়া অর্থাৎ বহিয়া আনিয়া কার্যনির্বাহ করিতে হয়।

জঙ্গল— ছোট ছোট গাছ ও গুল্মাদি।
জন্মের ভাত—শেষ আহার, মৃত্যু অর্থবাচক।
জিরেনকাট—রসের জন্য খেজুর গাছ কাটিতে কাটিতে একদিন জিরেন (বন্ধ) দিয়া পরে প্রথম দিনের কাটা।
জাওর—রোমন্থন।
জুড়ি—যাত্রার দলের গায়কযুগল, এখন অনেক বয়স্ক গায়কের পরিবর্তে ব্যবহৃত।

ঝ

ঝিঁকে—নৌকা দ্রুত চালাইবার জন্য হালের ধাক্কা, সজোরে হালের 'ঠেলা'।
ঝিকিমিকি বেলা—বেলাবসান।
ঝাঁঝরী—তলায় বহুছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র।
ঝিউনি—চাউল ভাজিতে ভাজিতে পোড়াইয়া ফেলা।
ঝাঁকাইতে—ঝাঁকানী দ্বারা নাড়িতে।
ঝেঁটিয়ে—দল বাঁধিয়া।

ট

টাপোর—অস্থায়ী চালা।
টাটি—খর্জুরপত্রাদিনির্মিত ঝাঁপ।
টোল—বংশাদিনির্মিত খড়ের ছাউনিযুক্ত উচ্চ মঞ্চ।
টাল—মাচা।
টাট—সংসারধর্ম ও বিষয়সম্পত্তি।

ঠ

ঠিলি—ছোট কলসী।
ঠেকো—অবলম্বন।
ঠুক্‌নি—চক্‌মকির ইস্পাত।
ঠুঁটো—অঙ্গুলিহীন।

ড

ডাবগাছ—নারিকেলের গাছ।
ডাকের গহনা—রাংতা, অভ্র, শোলা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ডাকের সাজ।
ডেল্‌কো—মৃত্তিকাদিনির্মিত দীপাধার, মাটীর ছোট ছোট প্রদীপও বুঝায়।
ডুগি—বাঁয়া।
ডালা—বংশনির্মিত আধার বিশেষ।
ডেগ্‌ড়ো—তাল নারিকেল জাতীয় বৃক্ষের ডাল।
ডাকের সাজ—ডাকের গহনা।
ডগর—চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ঢ

ঢপ—মধু কানের প্রবর্তিত কীর্তনাঙ্গের গান।

ত

তিলপিটিলী বেগুন ভাজা—তিল ও চালের গুঁড়ার গোলায় মাখান বেগুন ভাজা।
তকতকে—পরিচ্ছন্ন।
তিউঁড়ি—অস্থায়ী উনন।
তিলুয়া—তিলযুক্ত গুড়ের বা চিনির মিষ্টান্ন বিশেষ।
তাওত—সেবাশুশ্রূষা।
তত্ত্ব—পার্বণাদিতে প্রেরিত উপঢৌকন।
তরাতে—ত্রাণ করিতে।
তবলা—এক জাতীয় ভাঁড়।

থ

থাওক—বিনা ওজনে।
থাবা—হস্তপূর্ণ।
থোকা—গুচ্ছ।
থুড়থুড়ে—অথর্ব।
থেলো—ছোট ডাবা হুঁকো।

দ

দোহাপাতা—নবপ্রসূতা গাভীর দোহনারম্ভ।
দোয়াল—দুগ্ধদোহনকারী।
দামাট—ছাতার বাঁট।
দোবজা—চাদর।
দাকাটা—ঢেঁকিতে কোটা নয়, দা দিয়া কাটা।
দাঁড়ি বাটখারা—মানদণ্ড ও সের, আধ সের প্রভৃতি লৌহাদিনির্মিত পরিমাপক দ্রব্য ; দাঁড়িপাল্লা।
দেয়ালগিরী—দেওয়ালে লাগাইবার কাচময় আলোকাধার।
দরগা—পীরস্থান।
দণ্ডবৎ—ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।
দেউড়ী—সিংহদ্বার।
দীপক—মৃৎপাত্রস্থ রঙ্গমশাল জাতীয় আলোক।

ধ

ধনঞ্জয়—প্রহার।
ধাউত—ধাত, ধাতু।
ধড়া—অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড।
ধুপবাণ—চড়কের অগ্নিক্রীড়া।

ন

নলেন গুড়—উৎকৃষ্ট পাতলা খেজুরে গুড়।

নটাইয়া—নষ্ট হইয়া।
নউচি—রোহিতশাবক।
নাড়ি—লাঠী।
ন্যাংড়া—খোঁড়া।
নওয়া—নয়।
নোট—ঢেঁকির গড়।
নুড়ি—গোময়পিণ্ড।
নালি—রসনিঃসরণের নল।
নাগি—আঁকুষি।
নেড়ানেড়ি—সম্প্রদায়বিশেষের বৈষ্ণবী।
নাকি—অনুনাসিক।
নাগি—নৌকা ঠেলিবার বংশদণ্ড।

প

পরচালা—চালার সংযুক্ত ছোট চাল।
পচাইয়া—পতিত ও নিষ্ফল হইয়া।
পাট—প্রতিমার কাষ্ঠনির্মিত বেদী।
পানাই—কাষ্ঠ ও চর্মে নির্মিত পাদুকা বিশেষ, পয়জার।
পেট্‌কো—কলাগাছের অখণ্ড খোলা।
পাখরী—গরুর নাম ; যে গরুর গায়ে সাদা, লাল ও কালো দাগ আছে।
পিতিয়ে—পিত্তবৃদ্ধি হওয়ায়।
পৈতা কাটিয়া—পৈতা প্রস্তুত করিয়া।
পালা—রাশীভূত করা।
পাচন—গো-মোষাদি তাড়াইবার যষ্টি।
পাখী—ধান্যাদি মাপিবার বেত্রনির্মিত ক্ষুদ্র পাত্র।
পোষবাউড়ি—পৌষ পার্বণের অঙ্গ বিশেষ।
পোয়াল—ধানের খড়।
পোঁচড়া—লেপ।
পারানি—পার-পণ্য।
পরাত—কানাওয়ালা বড় থালা।
পড়িতেছে—লাগিতেছে।
পাকপাড়া—পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করা।
পতিত—অনাবাদী।
পালা—গীতাভিনয়ের বিষয়।
পসারী—ব্যবসায়ী।
পরবী—পার্বণী।

ফ

ফানুস—কাগজের লণ্ঠন।
ফর্সী—গুড়গুড়ি।
ফাল্তো—অকিঞ্চিৎকর।
ফুপুতো ভাই—পিসতুতো ভাই।

ব

বেল—গোলাকৃতি কাচের লণ্ঠন।
বেচাল—ব্যবসায়চতুরা।
বাড়ি—লাভের জন্য ধান্যাদি ধার দেওয়া।
বুড়ি—খেলার সংসৃষ্ট ব্যক্তিবিশেষ, খেলার সাক্ষী।
বাইন—গুড় জ্বাল দিবার স্থান।
বায়না—আবদার।
বাথান—গোচারণক্ষেত্রে গো-মহিষাদির সমাগমস্থান।
বাঁকের বাড়ি মারিয়া—বাঁক অর্থাৎ ভারবহনদণ্ডের আঘাতে।
বাইতি—যাহারা চুন প্রস্তুত করে, চুনরী।
বীজ—সদ্যোজাত গুড় যাহাতে জমিয়া যায় ও পরিষ্কার হয়, সেই উদ্দেশ্যে গুড়ে মিশাইবার নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত দলা গুড়।
বয়—অনেক দিন স্থায়ী হয়, টেকে।
বারনিয়া—গ্রামের নাম।
বিয়েন—প্রসব।
বুঁদি—খড়ের মশাল।
বারদোল—দোলের একমাস পরে দ্বাদশটি বিগ্রহের একত্র সমাবেশে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর প্রবর্তিত যে দোল হয়।
বিলাত—বাকী।
বেসবত—অশিষ্ট।
বেড় বাতাড়—বেড়া ও ঘেরা, জঙ্গলময় স্থান।
বাড়িতে—কাটিতে।
বেথো—শাক বিশেষ।
বাঁধানো—রৌপ্যমণ্ডিত।
বাখারী—চেরা ও খণ্ডিত বাঁশ।
বটখিরি—বৈঠকী গান।
বর্গী—মারাঠা সৈন্য।
বার—সভাধিষ্ঠান।
বাদা—চামড়ার বন্ধনীযুক্ত কৃষকগণের পাদুকা।
বাজীকন্যা—সোলার স্ত্রীমূর্তি, ব্যায়াম করিতেছে, এইরূপ ভাবে গঠিত।

বৈকালী—দেবতাদিগের অপরাহ্ণের জলযোগ।

ভ

ভাসানে জলে—যাহাতে ভাসিতে পারে, এমন জলে।
ভরা—দ্রব্যাদিপূর্ণ নৌকা।
ভিত—ভিত্তি, দেওয়ালের গোড়া।
ভাঁড়ভাঙ্গি—গরুর নাম, দুধের ভাঁড় ভাঙ্গে বলিয়া এই নাম।
ভাঁজিতে—রাগিণী আলাপ করিতে।
ভরা বয়সে—পূর্ণ যৌবনে।
ভিজে—ভিজান ছোলা মটর প্রভৃতি।
ভুঁইচাঁপা—এক প্রকার আতসবাজী।
ভর—অধিষ্ঠান।

ম

মানসা—দেবোদ্দেশে পূজাসঙ্কল্প।
মেরজাই—জামা বিশেষ, মির্জা নামক সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা পূর্বে ইহা ব্যবহার করিতেন।
মহাতাপ—সোরা গন্ধকাদি পূর্ণ কাগজে মোড়া মশাল।
মেটে মজুর—যে সকল মজুরেরা মাটীর দেওয়াল ইত্যাদি প্রস্তুত করে।
মরিবার—খেলিবার অধিকারচ্যুত হইবার।
মূল খেড়ু—দলস্থ প্রধান খেলোয়াড়।
মালামো—মল্লক্রীড়া, কুস্তি।
মশক—মহিষচর্মনির্মিত জালার মত আধার বিশেষ।
মালো—জেলে, মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ।
ময়া—মৌরলা মাছ।
মুচি—সরা অপেক্ষা ছোট খুরোবিশিষ্ট মৃৎপাত্র। কাঁটালের ফুল।
মানত—মানসিক।
মন্দা—নরম।
মোকাম—ব্যবসায়ীদিগের মফস্বলের আড়ত।
মেঠোসুর—চাষার গানের সুর।
মোড়ামুড়ি দিয়ে—হস্তপদ প্রসারিত করিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া।
মাচান—পাটাতন।
মৈমশাল—মৈয়ের উপর রক্ষিত শ্রেণীবদ্ধ মশাল।

য

যজ্ঞি—বৃহৎ ভোজ।

র

রেজগিরি—রাজমিস্ত্রীর সহকারিণী মেয়ে মজুরের কাজ।

রেকাবদল—ঘোড়ার পৃষ্ঠাবলম্বিত পাদান।
রাশি—পাতলা ও শস্তা, নিকৃষ্ট।
রসকলি—বৈষ্ণবীর তিলক।
রসুম—মকদ্দমার দাবীর পরিমাণ অনুসারে উকীলের প্রাপ্য।
রসানি—পাতলা পুয রক্তের ধারা।
রাঁড়ী—বিধবা।
র মান্তি——স্থির থাকিতে।

ল

লাল—প্রথম শ্রেণীর উর্বর জমি।
লাক্ষি—লক্ষ।
লালিয়ে—লালায়িত হইয়া।
লালন—নদীয়া জেলার একজন উদাসী ফকির, এই গানের রচয়িতা।

শ

শোলা কচু—মানকচু অপেক্ষা দীর্ঘ ও সরু কচু।
শুকো—ঘন ও উৎকৃষ্ট।
শৈত্যক—ঠাণ্ডা।
শ্রীপঞ্চমী—সরস্বতীপূজার দিন।
শরাণ—প্রশস্ত রাস্তা, সরণি।
শলে—লম্বা।

স

সান—পাকা মেজে।
সুষ্যি কুমড়ো—বিলাতী কুমড়া।
সেজ—কাচাবরণমধ্যস্থ বাতিদান।
সাঁজাল—ধূমযুক্ত অগ্নি।
সাঁকরকুণ্ড—সকরকন্দ, অর্থাৎ শর্করাবৎ মিষ্ট কন্দ।
সরাগুড়—কলসীর মুখ কাপড় বাঁধিয়া সরায় জমান খেজুর গুড়।
সীতাহার—হারের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার বাজি।
সড়াসড়—সপাসপ।
সিদ্ধপুলি—পিষ্টক বিশেষ।
সেরা—প্রধান, উৎকৃষ্ট।
সবরে—শোলপের সঙ্গে প্রস্তুত কুলের চাটনী বিশেষ।
সঙ্গত—গীত বাদ্যের তাল লয় যোগ।
সুবচনী—মঙ্গলকারিণী দেবতা বিশেষ।
সাঁচ্চা—জরির কাজ।
সাঁজা—দধি প্রস্তুত করিবার অম্লরস।

হ

হাডুডুডু—এক প্রকার কপাটি খেলা, খেলিবার সময় ডুডু শব্দ একনিশ্বাসে উচ্চারণ করিতে হয়।

হাঁড়ি—কাচের বেল-লণ্ঠন।

হাতড়াইয়া—হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া।

হামসে দিগর নাস্তি—আমার অপেক্ষা কেহ বড় নাই।

হেনেস্তা—অবজ্ঞা।

হত্যা—শুভকামনায় দেবতার দ্বারে পড়িয়া থাকা।

হে'ই—দোহাই।

হাঁসুলী—শিশুর গলার অলঙ্কারবিশেষ।

হামা টানিয়া—হাঁটু ও হাতে ভর দিয়া চলিয়া।

হাতসাঁই—একাধিক ব্যক্তির একত্র বদ্ধ প্রসারিত হস্তের উপর রাখিয়া লইয়া যাওয়া।

ক্ষ

ক্ষেত্তুরে বাটি—জগন্নাথক্ষেত্রের বাটি।

ক্ষয়া—ক্ষয়প্রাপ্ত।